বাস্তুতন্ত্র ও স্থিতিশীল উন্নয়ন: বৈদিক এবং বৌদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গিতে একটি বিচারমূলক বিশ্লেষণ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ. ডি. ডিগ্রির জন্য

উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক সমর কুমার মণ্ডল

গবেষক

উৎসব রায়

দর্শন বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা ৭০০০৩২

মার্চ ২০২৩

Certified that the Thesis entitled

"বাস্তুতন্ত্র ও স্থিতিশীল উন্নয়নঃ বৈদিক এবং বৌদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গিতে একটি বিচারমূলক বিশ্লেষণ" submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the Supervision of Professor Samar Kumar Mondal. And that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere/elsewhere.

Countersigned by the

Supervisor :

Dated : 02/03/23

Professor
Department of Philosophy
Jadavpur University
Kolkata - 700 032

Candidate: Uttam Roy

Dated: 02/03/2023

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমার এই গবেষণাপত্রটি সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে যাঁরা আমাকে সাহায্য করেছেন, তাঁদের সকলের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ এবং ঋণী। তাঁদের সাহায্য এবং আশীর্বাদ ছাড়া হয়তো এই গবেষণার কাজটি সম্পন্ন করা সম্ভবপর হতো না। এই বিষয়ে সর্বপ্রথম যার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকব, তিনি হলেন আমার গবেষণাপত্রের তত্ত্বাবধায়ক এবং দর্শন বিভাগের অধ্যাপক সমর কুমার মন্ডল মহাশয়। যিনি তাঁর ভীষণ ব্যস্ততার মধ্যেও সময় করে আমার গবেষণার ক্ষেত্রে আমাকে সর্বদা সাহায্য করেছেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অন্যান্য অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, গ্রন্থাগারিকের থেকেও আমি সর্বদা সাহায্য পেয়েছি, তাই তাঁদের প্রতিও আমি কৃতজ্ঞ।

এছাড়া দর্শন বিভাগের অন্যান্য গবেষক, প্রাক্তন এবং বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীদের অনেকে গবেষণার কাজে নানাভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন। তাদের সহযোগিতা ও উৎসাহ প্রদান আমাকে গবেষণা সম্পন্ন করতে খুবই সহায়তা করেছে।

আমি কৃতজ্ঞতা জানাই আমার পরিবারের সকল সদস্যদের। যাঁরা সর্বদা আমাকে সাহায্য এবং অনুপ্রেরণা দিয়েছেন, তাঁদের সহযোগিতা ব্যতিত গবেষণাপত্রের কাজটি আমার পক্ষে কোনভাবেই সমাপ্ত করা সম্ভব হতো না।

পরিশেষে, আমি কৃতজ্ঞতা জানাই আমার সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা, বন্ধু এবং শুভানুধ্যায়ীদের, যাঁরা সকল পরিস্থিতিতে আমার পাশে থেকে আমাকে জীবনে এগিয়ে যাওয়ার সাহস প্রদান করেছেন।

উৎসব রায়

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
কলকাতা ৭০০০৩২
মার্চ ২০২৩

সূচীপত্র

প্রস্তাবনা **i-xvii**

ভূমিকা **১-১৫**

প্রথম অধ্যায়ঃ পরিবেশ সম্পর্কে বৈদিক দৃষ্টিভঙ্গি **১৬-৩৫**

১.১ ঋক্‌বেদে পরিবেশ চিন্তা ১৭

১.২ সামবেদে পরিবেশ চিন্তা ২১

১.৩ যজুঃ বেদে পরিবেশ চিন্তা ২৫

১.৪ অথর্ববেদে পরিবেশ চিন্তা ২৮

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ পরিবেশ সম্পর্কে পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গি **৩৬-৫৫**

২.১ বাইবেলে পরিবেশ চিন্তা ৩৬

২.২ অন্যান্য পাশ্চাত্য ধর্মে পরিবেশের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি ৩৮

২.৩ রেনে দেকার্তের অভিমত ৩৯

২.৪ জন লকের অভিমত ৪৯

২.৫ ডেভিড হিউমের অভিমত ৫০

২.৬ মানবকেন্দ্রিকতাবাদ ও অ-মানবকেন্দ্রিকতাবাদ ৫৪

তৃতীয় অধ্যায়ঃ বাস্তুতন্ত্রের প্রেক্ষাপটে পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যা **৫৬-৮৪**

৩.১ ইকোলজি শব্দের অর্থ ৫৬

৩.২ Leopold- এর ভূমি নীতিবিদ্যা ৬০

৩.৩ গভীর ও অগভীর বাস্তুতন্ত্র ৬৯

৩.৪ গভীর বাস্তুতন্ত্রের নীতিসমূহ ৭১

৩.৫ গভীর ও অগভীর বাস্তুতন্ত্রের পার্থক্য ৭৭

৩.৬ গভীর বাস্তুতন্ত্রের সমালোচনা ৮১

চতুর্থ অধ্যায়ঃ পরিবেশ সম্পর্কে বৌদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি ৮৫-১০৬

৪.১ বৌদ্ধমতে শীল ৮৭

৪.২ বৌদ্ধমতে অহিংসা ৯১

৪.৩ উদ্ভিদাদির প্রতি অহিংসা ৯২

৪.৪ অহিংস হয়েও মাছ-মাংস ভক্ষণ ৯৯

৪.৫ অহিংসার ফল ১০১

৪.৬ ব্রহ্মবিহার ১০১

পঞ্চম অধ্যায়ঃ উন্নয়ন ও স্থিতিশীল উন্নয়ন ১০৭-১৫২

৫.১ মানুষ ও পরিবেশ ১০৭

৫.২ পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন ১০৯

৫.৩ উন্নয়নের সাধারণ ধারণা ১১০

৫.৪ উন্নয়নের অর্থনৈতিক ধারণা ১১১

৫.৫ প্রকৃত উন্নয়ন ১১৩

৫.৬ উন্নয়ন ও কল্যাণমূলক অর্থনীতি ১১৫

৫.৭ স্থিতিশীল উন্নয়ন ও পরিবেশ ১৩২

৫.৮ স্থিতিশীল উন্নয়নের নীতিসমূহ ১৩৩

৫.৯ স্থিতিশীল উন্নয়নের বিভিন্ন প্রকার অর্থ ১৩৫

৫.১০ উন্নয়ন ও মানুষ ১৩৮

৫.১১ স্থিতিশীল উন্নয়নের সতেরটি লক্ষ্য ১৪১

মূল্যায়ন ও সিদ্ধান্ত **১৫৩-১৭৪**

গ্রন্থপঞ্জী **১৭৫-১৯৫**

মুখবন্ধ

বর্তমানে এমন কথা খুবই প্রচলিত যে মানুষ বাস্তুতন্ত্রকে প্রভাবিত করে। মানুষ তার জ্ঞানের আলোকে, সভ্যতার অগ্রগতিকে কাজে লাগিয়ে উন্নয়নের ধারা বজায় রাখতে চারপাশের পরিবেশের ব্যাপক ক্ষতি করছে। তাছাড়া মানুষ নিজের স্বার্থে পরিবেশকে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করার ফলে বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয় প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে। মানুষ তার উন্নয়নের ধারায় প্রকৃতিকে জয় করার চেষ্টা করলেও প্রকৃতির কাছে আজও সে শিশু। প্রকৃতির ধ্বংসাত্মক তান্ডবকে মানুষ বহু চেষ্টা করেও আজও জয় করতে পারে নি। এর প্রমাণ তুরস্ক ও সিরিয়ায় ঘটা সাম্প্রতিক ভূমিকম্প থেকে স্পষ্ট। এখানেও মানুষের এই মৃত্যুমিছিলের কারণ যে মানুষেরই লোভ- সে কথা আজ প্রমাণিত। তুরস্ক-সিরিয়া সীমান্ত বিশ্বের অন্যতম একটি সক্রিয় ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকা বলে পরিচিত। অতীতেও এই অঞ্চল ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পের সাক্ষী হয়েছে। এই সবকিছু জানা সত্ত্বেও মানুষ উন্নয়নের নামে গগনচুম্বী ইমারত এসব অঞ্চলে প্রস্তুত করেছে। সাম্প্রতিককালে নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে একের পর এক বহুতল নির্মিত হয়েছে। তুরস্কে ১৯৯৯ সালের ভূমিকম্পে প্রায় ১৭০০০ মানুষের মৃত্যুর পরে গৃহনির্মাণ সংক্রান্ত বিশেষ নিয়ম-কানুন এখানে বলবৎ করা হয়। কিন্তু সরকারি বিধিকে মান্যতা না দিয়ে মানুষ নিজের স্বার্থে এসব অঞ্চলে বহুতল নির্মাণ করেছে। এই সবকিছুর কারণ মানুষের তথাকথিত উন্নয়নের বাসনা। আরো স্পষ্ট করে বললে মানুষের লোভ পক্ষান্তরে তার নিজেরই বিপদ ডেকে এনেছে। কেবল আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নয়, ভারতেও পরিবেশের ক্ষতি করে মানুষের তথাকথিত উন্নয়নের যাত্রা অব্যাহত রাখার

নজির দেখতে পাওয়া যায়। এর অন্যতম প্রমাণ, জোশীমঠের সাম্প্রতিককালের ভূমিধ্বস থেকে স্পষ্ট। ১৯৭৬ সালেই 'মিশ্র কমিটি'র তরফে জানানো হয় জোশীমঠ শহরে কোন বড়ো নির্মাণকাজ করা যাবেনা। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্ভাবনা থাকায় গাছ না-কাটা, জলবিদ্যুৎ প্রকল্প বন্ধ রাখার কথা বলা হয়। কিন্তু যাবতীয় সতর্কবার্তা উপেক্ষা করে পাহাড় কেটে রাস্তা তৈরি, বহুতল নির্মাণ, একাধিক জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ জোশীমঠে চলেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, তথাকথিত উন্নয়নের জোয়ারে ভাসতে গিয়ে নিজেদের লোভের মাশুল আজ জোশীমঠকে দিতে হচ্ছে। শুধু জোশীমঠের ভূমিধ্বস নয়, উত্তরাখন্ডের গাড়োয়ালের পাহাড়ে টানা নগরায়ণ ও জলবিদ্যুৎ প্রকল্প ভবিষ্যতে কী ধরণের বিপদ ডেকে আনবে, তা এখন অনেকের কাছে স্পষ্ট। এখনও সিকিম জুড়ে তিস্তা নদীতে মানুষ নিজের প্রয়োজন মেটাতে একের পর এক জলবিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়িত করছে। এছাড়া এমন অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় যেখানে মানুষের তথাকথিত উন্নয়নকে বাস্তবায়িত করতে গিয়ে মানুষ নিজের তথা সমগ্র পরিবেশের বিপর্যয় ডেকে আনছে। এইসব পরিবেশগত সমস্যা অনেক আগে থেকেই আমাকে ভাবিয়েছে এবং এই ধরনের ‘বাস্তব সমস্যা সংক্রান্ত’ বিষয়কে নিজের গবেষণার ক্ষেত্র হিসাবে বেছে নিতে প্রেরণা জুগিয়েছে। এই পরিবেশ বিষয়ক বাস্তব সমস্যাকে দূর করতে গেলে দার্শনিক আলোচনার প্রয়োজন। Aldo Leopold পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যাকে দার্শনিক সমস্যা বলেন। বাস্তুতন্ত্র (Ecology) হলো পৃথিবীতে বসবাসকারী জীবকূলের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ক এবং পরিবেশের সঙ্গে তাদের সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা। আমেরিকান পরিবেশবিদ তথা দার্শনিক Aldo Leopold স্পষ্টভাবে বাস্তুতন্ত্রকে (Ecology) নীতিবিদ্যার ধারণার সঙ্গে যুক্ত করেছেন।

নরওয়ের দার্শনিক Arne Naess 'বাস্তুতন্ত্র' সম্পর্কিত নৈতিক আলোচনা প্রসঙ্গে অগভীর বাস্তুতন্ত্র (Shallow Ecology) ও গভীর বাস্তুতন্ত্র (Deep Ecology) এই দুই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্য পার্থক্য করেছেন। অগভীর বাস্তুতন্ত্রে মানবকেন্দ্রিকতা প্রাধান্য পেয়েছে, তাই মানুষের প্রয়োজনের ক্ষেত্র হিসাবে পরিবেশের গুরুত্ব। এখানে পরিবেশ রক্ষার চিন্তাধারা একান্তই মানুষের প্রয়োজনের খাতিরে। প্রকৃতির স্বতঃমূল্য এই দৃষ্টিভঙ্গিতে অস্বীকৃতিলাভের কারণে তা পরিবেশ সংরক্ষণে যথেষ্ট ভূমিকা গ্রহণে ব্যর্থ।

অগভীর বাস্তুতন্ত্র অনুসারে মানুষ সর্বাধিক গুরুত্ব লাভ করেছে এবং মানুষের প্রয়োজনে পরিবেশ গুরুত্ব লাভ করেছে। এই মতের সমর্থকরা মানুষের জন্য পরিবেশকে রক্ষা করতে চায়। এনারা মানুষের স্বার্থচিন্তা করেই বলেন যে, পরিবেশ তথা বাস্তুতন্ত্রের রক্ষা করা উচিত, কারণ তা মানুষের জন্য মূল্যবান। কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গি খুবই আত্মকেন্দ্রিক। এই দৃষ্টিভঙ্গি কখনোই পরিবেশের অবক্ষয় বা ধ্বংস রোধ করতে পারে না। কারণ এখানে প্রকৃতি স্বতঃমূল্যবান নয়।

গভীর বাস্তুতন্ত্রের অন্যতম সমর্থক Arne Neass ও George Sessions মনে করেন এই জগতে মানুষ, মনুষ্যেতর সকল প্রাণী, উদ্ভিদসমূহ পরিবেশের সব কিছু স্বতঃমূল্যবান এবং তাদের বিকাশও সমানভাবে কাম্য। এখানে মানুষের স্বার্থকে নৈতিক বিচারের মানদণ্ডরূপে গণ্য করা হয় না। বর্তমানে মানুষ তার চারপাশের পরিবেশ ও অন্যান্য মনুষ্যেতর প্রাণীকে নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য এত পরিমাণে ধ্বংস করছে যে উদ্ভিদ ও অন্যান্য প্রাণীর সংখ্যা প্রতিনিয়ত হ্রাস পাচ্ছে। কিন্তু মানুষ যখন নিজেকে বিশ্বের সকল অংশের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে উপলব্ধি করবে, এবং নিজেকে সহ জগতের

সকল উপাদানকে এক বিশাল সমগ্রের অংশ বলে মনে করবে তখনই পরিবেশগত সঙ্কট দূর করা সম্ভব হতে পারে বলে মনে হয়।

অগভীর বাস্তুতন্ত্রে প্রকৃতির সবকিছুর উর্দ্ধে মানুষকে প্রধান্য দেওয়া হয়েছে। মানুষের প্রয়োজনে পরিবেশকে রক্ষা করার কথা বলা হয়েছে। পরিবেশের স্বতঃমূল্য স্বীকার না করার ফলে এই দৃষ্টিভঙ্গিটি ত্রুটিপূর্ণ। অন্যদিকে গভীর বাস্তুতন্ত্রের ধারণাটিও সমালোচনার উর্দ্ধে নয়। উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে এই ধারণাটি কতটা কার্যকরী সেই প্রশ্ন যেমন আছে; তেমনি গভীর বাস্তুতন্ত্র অনুসারে মানুষ নিজের স্বার্থপূরণের জন্য প্রকৃতি ও পরিবেশের অন্যান্য প্রাণীর ক্ষতিসাধন করতে পারবে না। কিন্তু এমনভাবে মানবসভ্যতার অগ্রগতি বা উন্নয়ন স্তব্ধ হয়ে যেতে পারে। কৃষিকাজ, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, নগরায়ণ প্রভৃতি মনুষ্যসৃষ্ট যেকোন পরিবর্তনেই প্রকৃতির ক্ষতিকে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু মানুষ যদি প্রকৃতি ও অন্যান্য প্রাণীর ক্ষতির জন্য এসব কাজ করা থেকে বিরত হয়; তবে মানুষ পুনরায় গুহাবাসী জীবনে পৌঁছে যাবে, যা কখনও কাম্য হতে পারে না।

তাই আমাদের এমন একটি বিকল্প পথ বা দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসন্ধান করা প্রয়োজন, যা একদিকে প্রকৃতি ও প্রাণীর ধ্বংসকে রোধ করবে; আবার অন্যদিকে মানুষের উন্নয়নের যাত্রাও অব্যাহত থাকবে। আমার গবেষণার মূল প্রশ্নটি হলো- কীভাবে আমরা একত্রে পরিবেশের অবক্ষয় রোধ করতে এবং উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে পারবো? এই প্রসঙ্গে আমরা অবশ্যই বোঝার চেষ্টা করবো 'উন্নয়ন' বলতে আমরা সাধারণভাবে যা বুঝি তা 'প্রকৃত উন্নয়ন' কিনা।

উপরে উত্থাপিত প্রশ্নকে মাথায় রেখে আমার অভিসন্দর্ভটি- 'বাস্তুতন্ত্র ও স্থিতিশীল উন্নয়ন: বৈদিক এবং বৌদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গিতে একটি বিচারমূলক বিশ্লেষণ'- এই পাঁচটি অধ্যায়ে উপস্থাপিত হয়েছে। এই অধ্যায়গুলি হলো- (১) পরিবেশ সম্পর্কে বৈদিক দৃষ্টিভঙ্গি, (২) পরিবেশ সম্পর্কে পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গি, (৩) বাস্তুতন্ত্রের প্রেক্ষাপটে পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যা, (৪) পরিবেশ সম্পর্কে বৌদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি, (৫) উন্নয়ন ও স্থিতিশীল উন্নয়ন এবং মূল্যায়ণ ও সিদ্ধান্ত।

অভিসন্দর্ভের ভূমিকা অংশে পরিবেশ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমানে প্রত্যক্ষভাবে যেসব পরিবেশজনিত সঙ্কট সর্বাধিক বৃদ্ধি পাচ্ছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল অ্যাসিড বৃষ্টি, ভূগর্ভে বিশুদ্ধ জলের অনুপস্থিতি, নদী-জল-সমুদ্রে জলদূষণ, বায়ুদূষণ, ভূমিকম্প প্রভৃতিকে এখানে তুলে ধরা হয়েছে। প্রকৃতির সৃজনশীল এবং নান্দনিক মূল্যও অপরিসীম। প্রকৃতির মধ্যে রয়েছে বহু ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদ; যেমন- খনিজ দ্রব্য, মূল্যবান উদ্ভিদ ইত্যাদি। তাই প্রকৃতির অর্থনৈতিক গুরুত্বও অপরিসীম। সুতরাং, প্রকৃতির ক্ষতি অর্থনৈতিক দিক থেকেও সঙ্কটজনক। তাই বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন মানবজাতির পরিবেশ রক্ষায় মনোনিবেশ করা বাঞ্ছনীয়। বর্তমানে মানুষের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের সমস্যার পাশাপাশি এক নতুন সমস্যা হল পরিবেশ সমস্যা। মানুষ প্রতিনিয়ত নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য পরিবেশের অপূরণীয় ক্ষতি করে চলেছে। এরফলে পরিবেশের সঙ্গে মানুষের আর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক নেই বরং সেই সম্পর্ক সংঘাত ও দ্বন্দ্বের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। এছাড়া এই অংশে পরিবেশের সংজ্ঞা, পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান, ‘Environment’ শব্দের অর্থ প্রভৃতি আলোচিত হয়েছে।

প্রথম আধ্যায়ে পরিবেশ সম্পর্কে বৈদিক দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করা হয়েছে। বেদ এমন এক শাস্ত্র যার দ্বারা আমরা সেইসব বিষয়ের জ্ঞানলাভ করি, যার জ্ঞান আমরা সাক্ষাৎভাবে ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতার দ্বারা পেতে পারি না। পরিবেশগত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ঋগ্বেদের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী। সুখ-সমৃদ্ধির জন্য প্রত্যহ বৃক্ষরোপণের কথা ঋগ্বেদে বহু হাজার বছর পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া ঋগ্বেদে আত্মীয়, অনাত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব, প্রিয়জন এমনকি প্রাণীদেরও সম অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। কাজেই অন্যকে বঞ্চিত করে যে ব্যক্তি নিজ ভোগ-বিলাসে আচ্ছন্ন হয়, সেই কর্মকে সর্বদা পাপের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। জীবনের বিচিত্র ক্ষেত্রে প্রাণের প্রকাশে এবং বাস্তুতন্ত্রে জলের ভূমিকার প্রসঙ্গ সামবেদের বিভিন্ন স্থানে উল্লিখিত হয়েছে। সামের আশ্রয় স্বর, স্বরের আশ্রয় প্রাণ, প্রাণের আশ্রয় অন্ন এবং অন্নের আশ্রয় জল। আধুনিক পরিবেশবিদদের ভাষায় জল হলো জীবনের অমৃতস্বরূপ। সামবেদের একাধিক স্থানে জল, বৃষ্টি প্রভৃতি প্রকৃতির একাধিক উপাদানের বর্ণণা দ্বারা প্রকৃতির প্রতি বৈদিক ঋষিদের সজাগ দৃষ্টি প্রকাশিত হয়েছে। যজুঃ বেদে বলা আছে, বৃক্ষ-ছেদন এবং পরিবেশ দূষণ সম্পূর্ণ বাস্তুতন্ত্রের ক্ষতি করে, তাছাড়া এখানে প্রাণীহত্যাকে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে, কারণ প্রাণীরা সমাজের উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তাই যেসব প্রাণীরা কৃষিক্ষেত্রে আমাদের বিশেষ সহায়ক, যেমন- গরু, বলদ প্রভৃতি প্রাণীর হত্যা থেকে রাজাকেও বিরত থাকার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। অথর্ববেদে ঋতকে সত্যের সঙ্গে এবং সত্যকে ধর্মের সঙ্গে একাত্ম করে বোঝানো হয়েছে। নৈতিক দিক দিয়ে সত্য সকল কিছুকে নির্দিষ্ট নিয়মে ঘটায়, অন্যদিকে ধর্মও হল তা যা সকল কিছুকে ধারণ করে। ঋতকে নৈতিক নিয়মের রক্ষক বলা হয়। অর্থবেদে প্রকৃতির সকল উপাদানের

স্বগতমূল্য স্বীকৃত হয়েছে। আজ থেকে প্রায় চার হাজার বছর পূর্বে অথর্ববেদে পৃথিবীসূক্তে ধরিত্রী-মাতার স্তুতি আছে এবং তাতে নিবিড় বাস্তবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এই পৃথিবীসূক্তে জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও দীর্ঘস্থায়ী পরিবেশ ভাবনার চিত্র আছে। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম- পরিবেশের এই পঞ্চ মহাভূতের সংরক্ষণের কথা অথর্ববেদে বলা হয়েছে।

দ্বিতীয় আধ্যায়ে পাশ্চাত্য সনাতন দর্শন ও পাশ্চাত্য ধর্মে পরিবেশের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি আলোচিত হয়েছে। বাইবেলে ঈশ্বরকে পৃথিবী, আকাশ, মানুষ প্রভৃতি সবকিছুর রচয়িতা বলা হয়েছে। তাছাড়া মানুষকে পৃথিবী, আকাশ, পৃথিবীর সমস্ত প্রাণী, উদ্ভিদ ইত্যাদির উপর কর্তৃত্ব করার কথা বলা হয়েছে। পৃথিবীর সমস্ত কিছুই মানুষের ভোগের জন্য নির্মিত বলা হয়েছে। এসব থেকে বোঝা যায় বাইবেলে মানুষকে সর্বশ্রেষ্ঠ আসনে আসীন করে এই সুন্দর পৃথিবীকে মানুষের জন্য নির্মিত বলা হয়েছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি গভীর বাস্তুতন্ত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এরূপ চিন্তাধারা পৃথিবীর সমস্ত উপাদানের ওপর মানুষের অত্যাচারকে আরো বাড়িয়ে দেবে। ইহুদি ও খ্রিষ্টধর্ম দুটি প্রখ্যাত ধর্ম। পাশ্চাত্যের জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণের ক্ষেত্রে ইহুদি ও খ্রিষ্টধর্মের প্রভাব প্রসারিত। এখানেও মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশিত হয়েছে। দেকার্ত আত্মার বা মনের আবশ্যিক বৈশিষ্ট্য বা গুণ হিসাবে চিন্তা করাকে (to think) বুঝিয়েছেন। এই বৈশিষ্ট্য (চিন্তা করা) যাদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়, তাদেরকেই উন্নত জীব বা মানুষের অনুরূপ বলা যেতে পারে বলে দেকার্ত মনে করেন। কিন্তু দেকার্ত যুক্তির দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে বিচার বুদ্ধি বা চিন্তন ক্ষমতা একমাত্র মানুষেরই আছে। উদ্ভিদ বা মনুষ্যেতর প্রাণীর (না-মানুষ) বিচার বুদ্ধি বা চিন্তন ক্ষমতা বলে বাস্তবিক পক্ষে কিছু নেই। অতএব মানুষ

না-মানুষ অপেক্ষা উন্নততর জীব। লকের সম্পত্তিতত্ত্ব অনুসারে মানুষ নিজের স্বার্থে সম্পত্তি ধ্বংসের অধিকারও পায়। সম্পত্তি ধ্বংসের অধিকারের প্রসঙ্গটি পশুহত্যাকেও সমর্থন করে। নৈতিক দিক থেকে লকের সম্পত্তিতত্ত্ব আত্মবাদকে সমর্থন করে। আত্মবাদ প্রকৃতির ব্যবহারকে মানুষের শ্রমের ও ভোগের ক্ষমতাকেন্দ্রিক করে তোলে। তাই এই দৃষ্টিভঙ্গি মানবকেন্দ্রিক নৈতিকতার অনুগামী। কারণ এখানে প্রকৃতি মানুষের ভোগের উপকরণ, তার নিজস্ব মূল্য নেই। হিউম মনুষ্যেতর প্রাণীর (পশু,পাখি প্রভৃতি) বিচার শক্তির উল্লেখ করেন। পশুদের বিচার শক্তির আলোচনায় হিউম প্রথমেই বলেছেন এটি প্রতীয়মান হয় যে মানুষ যেমন অভিজ্ঞতার দ্বারা অনেক কিছু শেখে পশুরাও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অনেক কিছু শিখতে পারে। মানুষের মতো মনুষ্যেতর প্রাণীরাও অনুমান করতে পারে যে একই ঘটনা ঘটলে একই ধরনের কার্য ঘটবে। এভাবে সাদৃশ্যমূলক অনুমানের ভিত্তিতে পশুরাও পাঠ্য বস্তুর বিভিন্ন ধর্মের সঙ্গে পরিচিত হয়। পশুরা তাদের জন্মের পর থেকে ধীরে ধীরে বাহ্য জগতের বিভিন্ন বস্তুর ও বস্তুধর্মের সঙ্গে যেমন জল, আগুন, মাটি, পাথর উচ্চতা গভীরতা ইত্যাদির সঙ্গে পরিচিত হয় এবং তাদের সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে পশুদের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। অভিজ্ঞ পশু যত সহজে নিজেকে বিপদ থেকে মুক্ত করতে পারে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন নয় বা কম অভিজ্ঞতাসম্পন্ন পশু করতে পারে না। এর কারণ হলো অভিজ্ঞ পশু সদৃশ্য অনুমান করতে যতটা সমর্থ্য, অনভিজ্ঞ পশু সদৃশ্য অনুমান করতে ততটা পটু হয়ে ওঠে না। হিউম অবশ্য বলেন পশুদের অনুমান সামর্থ্য থাকলেও সে অনুমান প্রক্রিয়ার সচেতন বা যৌক্তিক পদ্ধতির আশ্রয় নির্ভর হওয়া সম্ভব নয়। সচেতনভাবে যৌক্তিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অনুমান করা পশুদের পক্ষে অসম্ভব কারণ এর

পেছনে আছে অবরোহ ও আরোহ যুক্তি। কিন্তু পশুদের অনুমানে যুক্তি বা বিচারবুদ্ধির কোন স্থান নেই। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, পশুরা বিচারশীল নয়। মানব শিশুদের অনুমান অনেক সময় বিচার বিশ্লেষণমূলক হয় না।

তৃতীয় অধ্যায়ে বাস্তুতন্ত্রের প্রেক্ষাপটে পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে 'Ecology' (বাস্তুতন্ত্র) বিষয়ে আলোচিত হয়েছে। সজীব উপাদান (biotic components) এবং জড় উপাদান (abiotic components) একত্রে মিলিত হয়ে বাস্তুতন্ত্র গঠন করে। অর্থাৎ বাস্তুতন্ত্র এমন একধরনের গুরুত্বপূর্ণ একক যেখানে সজীব ও জড় বা অজীব উপাদান পারস্পরিক মিথষ্ক্রিয়া করে। বাস্তুতন্ত্রের সজীব উপাদানের অন্তর্গত হল মানুষ। মানুষের সঙ্গে বাস্তুতন্ত্র তথা পরিবেশের প্রতিনিয়ত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ঘটে। মানুষ ও পরিবেশের পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলে যে নীতিসূত্রগুলির উদ্ভব হয়, সেগুলি যেখানে আলোচনা করা হয় তাকে পরিবেশ নীতিশাস্ত্র (Environmental Ethics) বলে। এই অধ্যায়ে Aldo Leopold –এর 'ভূমি নীতিবিদ্যা' আলোচিত হয়েছে। Leopold মনে করেন, সংরক্ষণ ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। প্রকৃতির যে উপাদানের কোনো অর্থনৈতিক মূল্য নেই, তারা সংরক্ষণযোগ্য নয় বলে মানুষ মনে করে থাকে। কিন্তু সকল উদ্ভিদ ও প্রাণী এক বৃহৎ জৈব সমাজের অংশ এবং এদের স্থায়িত্ব বা টিকে থাকা সমগ্র জীব সমাজের স্থায়িত্বের জন্য প্রয়োজন। কেবলমাত্র অর্থনৈতিক লাভ-ক্ষতির হিসাব করে যদি সংরক্ষণ নীতি নির্ধারিত হয় তবে তা আমাদের সকলের জন্য অমঙ্গলজনক। সমাজের সকল উপাদানেরই গুরুত্ব আছে বলে Leopold মনে করেন। তাই পরিবেশের যে উপাদান অর্থনৈতিকভাবে অ-লাভজনক তাকে নিয়ে চিন্তা না করে কেবল লাভজনক উপাদানকে

মূল্যবান মনে করলে পরিবেশগত সমস্যার সমাধান অসম্ভব। কারণ অর্থনৈতিক দিক থেকে সমাজের যে উপাদানগুলি লাভজনক তাকে কেন্দ্র করেই সরকারের সমস্ত প্রকল্প গৃহীত হয়। তাই সমাজের সকল উপাদানের উপর মানুষকেই গুরুত্ব দিতে হবে। তিনি বাস্তুতন্ত্রের গুরুত্বকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জীব পিরামিডের কথা বলেন। জমি ব্যবহারের ক্ষেত্রে মানুষ অর্থনৈতিকভাবে নিজের স্বার্থের কথাই ভাবে এবং এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, যাতে মানবসমাজেরই লাভ হয় কিন্তু এমন চিন্তাভাবনা পরিবেশ তথা জমির অবক্ষয় রোধ করতে পারে না। তিনি ভূমির সঙ্গে নৈতিক সম্পর্কের কথা বলেন। যেখানে তিনি ভূমির প্রতি ভালোবাসা, শ্রদ্ধা এবং প্রশংসার কথা বলেছেন। মূল্যবোধ ছাড়া ভূমিকে কখনোই রক্ষা করা যাবে না বলে তিনি মনে করেন। ভূমিকে অর্থনৈতিকভাবে বিচার না করে জনমানসে ভূমির প্রতি এক গভীর চেতনার উন্মেষ ঘটানোর দিশা তিনি দেখিয়েছেন। এই অধ্যায়ে Arne Naess দ্বারা অগভীর ও গভীর বাস্তুতন্ত্রের আলোচনা করা হয়েছে। অগভীর কিন্তু বর্তমানে খুবই শক্তিশালী একটি আন্দোলন অন্যটি গভীর কিন্তু তুলনামূলক কম শক্তিশালী একটি আন্দোলন, যা আমাদের মনোযোগের দ্বারা শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে। এই দুই প্রকার আন্দোলনের বৈশিষ্ট্যকে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস করেছেন Arne Naess। গভীর বাস্তুতন্ত্রের কোনো সংজ্ঞা না দিয়ে তিনি গভীর বাস্তুতন্ত্রের সমর্থনে কতগুলি নীতির উল্লেখ করেন। ‘গভীর’ শব্দের প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করতে গেলে আমাদের গভীর ও অগভীর বাস্তুতন্ত্রের পার্থক্য আলোচনা করতে হবে। গভীর বাস্তুতন্ত্রকে কোনো নির্দিষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক আদর্শের সঙ্গে তুলনা করা যায় না। জীবনের নানা দিক থেকে মানুষ গভীর বাস্তুতন্ত্রের ধারণার সঙ্গে সহমত পোষণ করেন। অন্যান্য সামাজিক আন্দোলনের মতো গভীর বাস্তুতন্ত্রের

সমর্থকরাও বেশ কিছু বাণী প্রচার করেন, যা মানুষকে একত্রিত হতে সাহায্য করে। কোনো পরিবেশগত সংকট উপস্থিত হলে মানুষ যাতে স্বাভাবিক প্রতিবাদ জানায়- এমন শিক্ষা গভীর বাস্তুতন্ত্র আমাদের দিয়ে থাকে।

চতুর্থ অধ্যায়ে পরিবেশ সম্পর্কে বৌদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করা হয়েছে। বৌদ্ধধর্মে শ্রমণের গণকে যে দশশীল পালন করতে হয়, তার মধ্যে অন্যতম হল প্রাণাতিপাত-বিরতি। এই শীলের অনুসরণ বৌদ্ধভিক্ষু এবং গৃহস্থ উভয়কে করতে বলা হয়েছে। কায়িকভাবে প্রাণাতিপাত থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে এবং অন্যের দ্বারা এই প্রাণাতিপাত করা, অন্যকে তা করতে সাহায্য করা বা প্রাণাতিপাতকে অনুমোদন করা থেকেও বিরত থাকতে কঠোরভাবে বলা হয়েছে। কেবল প্রাণবধ করাই যে হিংসা মনে করা হত তা নয়, দণ্ড কিংবা অস্ত্র দ্বারা আঘাত করাও হিংসা মনে হত। কোনো ব্যক্তিকে কর্কশ বাক্য বলা, অন্য কারো অনিষ্ট চিন্তা করাও হিংসা। তাই 'অহিংসা' শব্দটা বৌদ্ধ দর্শনে যথার্থ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যে শরীর, বাক্য কিংবা মন দ্বারা হিংসা করে না, যে কোনো প্রাণীকে কিঞ্চিতমাত্র পীড়া দেয় না সেই অহিংস হয়। উদ্ভিদ লতাদি বৃক্ষ এবং তাদের বীজ নাশ করাও হিংসা বলে মনে করা হত। ক্ষুদ্র বৃক্ষ, গুল্ম ইত্যাদির ক্ষতি করলে, ক্ষুদ্র প্রাণীকে বধ করলে কিংবা তাদের পীড়া দিলে হিংসা হয়। বিনয়পিটকে ব্যক্ত হয়েছে যে, প্রথমে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা সকল ঋতুতে সমানভাবে বিচরণ করত এতে জনগণ বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ হয়েছিল কারণ বর্ষা ঋতুতে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বিচরনের জন্য ক্ষুদ্র বৃক্ষ, গুল্ম ইত্যাদি আঘাতপ্রাপ্ত হয় এবং অনেক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রাণী মারা যায়। এই কথা যখন বুদ্ধের সম্মুখে আসে তখন তিনি নিয়ম করেন যে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা বর্ষাকালে একস্থান থেকে অন্যত্র গমন করবে না। পূর্বে বৃক্ষচ্ছেদন সম্পর্কে

মানুষের মধ্যে সচেতনতার অভাব ছিল। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা অনেকসময়ই বৃক্ষচ্ছেদন করতেন এবং সাধারণ মানুষ এর জন্য তাদের নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম করত। তাই বুদ্ধ একদিন সকল ভক্তকে ডেকে বলেন বৃক্ষচ্ছেদন অত্যন্ত গর্হিত কাজ। বহু ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রাণী, একেন্দ্রিয় যুক্ত জীব এই বৃক্ষকে আশ্রয় করেই বেঁচে থাকে। বৃক্ষচ্ছেদনে অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্ন ব্যক্তিদের প্রসন্নতা বৃদ্ধি ঘটে না। পক্ষান্তরে বৃক্ষচ্ছেদন হলে অধিকতর অপ্রসন্নতা উৎপন্ন হয়, তাই বৌদ্ধভিক্ষুদের বৃক্ষচ্ছেদন না করার কঠোর বিধান গৌতম বুদ্ধ দিয়েছেন। এমনকি বুদ্ধ একথাও বলেছেন কেউ যদি ভুলবশত কোনো হিংসা করে ফেলে তবে তাকেও তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। যেমন বিনয়পিটকে বলা আছে, ভিক্ষুগণ কখনও কোনো প্রাণবান বস্তুর প্রাণ হরণ করবে না। যদি কেউ এই প্রকারের কাজ করেন তবে তাকে ধর্মানুসারে শাস্তি ভোগ করতে হবে। তাছাড়া গো-চর্ম পরিধান না করার নির্দেশ বৌদ্ধ ধর্মে দেওয়া হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে মানুষের লোভ ও তার তথাকথিত উন্নয়নের বাসনা হলো পরিবেশগত সংকটের মূল কারণ। যেকোন তথাকথিত উন্নয়ন প্রক্রিয়ার অনিবার্য পরিণতি হলো কমবেশি পরিবেশ দূষণ। যত বেশি উন্নয়নের নামে কল-কারখানার সংখ্যা বাড়বে, তত বেশি ধোঁয়া, ক্ষতিকারক গ্যাস ও শিল্পজাত বর্জ্য পদার্থে পরিবেশ দূষণ বৃদ্ধি পাবে; পাশাপাশি প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার বাড়ায় ক্রমশ তাদের অপ্রতুলতা সৃষ্টি হবে। তাহলে কি প্রকৃতিকে রক্ষা করতে গেলে উন্নয়ন বন্ধ করে দিতে হবে? কিন্তু মানুষের প্রয়োজনে তথা প্রকৃতির স্বগতমূল্য স্বীকার করে যেমন প্রকৃতির অবক্ষয় রোধ করা কর্তব্য তেমনি মানব সভ্যতার অগ্রগতি বা উন্নয়নের ধারা স্তব্ধ করে

দেওয়া প্রকৃতিবিরুদ্ধ এক অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি নয় কি? যেকোনো শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ এ কথা স্বীকার করবেন পরিবেশ সংরক্ষণ একান্তভাবে গুরুত্বপূর্ণ, তথাপি উন্নয়নের ধারা স্তব্ধ করে মানুষ পুনরায় প্রাগৈতিহাসিক যুগের অরণ্যে ফিরে যাবে এমন আশা করাটাও চরম নির্বুদ্ধিতা। তাহলে প্রশ্নটা থেকেই গেল পরিবেশ সংরক্ষণ এবং উন্নয়ন- এই দুটি ক্রিয়ার সঙ্গতি একত্রে কিভাবে সম্ভব? তাছাড়া 'উন্নয়ন' বলতে আমরা ঠিক কী বুঝি- এইসব প্রশ্নের উত্তর এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে উন্নয়নের ধারণা মূলত অর্থনীতির সঙ্গে সম্পর্কিত। অর্থনৈতিক উন্নয়ন (Economic Development) জাতীয় উৎপাদন ও সম্পদ বৃদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুন্নত দেশে আর্থিক উন্নয়নকে অনেকাংশে দেখা হয় জাতীয় আয় বৃদ্ধির মাপকাঠিতে। বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনও মনে করেন উন্নয়নের অর্থনৈতিক তত্ত্ব নিয়ে অনুসন্ধান ও চর্চা খুব বেশিদিন শুরু হয় নি। কিছু বছর পূর্বে অর্থনীতির একটি উপধারা হিসেবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্ম হয়। উন্নয়নের অর্থনৈতিক তত্ত্ব নিয়ে অনেক চিন্তাবিদ সংশয় প্রকাশ করেছেন। বাস্তবিকপক্ষে অর্থনৈতিক উন্নয়নতত্ত্ব অনগ্রসরতা দূরীকরণে (যা অর্থনীতির আলোচনার মূল) তেমন কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করেনি। অমর্ত্য সেন যুক্তি প্রদান করে দেখিয়েছেন মানবিক উন্নয়ন ও আর্থিক সমৃদ্ধির মধ্যে যদি সাযুজ্যতার (one to one correspondence) সম্বন্ধ থাকে তবে আমাদের ব্যবহারিক দৃষ্টিতে মানুষের জীবনকে সর্বাঙ্গীনভাবে সমৃদ্ধ করা (যাকে মানবিক উন্নয়ন বলে থাকি) ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিকে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত হতে নিশ্চয়ই দেখতাম; কিন্তু যেহেতু তা আমরা দেখি না তাই আর্থিক সমৃদ্ধি কখনোই জীবনের লক্ষ্য হতে পারে না। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি কেবল মানবিক উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি উপায় হতে পারে। সেই

কারণেই অনেক দেশের স্থূল জাতীয় উৎপাদন (Gross National Product/GNP) যা আর্থিক সমৃদ্ধির সূচক, বেশি হওয়া সত্ত্বেও সেই দেশের জনগণের অকাল মৃত্যু রোধ, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, স্বাস্থ্যপরিষেবা উন্নতি করে মানুষের অসুস্থতার হ্রাস প্রভৃতি যা মানবিক উন্নয়নের মূল সোপান- তা করতে আজও ব্যর্থ হচ্ছে। ডক্টর সেনের মতে, উন্নয়ন হলো সক্ষমতা বৃদ্ধির দ্বারা জীবনের গুণগত মানের বিশ্লেষণ। মানুষের কাজের মাধ্যমেই তার সক্ষমতা বৃদ্ধি ঘটে। একটি ভালো জীবন যাপনের জন্য ব্যক্তির কাজকর্ম (functioning) করা প্রয়োজনীয়। সক্ষমতা কোন ব্যক্তির দ্বারা অর্জনযোগ্য ক্রিয়াকলাপের সংমিশ্রণকে বোঝায়। মানুষের উন্নয়ন বলতে সামাজিক সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির দ্বারা মানুষের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জনগণের জীবনযাত্রার গুণগত মানের উন্নয়নকে বোঝায়। স্বাস্থ্য পরিষেবা পাওয়ার সুযোগ, শিক্ষা, সামাজিক নিরাপত্তা ও অধিকার প্রভৃতি ক্ষেত্রে উন্নতি করলে মানুষের জীবনের গুণগত মানের উন্নতি ঘটে। তাছাড়া এই অধ্যায়ের স্থিতিশীল উন্নয়নের বিভিন্ন অর্থ ও নীতিসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ব্রুটলেট কমিশনের রিপোর্ট অনুসারে স্থিতিশীল উন্নয়নের ধারণা পরিবেশগত দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যদিও সে গুরুত্ব অর্থনৈতিক দিক থেকেই বলে অনেকে মনে করেন। কারণ অনেকের কাছে স্থিতিশীল উন্নয়ন মূলত অর্থনৈতিক স্থিতিশীল উন্নয়নের সঙ্গে সমার্থক। পরিবেশের আলোচনা প্রসঙ্গে বিভিন্ন সরকারি দপ্তর অনেক নীতি-নির্ধারণের ক্ষেত্রে স্থিতিশীল উন্নয়নের ধারণাকে গুরুত্ব দিয়ে পরিবেশ সংরক্ষণের কথা স্মরণ করেন। জনকল্যাণমুখী অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিক থেকে স্থিতিশীল উন্নয়নকে একটি বিশেষ অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন হিসাবে ধরা হয়, যা মানবকল্যাণের ন্যূনতম স্তর বজায় রাখতে সাহায্য করে। এইভাবে স্থিতিশীল উন্নয়ন

কিছু প্রয়োজনীয়তার সমতুল্য হয়ে ওঠে এবং এই ভালো-হওয়া (well being) অর্থাৎ আমাদের প্রয়োজনীয়তার সমতুল্য হয়ে ওঠা বিষয়টি সময়ের সাথে কখনও আমরা হ্রাস পেতে দেখি না। স্থিতিশীল উন্নয়নের এই বৈশিষ্ট্যটি মানবকল্যাণের একটি নির্দিষ্ট ধারণা এবং সময়ের সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট স্তরের মানবকল্যাণ বজায় রাখার জন্য আমাদের কী করা প্রয়োজন তা সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে। এছাড়া স্থিতিশীল উন্নয়নের সাতেরটি লক্ষ্যের কথা বলা হয়েছে যা ২০৩০ সালের মধ্যে অর্জন করার লক্ষ্য আমাদের দেওয়া হয়েছে।

পরিশেষে মূল্যায়ণ ও সিদ্ধান্ত অংশে আমি পরিবেশগত সংকট দূর করতে সকল রাষ্ট্রের সমবেত প্রচেষ্টাকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনার কথা বলেছি। এর পাশাপাশি আমাদের ভারতবর্ষে পরিবেশ সুরক্ষার জন্য প্রদত্ত বিশেষ কিছু আইনের উল্লেখ করেছি। কিন্তু আমার মনে হয় এসব আইন করে পরিবেশগত সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়। কারণ মানুষ কখনোই উন্নয়ন বন্ধ করে গুহাবাসী আদিম জীবনে ফিরে যাবে না বা এমনটা করাকে আমি সমর্থনও করি না। আমি কেবল বলতে চাইছি, মানবসভ্যতা যতদিন টিকে থাকবে ততদিন উন্নয়নের ধারা অব্যাহত থাকবেই। তাই পরিবেশের অবক্ষয় রোধ করতে এবং পাশাপাশি উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখতে আমাদের দার্শনিক চিন্তাধারার প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে স্থিতিশীল উন্নয়নের আলোচনা আমি করেছি। আমি স্থিতিশীল উন্নয়নের প্রেক্ষিতে পরিবেশ রক্ষার বিষয়ে যুক্তির মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করেছি স্থিতিশীল উন্নয়নের মূল ভাবধারাকে বজায় রাখতে হলে পরিবেশ সংরক্ষণ কতটা জরুরী। কিন্তু এক্ষেত্রে সমস্যা হলো মানুষ স্বার্থপর জীব। তত্ত্বগতভাবে মানুষ যতই পরিবেশ সংরক্ষণ এবং স্থিতিশীল উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা

করুক না কেন, নিজের অর্থনৈতিক সুবিধার জন্য পরিবেশের ক্ষতি করতে বিন্দুমাত্র পিছুপা হয় না। অন্যদিকে স্থিতিশীল উন্নয়নে পরিবেশের জন্য পরিবেশকে রক্ষা করার কথা বলা হয়নি- যা কখনোই পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে কার্যকরী সিদ্ধান্ত হিসাবে গৃহীত হতে পারে না।

এরপর বৈদিক চিন্তাধারার প্রেক্ষিতে পরিবেশরক্ষা তথা প্রাণী সংরক্ষণের বিষয়ে যে অভিমতগুলিকে পাওয়া গেছে, তার কয়েকটিকে আমি এই সিদ্ধান্ত অংশে ব্যাখ্যা করেছি। কিন্তু পরিবেশ তথা প্রাণীকে সংরক্ষণের জন্য বেদে বিভিন্ন পরিবেশ-বান্ধব চিন্তাধারা উল্লিখিত থাকলেও বৈদিক যজ্ঞে পশুহত্যার বিধি ইত্যাদি বৈদিক চিন্তার মধ্যেও পশুপাখিকে রক্ষার বিষয়ে অসংগতিকে প্রকাশ করে। তাছাড়া বেদে প্রকৃতিকে রক্ষা করার জন্য বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিষয়ের সঙ্গে ঈশ্বরকে জুড়ে দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনাকে ঈশ্বরের অলৌকিক শক্তি হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে শিক্ষিত বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনার বৈজ্ঞানিক কারণ জানেন এবং তাঁরা ঐশ্বরিক ভীতি থেকে অনেকাংশে মুক্ত। তাই প্রাকৃতিক বিষয়ের সঙ্গে ঈশ্বরকে জুড়ে প্রকৃতিকে রক্ষা করা যাবে- বৈদিক ঋষিগণের এমন চিন্তাধারা বর্তমানে একবিংশ শতাব্দীতে কতটা কার্যকরী হবে, সে প্রশ্ন থেকেই যায়।

অন্তিমে, মানুষের উন্নয়ন ও পরিবেশ সংরক্ষণের মধ্য একটি সামঞ্জস্য বিধানের দিশা বৌদ্ধ দর্শনের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় বলে আমি আমার অভিসন্দর্ভে দেখানোর চেষ্টা করেছি। এই প্রসঙ্গে বৌদ্ধ দর্শনের দার্শনিক চিন্তার মধ্যে গভীর বাস্তুতান্ত্রিক চিন্তার ও স্থিতিশীল উন্নয়নের মূল ভাবধারার প্রতিফলন কীভাবে ঘটেছে তাও আমি 'মূল্যায়ন ও সিদ্ধান্ত' অংশে দেখানোর চেষ্টা করেছি। বৌদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি মানুষ ও পরিবেশকে গভীরভাবে

একে অপরের সঙ্গে যুক্ত করতে এবং পরস্পর নির্ভরশীলতার তত্ত্বের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে চেতনার উন্মেষ ঘটাতে পারে বলে আমার মনে হয়। এই প্রসঙ্গে আমার অভিসন্দর্ভের মূল প্রশ্ন অর্থাৎ, পরিবেশের অবক্ষয় রোধ এবং মানুষের উন্নয়নের (প্রকৃত উন্নয়ন) ধারা অব্যাহত রাখা কীভাবে সম্ভব– তার উত্তর আমি বৌদ্ধ দর্শনের প্রেক্ষিতে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি।

ভূমিকা

মানব সভ্যতার ইতিহাস হল বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা প্রকৃতিকে জয় করার এক অদম্য প্রয়াস, কখনও আবার প্রকৃতিকে জয় করার লক্ষ্যে মানুষ পরিবেশের অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করে। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল বিশ্ব উষ্ণায়ন ও পৃথিবীর ওজনস্তরের ক্ষতি, যা পৃথিবীকে ধ্বংসের সম্মুখীন করেছে। কিন্তু বর্তমানে প্রত্যক্ষভাবে যেসব পরিবেশজনিত সঙ্কট সর্বাধিক বৃদ্ধি পাচ্ছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল অ্যাসিড বৃষ্টি, ভূগর্ভে বিশুদ্ধ জলের অনুপস্থিতি, নদী-জল-সমুদ্রে জলদূষণ এবং জলবাহিত রোগের ফলে পৃথিবীর উন্নয়নশীল দেশগুলিতে অনেক মানুষ বছরে মারা যায়। ভূমির গুণগতমান পরিবেশের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক। ভূমি একটি স্থির সম্পদ, তাই জনসংখ্যার অতিরিক্ত চাপ প্রান্তিক জমিগুলিকে কৃষি জমির প্রসার ঘটাতে বাধ্য করেছে। যদিও দেখা যাচ্ছে যে পৃথিবীর মোট ভূমি ভাগের মাত্র ১১ শতাংশ বর্তমানে কৃষির অধীন তবে দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে আর খুব সামান্য বাড়তি জমি কৃষির অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব, উদাহরণস্বরূপ ভারতে মোট এলাকার ৫৭ শতাংশ কৃষির অধীন।[1] এমনকি ফসলা জমিও বর্তমানে বাণিজ্যিক কারণে অত্যধিক মাত্রায় ব্যবহার করা হচ্ছে। পরিবেশে এই ধ্বংস পৃথিবীর উপর যেমন বিধ্বংসী প্রভাব ফেলে, তেমনই সমগ্র মানবজাতির অস্তিত্বকেও সংকটের সম্মুখীন করেছে।

প্রকৃতির সৃজনশীল এবং নান্দনিক মূল্যও অপরিসীম। প্রকৃতির মধ্যে রয়েছে বহু ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদ; যেমন- খনিজ দ্রব্য, মূল্যবান উদ্ভিদ ইত্যাদি। তাই প্রকৃতির

[1] বসু, রথীন্দ্রনারায়ণ (সম্পা.). (২০০১). *পরিবেশ.* কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়. পৃঃ ১৫৯.

অর্থনৈতিক গুরুত্বও অপরিসীম। সুতরাং, প্রকৃতির ক্ষতি অর্থনৈতিক দিক থেকেও সঙ্কটজনক। তাই বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন মানবজাতির পরিবেশ রক্ষায় মনোনিবেশ করা বাঞ্ছনীয়।

বর্তমানে মানুষের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের সমস্যার পাশাপাশি এক নতুন সমস্যা হল পরিবেশ সমস্যা। জনসংখ্যার দ্রুত বিস্ফোরণের কারণে ভূমি, জল, বায়ু ক্রমশ তাদের স্বাভাবিক ধর্ম ও প্রকৃতি হারাচ্ছে। বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয় যেমন- ভূমিকম্প, খরা, বন্যা, জলবায়ু পরিবর্তন, জলদূষণ, সর্বোপরি পরিবেশ দূষণ শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে ভাবিয়ে তুলেছে। তথাপি মানুষ প্রতিনিয়ত নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য পরিবেশের অপূরণীয় ক্ষতি করে চলেছে। এর ফলে পরিবেশের সঙ্গে মানুষের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক হারিয়ে যাচ্ছে বরং সেই সম্পর্ক সংঘাত ও দ্বন্দ্বের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। ক্রমশই পরিবেশে জীবকূলের অবস্থা আরও বিপজ্জনক হয়ে উঠছে। পরিবেশের এই ধ্বংসলীলা থেকে মানবজাতিও হয়তো রক্ষা পাবে না। এমন অবস্থায় পরিবেশ সম্পর্কিত আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেয়েছে। দর্শনের জগতে পরিবেশকে ঘিরে বিভিন্ন চিন্তাভাবনা পূর্ব থেকেই ছিল। দর্শনের আদর্শমূলক নৈতিক আলোচনা পরিবেশ রক্ষার দ্বারকে আরও উন্মুক্ত করেছে।

এখন দেখা যাক 'পরিবেশ' শব্দটির অর্থ কি? এই পরিবেশ শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয় 'environment' শব্দটি। এখন দেখা যাক্ এর অর্থ কি দাঁড়ায়। 'Environment' কথাটি এখন বহুল প্রচলিত এবং প্রায় সর্বজনবিদিত। যেকোন জীবের পারিপার্শ্বিক অবস্থাই তার পরিবেশ। এক কথায় বললে, জীবের পরিবেষ্টক ও প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানসমূহের সমষ্টিকে বলা হয় জীবের পরিবেশ।

'Environment' শব্দটি একটি French শব্দ। যা 'Environ' বা 'Environner' থেকে এসেছে। যার অর্থ, 'around' বা 'to surround' অর্থাৎ ঘিরে রাখা।[2] এই 'Environment' শব্দটি আমাদের চারিপাশে অবস্থিত সমস্ত কিছুকেই বোঝায় যা আমাদের ঘিরে রেখেছে। এর অন্তর্ভুক্ত মানুষ, পশুপাখি, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীব, উদ্ভিদ প্রভৃতি সবকিছু। এমনকি 'Environment' শব্দটি হাওয়া, মাটি, আবহাওয়া, জল, খাদ্য সরবরাহ ইত্যাদিকেও বোঝায়। বাস্তবিকপক্ষে 'Environment' হল জীবনের মূল আধার এবং সমস্ত সামগ্রীর উৎস। 'Environment'-এর বাংলা প্রতিশব্দ হল 'পরিবেশ'। এর অর্থ হল পরিবেষ্টন। অর্থাৎ চারপাশে যা আমাদের পরিবেষ্টিত করে রাখে, তাই হল পরিবেশ।

বিভিন্ন প্রয়োজনীয় উপাদানের জন্য জীব পরিবেশের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল এবং পরিবেশের সঙ্গে তার সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। 'Environment' শব্দের আভিধানিক অর্থ হল চতুষ্পার্শস্থ বা পরিবৃতশীল। S.C Kendeigh ১৯৭৪ সালে পরিবেশের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন- পরিবেশ হল অজীবজ এবং জীবজ অবস্থাসমূহের এক সম্মিলিত যোগফল, যেগুলি জীবকে কর্মকাণ্ডে সাড়া দিতে প্রভাবিত করে।[3] (The environment is the sum total of physical abiotic and biotic conditions influencing the responses of the organism.)

Maelzer ১৯৬৫ সালে পরিবেশের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন- যেসব শর্ত সমূহ প্রত্যক্ষভাবে প্রাণীর অস্তিত্বরক্ষা বংশবিস্তারের সম্ভাবনা কে প্রভাবিত করে সেই

---

[2] মুখোপাধ্যায়, আনন্দদেব ও চন্দ, বিনয় (সম্পা.). (২০১২). *পরিবেশ প্রসঙ্গ* (প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় ভাগ). মেদিনীপুর: অভীক পাবলিকেশন্. পৃঃ ৮৮.

[3] ঘোড়ই, সন্তোষকুমার ও বণিক, মোহনলাল. (২০১১). *পরিবেশবিদ্যা.* কলকাতা: পারুল প্রকাশনী. পৃঃ ১.

সব শর্ত সমূহের সম্মিলিত যোগফলই হলো পরিবেশ।[4] (Environment may be defined as the sum total of everything the directly influences the animal's chances to survive and reproduce.)

অনুমান করা হয় যে, প্রায় হাজার কোটি বছর পূর্বে পৃথিবীর সৃষ্টি হয়। অনেকে মনে করেন, সৃষ্টিকালে এই পৃথিবী একটি উত্তপ্ত বাষ্পপিন্ড ছিল। বহু কোটি বছর ধরে, বহু বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে, পৃথিবী তার আকার-আকৃতি পেয়েছে। আমাদের পৃথিবী সৌরজগতের একটি গ্রহ। পৃথিবী ছাড়াও সৌরজগতে আরও অনেক গ্রহ আছে কিন্তু এগুলির কোনোটিতে প্রাণের অস্তিত্ব আছে কিনা তা আজও জানা সম্ভব হয়নি। কারণ প্রাণধারণের জন্য অনুকূল পরিবেশের প্রয়োজন, কেবলমাত্র পৃথিবীতেই বাঁচার অনুকূল পরিবেশ রয়েছে। জীবের বাঁচার জন্য অর্থাৎ তার জন্ম, বৃদ্ধি ও বংশবিস্তারের জন্য চাই অনুকূল পরিবেশ। এই পরিবেশেই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করে জীবের বৃদ্ধি ঘটে। পরিবেশের মধ্যে যেমন জৈব উপাদান হিসাবে উদ্ভিদ, প্রাণী, মানুষ প্রভৃতি বর্তমান; তেমনই পরিবেশের ভৌত উপাদানের মধ্যে জলবায়ু, আলো, মৃত্তিকা ইত্যাদি সবকিছুই অন্তর্গত। পৃথিবী আমাদের জীবনধারণের এই সমস্ত পরিবেশগত উপাদান যথার্থভাবে প্রদান করেছে, তাই জীবের বাসস্থান হিসাবে পৃথিবীতে সবচেয়ে উপযোগী পরিবেশ বর্তমান।

'পরিবেশ' একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। নানারকম গাছপালা, মানুষ, পশুপাখি, মাছ, কীটপতঙ্গ, আলো, জল, উত্তাপ, বাতাস, মাটি এবং মানুষের তৈরী এই জগৎ নিয়ে সৃষ্টি হয় পরিবেশ। তাই পরিবেশ বলতে উদ্ভিদ, প্রাণী, আলো, জল, বাতাস ও মাটির

[4] তদেব. ১.

মিলিত সক্রিয় অবস্থানকে বোঝায়। পরিবেশের উপাদানগুলির উপর আমরা একান্তভাবে নির্ভরশীল। প্রাণী হলে খাদ্যের জন্য তাকে নির্ভর করতে হয় পরিবেশের অন্যান্য উদ্ভিদ ও প্রাণীর উপর, তৃষ্ণার জন্য জল, শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য অক্সিজেন, আশ্রয়ের জন্য মাটি প্রভৃতির উপর নির্ভর করতে হয়। সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকেই মানুষ পরিবেশের কল্যাণময় ভূমিকা সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল ছিল। নানা দেশের মানুষ সূর্য, অগ্নি, জল, বাতাস, উদ্ভিদ ও নানা প্রজাতির প্রাণীকে দেবতা জ্ঞানে আরাধনা করে এসেছে। উদ্ভিদের রূপ, রস, ব্যাপ্তি, সজীবতা ও সহনশীলতাকে প্রাচীন ভারতবর্ষে জীবনের আদর্শরূপে দেখা হয়েছে। কঠোপনিষদে ব্রহ্মান্ডকে একটি প্রাচীন অশ্বত্থ বৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। যার ছায়ায় জীব জীবন ধারণ করে। অর্থাৎ পরিবেশের ছত্রছায়ায় আমাদের বেঁচে থাকা, বেড়ে ওঠা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থ ব্যবস্থা, জীবনযাত্রা ইত্যাদি সবকিছুই নির্ভরশীল।[5] তাই ভালোভাবে বাঁচার জন্য মানুষ পরিবেশকে জানতে চায়, তাকে রক্ষা করতে চায়। কিন্তু তার পূর্বে বিশ্ব প্রকৃতির সঙ্গে জীবনের সম্পর্ককে জানা প্রয়োজন। পরিবেশচর্চার দর্শন হল প্রকৃতি সম্পর্কে এক সার্বিক দৃষ্টিলাভের অনুসন্ধান। জীবন সম্পৃক্ত পরিবেশের সঠিক ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রচেষ্টা, যার সাহায্যে বিশ্ব প্রকৃতি ও জীবজগতের স্বরূপ অবহিত হই তারই দ্বারা একাধারে পার্থিব জীবনকে সুরক্ষিত করা যায় এবং সেই সঙ্গে যথার্থভাবে নিজের জীবনকে পরিচালিত করা ও পরিবেশকে যথাসম্ভব রক্ষা করার মানসিকতা সৃষ্টি করাই হল পরিবেশ দর্শনের মূল লক্ষ্য। পরিবেশচর্চার মূল নিহিত আছে দর্শনের মধ্যে। পৃথিবীতে মানুষ সহ সমগ্র জীব যাতে স্বাভাবিকভাবে বসবাস ও সমৃদ্ধিলাভ করে তাই পরিবেশের উপাদানগুলির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা এবং

[5] গুপ্ত, শুভেন্দু. (২০১২). *প্রাচীন ভারতে পরিবেশ চিন্তা.* কলকাতা: সাহিত্য সংসদ প্রা. লি. পৃঃ ১৫৪-১৫৬.

পরিবেশের সমস্যা অনুধাবন করে তার স্থায়ী সমাধানের ব্যবস্থা করা ও পরিশেষে সর্বসাধারণকে পরিবেশমনস্ক করে তোলা হল পরিবেশ দর্শনের মূল উদ্দেশ্য।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকেই পরিবেশ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছে সারা বিশ্বব্যাপী। সুদূর অতীতে আদিম মানুষ বাস করত প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় সঙ্গতি রেখে। পরবর্তীকালে মানুষের জীবনযাত্রা পরিবির্তিত হয়েছে। মানুষ প্রকৃতিকে নিজের মতো করে ব্যবহারযোগ্য করে নিয়েছে। প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তে সৃষ্টি হয়েছে মনুষ্যসৃষ্ট পরিবেশ। সমাজ ও সংস্কৃতির বিবর্তন ও উত্তরোত্তর উন্নতির ফলে উদ্ভুত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশও মানবজীবনে ও জীবজগতে গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করে। পরিবেশ বিষয়ক চিন্তাভাবনা অনেক প্রাচীন হলেও পরিবেশ সচেতনতার বিষয়টি সাম্প্রতিককালের। এই ভাবনার বীজ আমরা বপন করতে দেখি আমাদের প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে, উপনিষদে, এমনকি আমাদের আর্য মহাকাব্যদ্বয় রামায়ণ ও মহাভারতে। পরবর্তীকালে কবিদের রচনাতেও পরিবেশ ভাবনা ও পরিবেশ সচেতনতা স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। বৈদিকযুগের সরলপ্রাণ আর্যগণ প্রকৃতির প্রত্যেক বিস্ময়কর ঘটনা ও কার্যের পশ্চাতে এক একজন দেবতার অস্তিত্ব কল্পনা করেছেন। ঋক্ বেদের পুরুষসূক্তে (১০/৯০)[6] এবং নাসদীয়সূক্তে (১০/১২৯)[7] বৈদিক ঋষিগণের সৃষ্টি বিষয়ক ধ্যানধারণা প্রতিফলিত হয়েছে। পুরুষসূক্তে জগৎ স্রষ্টার বিশ্বব্যাপী রূপের আভাস স্পষ্ট। সৃষ্টির সূচনায় পুরুষ কিভাবে নিজেকে সমর্পন করলেন, কিভাবে সেই একক সত্তা স্থাবর জগতাত্মক বিশ্বপ্রপঞ্চে পরিণত হল তার বর্ণনা এই সূক্তে পাওয়া যায়। ঋক্

[6] দত্ত, রমেশচন্দ্র (অনুঃ). ঋগ্বেদ সংহিতা (দ্বিতীয় খণ্ড). কলকাতাঃ হরফ প্রকাশনী. পৃঃ ৫৮৬.

[7] দত্ত, রমেশচন্দ্র (অনুঃ). ঋগ্বেদ সংহিতা (দ্বিতীয় খণ্ড). কলকাতাঃ হরফ প্রকাশনী. পৃঃ ৬৪০.

বেদের দশম মণ্ডলের নাসদীয় সূক্তে প্রকাশিত হয়েছে সৃষ্টির পূর্বে পরমাত্মার অস্তিত্ব। সৃষ্টির পূর্বে সৎ-অসৎ, মৃত্যু-অমৃত্যু, দিন-রাত্রি ইত্যাদি কোনো কিছুই ছিল না। সমস্ত স্থান ছিল অন্ধকার ও জলে আচ্ছন্ন। প্রাকৃতিক যে সৌন্দর্যকে ঋষিগণ দেবতাজ্ঞানে পূজা করতেন তা কার্যমাত্র। প্রকৃতি বা পরিবেশের প্রতি শুধু যে সহমর্মী তাই নয়, প্রকৃতিকে সযত্নে রক্ষা করার জন্য সচেতনতারও স্পষ্ট ইঙ্গিত বিভিন্ন বৈদিক সংহিতায় পাওয়া যায়। বৈদিক সংহিতায় এবং সংহিতার পরবর্তীকালে সংস্কৃত সাহিত্যে ও নাটকে প্রতিফলিত হয়েছে প্রকৃতি সচেতনতা ও প্রকৃতির প্রতি সহমর্মিতা। সেখানে বৃক্ষকে দেবতার আসনে বসিয়ে অরণ্যকে বনদেবী হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রাচীন ভারতে প্রকৃতি তথা পরিবেশের গুরুত্ব ছিল শ্রদ্ধাময়।

পরিবেশ হল সার্বিক পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং তার প্রভাব যা জীবের জীবনধারণ, বুদ্ধি ও উন্নয়নকে প্রভাবিত করে। প্রত্যেকটি জীবের একটি নিজস্ব পরিবেশ থাকে এবং পারিপার্শ্বিক পরিবেশ থেকে সম্পদ সংগ্রহ করে অভিযোজন ও উন্নয়ন প্রত্যেকটি জীবেরই কাম্য। জীব এককভাবে পরিবেশে বেঁচে থাকতে পারে না। অজীব উপাদানের সাহচর্য্য যেমন তার প্রয়োজন, তেমনই বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণী, কীট-পতঙ্গ, উদ্ভিদ প্রভৃতি সকলের সঙ্গে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে মানুষ বেঁচে থাকে। প্রধানত পরিবেশকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সামাজিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান থাকে। এদের মধ্যে অজীব ও সজীব দুটি ভাগ করা হয়।[৪] অজীব উপাদানের মধ্যে চারটি উপাদান হল- (ক) ভূ-

[৪] মুখোপাধ্যায়, এ. ও আগরওয়াল, এস. পি. (২০০০). *আধুনিক পরিবেশবিদ্যা.* কলকাতা: ভট্টাচার্য ব্রাদার্স. পৃঃ ৪-১১.

প্রকৃতিগত উপাদান (Topographic factors); যেমন- উচ্চতা, ঢালুপ্রকৃতি, খাঁড়াভাব প্রভৃতি জলবায়ু, প্রাণী ও উদ্ভিদের ভৌগোলিক অবস্থান নিয়ন্ত্রণ করে। (খ) তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, বায়ুপ্রবাহ প্রভৃতি হল জলবায়ু সংক্রান্ত উপাদান (Climatic factors)। (গ) সৌরশক্তি, বায়ুচাপ, ভূ-চৌম্বকশক্তি প্রভৃতি হল ভৌত উপাদান (Physical factors)। (ঘ) অক্সিজেন, জল, মাটি, কার্বন-ডাই-অক্সাইড এবং প্রায় চল্লিশটি মৌল উপাদান; যেমন- নাইট্রোজেন, ফসফরাস, ক্যালশিয়াম, পটাশিয়াম, আয়রন, সালফার, ম্যাগনেশিয়াম প্রভৃতি হল রাসায়নিক উপাদান (Chemical factors)।

সজীব উপাদানের মধ্যে সব জীবকেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়। একটি বিশেষ জীবের চারপাশে অসংখ্য জীব আছে। প্রতিনিয়ত পারস্পরিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে প্রত্যেকটি জীবের অস্তিত্ব বজায় থাকে। এই জীবগুলিকে চারটি প্রধান জীবগোষ্ঠীতে ভাগ করা যায়। যেমন- মানুষ, মনুষ্যেতর প্রাণী, উদ্ভিদকূল ও জীবাণুসমূহ (ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস প্রভৃতি)। জীবের নিজের শরীরের মধ্যে যেমন অন্তঃপ্রক্রিয়া চলছে, তেমনই জীবের অবস্থানকারী পরিবেশের মধ্যেও অন্তঃপ্রক্রিয়া বর্তমান। পরিবেশ অনুকূল হলে জীবের বৃদ্ধি হয় ও জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং পরিবেশ প্রতিকূল হলে জীবের বৃদ্ধির হ্রাস ঘটা একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। এমনকি জীবের অবলুপ্তিও ঘটতে পারে। পরিবেশের উপাদানগুলির পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের গুণগত ও পরিমাণগত তারতম্য ঘটে, সৃষ্টি হয় পরিবেশ বৈচিত্র্য যা কখনও কখনও জীবের উপর বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করে। এই অন্তঃপ্রক্রিয়া কেবলমাত্র প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, এটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য মনুষ্যসৃষ্ট পরিবেশের ক্ষেত্রে।

এবার আলোচনা করা যাক, সামাজিক পরিবেশ প্রসঙ্গে। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। মানুষের সমাজে বিভিন্ন সংগঠন থাকে। যথা- পরিবার, গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় প্রভৃতি। পরিবারের মধ্যে যেমন বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত আদান-প্রদান হচ্ছে, তেমনই বিভিন্ন গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রতিনিয়তই শিক্ষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, ধর্ম, ক্ষমতা ভোগ, খেলাধূলা প্রভৃতির মাধ্যমে আদান-প্রদান হচ্ছে যা পরিবেশ চর্চার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ নির্ণায়ক দিক। সমাজ হল একটি বৃহত্তম সংগঠন। একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলে বসবাসকরী একই সংস্কৃতি সম্পন্ন মানুষের বিভিন্ন সম্প্রদায় এবং প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পারস্পরিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে সংগঠিত গোষ্ঠীকে 'সমাজ' নামে ভূষিত করি। সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর অন্তঃক্রিয়ার ফলে উদ্ভুত পরিবেশকে সামাজিক পরিবেশ বলা হয়ে থাকে। প্রাকৃতিক পরিবেশ যেমন পরিবর্তনশীল, সামাজিক পরিবেশও সর্বদা পরিবর্তিত হচ্ছে এবং অপরকে প্রভাবিত করছে। কিন্তু মানুষ প্রতিনিয়ত নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য পরিবেশের অপূরণীয় ক্ষতি করে চলেছে। এর ফলে পরিবেশের সঙ্গে মানুষের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের অবসান ঘটছে বরং সেই সম্পর্ক সংঘাত ও দ্বন্দ্বের পর্যায়ে পৌঁছে যাচ্ছে। ক্রমশই পরিবেশে জীবকূলের অবস্থা আরও বিপজ্জনক হয়ে উঠছে। পরিবেশের এই ধ্বংসলীলা থেকে মানবজাতির রক্ষা পাওয়া বেশ কঠিন হয়ে পড়েছে। এমন অবস্থায় পরিবেশ দার্শনিকদের তাত্ত্বিক অলোচনাও গুরুত্ব পাচ্ছে। দর্শনের জগতে পরিবেশকে ঘিরে বিভিন্ন চিন্তাভাবনা পূর্ব থেকেই ছিল। দর্শনের আদর্শমূলক নৈতিক আলোচনা পরিবেশ রক্ষার দ্বারকে আরও উন্মুক্ত করেছে।

পৃথিবীর বুকে মানুষকে বেঁচে থাকতে হলে বাস্তুতন্ত্র বা পরিবেশের সমগ্র উপাদানের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে চলতে হয়। বাস্তুতন্ত্রের উপর মানুষের প্রভাবও

সুনিয়ন্ত্রিত হওয়া প্রয়োজন। শুধুমাত্র মানব সমাজের স্বার্থচিন্তা করাটা খুব একটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়, চিন্তা করতে হবে পরিবেশের সমগ্র উপাদানের স্বার্থ বিষয়ে। পরিবেশের প্রতি আমাদের যে দায়-দায়িত্ব রয়েছে তাকে যথার্থভাবে পালন করা খুব জরুরি। এই দায়িত্ববোধে নৈতিক চেতনা সমৃদ্ধ হওয়া আবশ্যক। মানুষের আচার-আচরণে পরিবেশের প্রতি সম্ভ্রমপূর্ণ ও বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব প্রকাশ পেতে হবে। পরিবেশ সমস্যাকে কেবল বৈজ্ঞানিক জ্ঞান দিয়ে মোকাবিলা করা যায় না। তাই আমাদের সকলকে একত্রিত হয়ে এই পরিবেশ সমস্যার সমাধান করতে হবে।

বিভিন্ন ভৌগোলিক পরিবেশে বিভিন্ন সমাজ গড়ে উঠেছে। বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিবেশ আছে। সমাজ-সংস্কৃতির তারতম্য অনুসারে পরিবেশের উপলব্ধিরও তারতম্য ঘটেছে। পূর্বেই আলোচিত হয়েছে পরিবেশের ক্ষতি বা পরিবেশ দূষণ মানব সমাজের জন্য বর্তমানে এক বিরাট সমস্যা। মানুষের ক্রিয়াকলাপের কারণে পরিবেশ দূষণ ও পরিবেশের বিপর্যয় বর্তমানকালে বিপদসীমা অতিক্রম করে মানুষের অস্তিত্বকেই ধ্বংসের সামনে উপস্থিত করেছে। একথা সত্য যে, আমরা বিভিন্ন সংস্কৃতিতে পরিবেশের গুণগত উপলব্ধি ও মাত্রাগত ব্যবহার জানতে পারলে পরিবেশের অবনয়ন রোধে কিছুটা হলেও সফল হব। যদিও অনেকে মনে করেন, সংস্কৃতির থেকে অনেক বেশি পরিবেশের উপর প্রভাব বিস্তার করে সেখানকার ভৌগোলিক পরিবেশ ও জলবায়ু। পরিবেশ বা পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করছেন এমন চিন্তাবিদদের একদল সাংস্কৃতিক পরিবেশ, মানবিক মূল্যবোধ প্রভৃতিকে পরিবেশের সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন। অন্যদিকে একদল পরিবেশের মৌল উপাদান অর্থাৎ জলবায়ু, ভৌগোলিক অবস্থা প্রভৃতির উপর অধিক

গুরুত্ব দেয়। অর্থাৎ আপাতদৃষ্টিতে দেখলে প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের মধ্যে যেন একটি দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু এই দ্বন্দ্বের অবসান ঘটতে পারে যদি আমরা বাস্তুতন্ত্রকে সমগ্র হিসাবে গ্রহণ করি এবং প্রকৃতি ও সংস্কৃতি এই দুটিকে বাস্তুতন্ত্রের অংশ হিসাবে দেখি। বাস্তুতন্ত্রের এই সমগ্রের মধ্যে বিভিন্ন জৈব ও অজৈব উপাদান অপরিহার্যভাবে সম্পর্কিত, জৈবিক ও সাংস্কৃতিক উভয় ধরণের বিবর্তন প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন কর্মকান্ড ও পরিবেশের গঠনতন্ত্র সম্পর্কে আমাদের অবগত করে। বাস্তুতন্ত্রের প্রতি নৃতাত্ত্বিক ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার মাধ্যমে পরিবেশ বিপর্যয় রোধ করা ও একইসাথে পরিবেশ সংরক্ষণ করা সম্ভব হতে পারে।

পরিবেশবাদ হল এমন এক মতবাদ যা প্রকৃতির জন্য ক্ষতিকারক অর্থনৈতিক ভোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধিতা করে। পরিবেশবাদ এমন দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলে যেখানে পরিবেশের ভারসাম্য ও সম্প্রীতি যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে আসন্ন যে বিপদ তার হাত থেকে পৃথিবীকে বাঁচানো কঠিন হয়ে পড়বে। পরিবেশের এই ভারসাম্য ও স্থিতিশীলতা মানুষের সঙ্গে পরিবেশের মিথষ্ক্রিয়ার উপর নির্ভর করে, আবার মানুষের বিবেচনাহীন কার্যকলাপ পরিবেশের ভারসাম্যকে নষ্ট করে। মানুষ তখনই পরিবেশের গুরুত্ব বুঝতে সক্ষম হয়, পরিবেশের স্বতঃমূল্য যে বিদ্যমান তা যখন অনুধাবন করতে পারে।[9] পৃথিবীর বর্তমান সার্বিক পরিবেশের বিভিন্ন দিক সার্বিকভাবে জানতে আমাদের পরিবেশবিদ্যা সাহায্য করে। আধুনিক পরিবেশের বিভিন্ন দিকগুলো ভালোভাবে উপলব্ধি করতে গেলে বিজ্ঞান, কলা, প্রযুক্তি প্রভৃতি বিষয়ের সাহায্যের প্রয়োজন আছে। মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনের বিভিন্ন দিকগুলো তার

[9] পন্ডিত, রাজকুমার. (২০২০). প্রাচীন ভারতে পরিবেশ ভাবনা. *অনুরণন.* Vol-8. পৃঃ- ১-১১.

পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করে। তাই সকল বিষয় পরিবেশবিদ্যার অন্তর্গত। একদিকে যেমন পরিবেশবিদ্যার সঙ্গে জড়িত আছে জীববিদ্যা, ভূগোল, রসায়ন, প্রযুক্তি প্রভৃতি বিজ্ঞান, তেমনই আছে সমাজ, অর্থনীতি, নৃতত্ত্ব, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, পরিবেশ সংক্রান্ত আইন ইত্যাদি বিদ্যা। এই সমস্ত বিদ্যার সাহায্যে আমরা জানতে পারি আধুনিক পরিবেশবিদ্যার সার্বিক রূপ, তার বর্তমান অবস্থান, পরিবেশের বিভিন্ন পরিবর্তনের অভিমুখ, তার পরিণতি ও মনুষ্যসমাজের ওপর তার সার্বিক প্রভাব। মনুষ্যসৃষ্ট পরিবেশের ক্ষতিকারক দিকগুলির প্রতিরোধের মাধ্যমে সমস্ত জীবজগতের বাসযোগ্য একটি উন্নত পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পরিবেশ সম্পর্কে আলোচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক বলে বিবেচিত হয়।

আজকাল বেঁচে থাকার জন্য মানুষ যত না পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের ক্ষতি করছে তার থেকে অনেক বেশি ক্ষতি করছে নিজের ক্ষুদ্র অর্থনৈতিক স্বার্থের জন্য। মানুষের নৈতিক কর্তব্যমূলক আদর্শের বিচ্যুতি ও পক্ষপাতমূলক আর্থ-রাজনৈতিক আদর্শের প্রেক্ষিতে পরিবেশের অনেক ক্ষেত্রেই ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে এবং সেই পরিবর্তন পরিবেশের ধ্বংসকে ত্বরান্বিত করছে। মনে করা হয় যে, প্রায় দশ লক্ষ বছরেরও বেশি সময় আগে মানুষ গুহায় বসবাস করত। তারপর কৃষিকাজের প্রচলনের সময় থেকে মানুষ নিজের পছন্দে যাযাবর জীবন ছেড়ে স্থায়ী বাসস্থানে থাকার কথা ভাবতে শুরু করে। তখন গাছ কেটে নিজেদের বাসস্থান নির্মাণ শুরু হয়। এইভাবে পরিবেশের ক্ষতি সাধন শুরু হয়। কিন্তু এসময় মানুষ পরিবেশ থেকে ততটাই গ্রহণ করত যতটা তার বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন। ক্রমে ইতিহাসের গতিতে মানুষ নানাভাবে পরিবর্তন এনেছে এবং এই পরিবর্তন সে ঘটিয়েছে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতির

ফলে। এইভাবে গুহামানব বা পশুশিকারী মানবের অবস্থা থেকে মানুষ গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনে এবং পরবর্তীকালে জ্ঞান বিজ্ঞানকে হাতিয়ার করে সমাজবদ্ধ আধুনিক মানুষ হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই যাত্রায় মানুষের তথাকথিত উন্নতি যত বেড়েছে ততই প্রকৃতির অবক্ষয়ের মাত্রাও বেড়েছে। পূর্বে মানুষের মধ্যে ধর্ম ও নৈতিক দায়িত্ববোধ ছিল। কোন কোন সামাজিক নিয়মকে মানুষ আইনে রূপান্তরিত করে তা সকলকে মানতে বাধ্য করত। তাই প্রাচীন পৃথিবীর ইতিহাসে পরিবেশ ধ্বংস করার অপরাধে শাস্তিদানের প্রথাও কোথাও কোথাও চালু ছিল। সর্বোপরি মানুষ প্রকৃতিকে পূর্বে পূজা করত, অরণ্যকে প্রাচীনকালে 'অরণ্যদেবী' বা 'বনদেবীর' মর্যাদাও দেওয়া হত। যদিও সে প্রথা আজও অনেকস্থানে থাকলেও মানুষের পরিবেশ রক্ষা করার ইচ্ছা বর্তমানে 'শপিং মল'-ভিত্তিক সংস্কৃতিতে অনেকাংশে ম্লান হয়ে গেছে। আজ মানুষের নিজের অস্তিত্ব সঙ্কট যখন দেখা গেছে তখন পরিবেশ রক্ষার বিষয়ে মানুষ ভাবছে। কিন্তু পরিবেশের অবক্ষয় রোধ করতে গেলে প্রথমেই বাস্তুতন্ত্রকে সমগ্র হিসাবে দেখতে হবে এবং আত্মসত্তার উপলব্ধি করতে হবে। পরিবেশ রক্ষা সংস্কৃতির ভাবধারা বহন করে। মানুষের উন্নয়নকে একত্রে এগিয়ে নিয়ে যেতে আমাদের প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ নৈতিক সম্পর্ক গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন। সাংস্কৃতিক চেতনা থেকেই মানুষ প্রকৃতির নৈতিক মূল্যকে মর্যাদা দিতে সচেষ্ট হয় বলে আমরা মনে করি। নৈতিক মূল্যের দ্বারা প্রকৃতিকে মূল্যায়ন করাই হল দার্শনিকদের কাজ। নৃতাত্ত্বিক ও দার্শনিক প্রেক্ষাপটে পরিবেশ সংক্রান্ত সামগ্রিক মতবাদটি 'পরিবেশ' ও 'সংস্কৃতি' উভয় ধারণাকে সমগ্র বাস্তুতন্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেছে।

Ernst Haeckel ইকোলজি (Ecology) শব্দটির যে বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দেন, তা হল- The study of the relationship of organisms with there environment.[10] তাঁর অভিমতে - ইকোলজি বা বাস্তুসংস্থান হলো পৃথিবীতে বসবাসকারী জীবকুলের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক এবং পরিবেশের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা।

গভীর বাস্তুতন্ত্রের সমর্থক Arne Neass এর অভিমতে মানুষের মতো মনুষ্যেতর প্রাণী তথা উদ্ভিদজগত স্বতঃমূল্যবান, তাই সার্বিকভাবে সবার বিকাশ গুরুত্বপূর্ণ। এই চিন্তাধারা প্রকৃতির মূল্যকে মানুষের স্বার্থের মানদন্ডে বিচার করে না। বর্তমানে প্রতিনিয়ত মানুষ আপন স্বার্থ চরিতার্থতার অভিপ্রায়ে পরিবেশ ও মনুষ্যেতর অন্যান্য প্রাণীদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। প্রকৃতির সামগ্রিকতার মধ্যে মানুষ নিজেকে যখন একটি অংশরূপে উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে এবং পরিবেশের সামগ্রিকতা সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা পালন করতে পারবে, তখন এই পরিবেশগত সঙ্কট থেকে মানুষের পরিত্রাণ সম্ভবপর হবে।

অগভীর বাস্তুতন্ত্র যেমন মানবকেন্দ্রিকতার দোষে দুষ্ট ও সমালোচনার যোগ্য তেমনি গভীর বাস্তুতন্ত্রের চিন্তাধারা মানব সভ্যতার অগ্রগতিকে স্তিমিত করে পৌঁছে দেবে প্রাচীন আরণ্যের জীবনে। কৃষিকাজ, শিল্প, ব্যবসার ক্ষেত্রে অল্প পরিমাণে হলেও প্রকৃতির ক্ষতি হবে। তাই পরিবেশের কোনরকম ক্ষতি করতে না চাইলে মানুষের উন্নয়নের ধারা স্তব্ধ হতে বাধ্য।

---

[10] Haeckel, Ernst. (2013). History of Ecological Science (Part 47). Ernst Haeckel's Ecology. *Bulletin of the Ecological Society of America.* July. Page- 222-224.

তাই এই উভয় দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে একটি সামঞ্জস্য প্রয়োজন এবং একটি বিকল্প দার্শনিক পন্থার অনুসন্ধান প্রয়োজন, যা মানুষের যথেচ্ছাচারের ক্ষেত্র হিসাবে প্রকৃতিকে নির্বাচন করবে না এবং প্রকৃতির ক্ষতি না করেও মানুষের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখবে। আমি আমার অভিসন্দর্ভে এমন একটি বিকল্প পথের অনুসন্ধান করার প্রয়াস করছি। এই প্রসঙ্গে 'উন্নয়ন' বলতে মানুষ সাধারণত যা বোঝে তা 'প্রকৃত উন্নয়ন' কিনা তাও বোঝার চেষ্টা করবো।

প্রথম অধ্যায়

পরিবেশ সম্পর্কে বৈদিক দৃষ্টিভঙ্গি

পশ্চিমী সংস্কৃতিতে পরিবেশ সংক্রান্ত আলোচনা বর্তমানে খুব বেশী জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। কিন্তু আমরা যদি ভারতীয় সংস্কৃতির দিকে তাকাই তাহলে খুব সহজেই অনুধাবন করতে পারব যে আমাদের সভ্যতা সংস্কৃতি ও কৃষ্টির মধ্যে পরিবেশ সংক্রান্ত আলোচনা এবং তার সংরক্ষণ প্রাচীনকাল থেকেই নিহিত আছে। ভারতীয় সংস্কৃতিতে পাহাড়-পর্বত থেকে শুরু করে গাছের ফল-মূল, নদী, সূর্য ইত্যাদিকে দেবদেবীর আসনে আসীন করার রীতি আছে। অর্থাৎ, এই ধরিত্রীকে মাতৃরূপে গ্রহণ করার প্রথা দীর্ঘদিনের। প্রকৃতি তার আপন খেয়ালে পৃথিবীকে জীবের প্রাণ ধারণের ও বসবাসের উপযোগী করে তুলেছে। জীবের প্রাণ সঞ্চারণ, তার বেঁচে থাকা এবং তার সুনির্দিষ্ট প্রস্ফুরণের মধ্যে একটি যোগসূত্র আছে। এই যোগসূত্রকে বৈদিক ঋষিগণ বিশ্বনীতি বা Cosmic order রূপে ব্যাখ্যা করে থাকেন। এই বিশ্বনীতি 'ঋত' নামে পরিচিত। এই নিয়মে বিশ্বকে একসূত্রে গ্রন্থিত করার পরিণতি হিসাবে যা পাওয়া যায় তা এক অখন্ড বিশ্ব। অথর্ববেদের দ্বাদশ কান্ডের প্রথম মন্ত্রেই বলা হয়েছে "সত্যং বৃহৎ ঋতমুগ্রং দীক্ষা তপো ব্রহ্ম যজ্ঞঃ পৃথিবীং ধরয়ন্তি।"[1] অর্থাৎ এই ঋত পৃথিবীর চালিকাশক্তি, সকল কর্মের প্রেরণা ও সমগ্র বিশ্বব্যাপী এই প্রাকৃতিক নিয়মে নিয়ন্ত্রিত রয়েছে, কারণ 'ঋত' নিয়মের একটি সৃষ্টিশীল উদ্দেশ্য আছে। এর দ্বারা সকল প্রাণী, তাদের নৈতিক ক্রিয়াকলাপ, সকল প্রাকৃতিক ঘটনা, যেমন- মাধ্যাকর্ষণের টান, চাদের আকর্ষণ প্রভৃতি

[1] গোস্বামী, বিজনবিহারী (সম্পঃ). অথর্ববেদ সংহিতা. কলকাতাঃ হরফ প্রকাশনী. পৃঃ ৩০৮.

সবকিছুই অন্তর্ভুক্ত। সকলের জন্ম, মৃত্যু, উদ্দেশ্য, স্থায়িত্ব প্রভৃতি সব এই মহান 'ঋত' নিয়মের অধীন।

ভারতীয় বৈদিক সংস্কৃতি ও সেই সংস্কৃতির ঐতিহ্য নীতিচিন্তাকে পরিবেশ ভাবনা থেকে কখনও দূরে সরিয়ে রাখেনি। নৈতিক বিচারে ভারতীয় ঋষিরা কল্যাণকর বা ভালো হিসাবে সুখ-শান্তি, স্বাস্থ্য, বন্ধুত্ব, জীবন-সংক্ষরণ ও সর্বোপরি সত্য শিব-সুন্দরকে চিহ্নিত করেছিলেন; যদিও এই আদর্শ মূল্যগুলি কেবল মানব প্রজাতির মঙ্গলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এই আদর্শ মূল্যগুলির কল্যাণ কামনার দ্বারা বিশ্বের সকল উপদান, যেমন- সকল উদ্ভিদ, সকল প্রাণী, ঈশ্বর, ভূমি, সূর্য, চন্দ্র, নদী প্রভৃতি সকল কিছুকেই অন্তর্ভুক্ত করেছিল।

পরিবেশ রক্ষার কথা বহু শতাব্দী পূর্বে বেদে এবং প্রাচীন ভারতীয় বিভিন্ন শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। বেদ এমন এক শাস্ত্র যার দ্বারা আমরা সেইসব বিষয়ের জ্ঞানলাভ করি, যার জ্ঞান আমরা সাক্ষাৎভাবে ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতার দ্বারা পেতে পারিনা। বেদে পরিবেশ রক্ষার বিষয়ে আলোচিত হয়। বিদ+অ = বেদ, বেদ মানে জ্ঞান বা অতীন্দ্রিয় প্রজ্ঞা। চারপ্রকার বেদ আছে। এগুলি হল ঋক, সাম, যজুঃ ও অথর্ব বেদ। পরিবেশগত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ঋকবেদের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী। সুখ-সমৃদ্ধির জন্য প্রত্যহ বৃক্ষরোপণের কথা ঋকবেদে বহু হাজার বছর পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

১.১ ঋগ্বেদে পরিবেশচিন্তা

ঋগ্বেদ সংহিতায় পৃথিবীর ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে এক অপরূপ রূপক চিত্রের কল্পনা করা হয়েছে। যেখানে আকাশকে পিতার সঙ্গে, পৃথিবীকে মাতার সঙ্গে, শূন্যতাকে

তাদের সন্তানের সঙ্গে অভিন্নরূপে কল্পনা করা হয়েছে। অর্থাৎ পিতা-মাতা এবং সন্তানের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকলে পরিবারটি যেমন সুখী হয় একইভাবে আকাশ-পৃথিবী ও শূন্যতার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষিত হলে পৃথিবীব্যাপী মনুষ্যকূল শান্তিতে বিরাজ করতে পারে। তাই ঋকবেদের প্রার্থনা হল -

"স রেতোধা বৃষভঃ শশ্বতীনাং তসিন্নাত্মা জগতস্তস্থূষশ্চ।

তন্ম ঋতং পাতু শতসারদায় যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ।।"[2]

(ঋগ্বেদ ৭/১০১/৬)

অর্থাৎ ঋগ্বেদেও বৃষ্টিদাতা যর্জন্যদেবের কাছে বৃষ্টিভেজা একশত শরৎ আয়ু প্রার্থনা করা হয়েছে। কারণ প্রাচীন আর্যদের কাছে বৃষ্টি পরম আকাঙ্খার বস্তু ছিল।

ঋগ্বেদে আরও বলা হয়েছে, অন্তরিক্ষের পুত্র ও সেচন বা কৃষিকাজে সমর্থ হলেন পর্যন্যদেব। তার উদ্দেশ্যে স্তোত্র উচ্চারণ কর, কারণ তাঁর ইচ্ছাতেই আমরা অন্ন প্রাপ্ত হই।

"পার্জন্যায় প্র গায়ত দিবস্পুত্রায় মীড়হুষে।

স নো যবসমিচ্ছতু।।"[3]

(ঋগ্বেদ ৭/১০২/১)

অর্থাৎ অন্তরিক্ষের পুত্র ও সেচন কাজে পারদর্শী হলেন পর্জন্যদেব। এই পর্জন্য দেবের উদ্দেশ্যে স্তোত্র উচ্চারণ করতে বলা হয়েছে। কারণ তাঁর ইচ্ছাতেই আমরা প্রাপ্ত হই। স্থাবর ও জঙ্গমের আত্মা তাতেই বাস করে। তার দ্বারা প্রদত্ত জল শত বছর ধরে

---

[2] দত্ত, রমেশচন্দ্র (অনু.). (১৯৭৮). *ঋগ্বেদ সংহিতা* (দ্বিতীয় খণ্ড). কলকাতা: হরফ প্রকাশনী. পৃঃ ১৮০.

[3] দত্ত, রমেশচন্দ্র (অনু.). (১৯৭৮). *ঋগ্বেদ সংহিতা* (দ্বিতীয় খণ্ড). কলকাতা: হরফ প্রকাশনী. পৃঃ ১৮১.

জীবনের জন্য প্রাণীকে রক্ষা করুক। বৈদিক সাহিত্যে বলা হয়েছে বেদ শুধু ভারতে নয়; তা। সমগ্র মানবজাতির। অর্থাৎ, তা নিখিল বিশ্বের সম্পদ। তাই বেদে ঘোষিত হয়েছে-

"সমানী ব আকুতিঃ সমানা হৃদয়ানি ব:।

সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি।।"[4]

(ঋগ্বেদ ১০/১৯১/৪)

অর্থাৎ, এই বিপুল পৃথিবীতে একই সূর্য, বায়ু ও আকাশ তথা পরিবেশের ছত্রছায়া মানবজাতি লালিত। অর্থাৎ পৃথিবীতে সকলেরই সবকিছুর উপর সমান অধিকার বর্তায়। তাই বৈদিক ঋষির বক্তব্য- তোমাদের অভিপ্রায়, অন্তঃকরণ, মন সবকিছুই অভিন্ন হোক এবং তোমরা সর্বাংশে এক হও।

তাছাড়া ঋকবেদে আত্মীয়, অনাত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব, প্রিয়জন এমনকি প্রাণীদেরও সম অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। কাজেই অন্যকে বঞ্চিত করে যে ব্যক্তি নিজ ভোগ-বিলাসে আচ্ছন্ন হয়, সেই কর্মকে সর্বদা পাপের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। ঋষির কণ্ঠে তাই ধূনিত হয়েছে –

"মোঘমন্নং বিন্দতে অপ্রচেতা: সত্যং ব্রবীমি বধ ইৎস তস্য।।

নার্যমণং পুষ্যতি নো সখায়ং কেবলাঘো ভবতি কেবলাদী।। "[5]

(ঋগ্বেদ ১০/১১৭/৬)

অর্থাৎ, যার মন উদার নয় তার ভোজন তার মৃত্যুস্বরূপ। কারণ সে দেবতার উদ্দেশ্যে কিছু প্রদান থেকে, এমনকি বন্ধুকেও কিছু দেওয়া থেকে বিরত থকে। সে কেবল নিজে ভোজন করে, তার কেবল পাপই ভোজন করা হয়।

---

[4] দত্ত, রমেশ্চন্দ্র (অনু.). (১৯৭৮). *ঋগ্বেদ সংহিতা* (দ্বিতীয় খণ্ড). কলকাতা: হরফ প্রকাশনী. পৃঃ ৬৬২.

[5] দত্ত, রমেশ্চন্দ্র (অনু.). (১৯৭৮). *ঋগ্বেদ সংহিতা* (দ্বিতীয় খণ্ড). কলকাতা: হরফ প্রকাশনী. পৃঃ ৬১২.

পরিবেশের প্রতি এই সজাগ দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই ভারতীয় মনীষীগণ আচার-অনুষ্ঠান উদযাপন করতেন। তৎকালে পরিবেশ দূষিত করাকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে গণ্য করা হত। অর্থাৎ পরিবেশের ভারসাম্য যাতে সচল থাকে তার জন্য নিষিদ্ধ কর্মের বিধান ছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, চরক সংহিতায় পশুপাখি ধ্বংস নিষিদ্ধ কর্মের অন্তর্গত। আবার বায়ু ও জল দূষিত হলে মানুষের যে ভারসাম্যের বিঘ্ন ঘটে তারও উল্লেখ রয়েছে। বর্তমানে Deep Ecology বা গভীর বাস্তুতন্ত্র নামক বিষয়টি পরিবেশ বিজ্ঞানীদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু আমরা যদি প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যের দিকে আমাদের দৃষ্টি নিক্ষেপ করি তাহলে আমরা এই সিদ্ধান্তে নিশ্চয়ই উপনীত হতে পারি যে, গভীর বাস্তুতন্ত্রের ধারণা আমাদের কাছে সুপ্রাচীন। প্রাচীন ভারতীয় ঋষিগণ তাঁদের জীবন অতিবাহিত করতেন, প্রকৃতির প্রতি এই দৃষ্টিভঙ্গিকে ধর্মের সঙ্গে সাজুয্য রেখে। ঋকবেদ সংহিতায় পরিবেশ সম্পর্কে ঋষির প্রার্থনা হল -

"মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ মাধ্বী র্নঃ সন্ত্বোষধী।।
মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ মধু দ্যৌরস্তু ন পিতা।।
মধুমান্নো বনস্পতি মধুমী অস্তু সূর্যঃ। মাধ্বী র্গাবো ভবন্তু নঃ।।"[6]

(ঋগ্বেদ ১/৯০/৬, ৭, ৮)

এর অর্থ হল, পরিবেশ মানুষকে আর্শীবাদ প্রদান করে মানুষের জীবনকে সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য। নদী আমাদের পবিত্র জল প্রদান করে, যা আমাদের

[6] দত্ত, রমেশ্চন্দ্র (অনু.). (১৯৭৮). *ঋগ্বেদ সংহিতা* (দ্বিতীয় খণ্ড). কলকাতা: হরফ প্রকাশনী. পৃঃ ১৯২.

স্বাস্থ্য উন্নতিতে সহায়ক। সূর্য আমাদের শান্তিপূর্ণ জীবন অতিবাহিত করার জন্য আর্শীবাদ প্রদান করে এবং গোমাতা (গরু) আমাদের দুগ্ধ দিয়ে ধন্য করে।

১.২ সামবেদে পরিবেশচিন্তা

সামবেদ প্রকৃতপক্ষে একটি সংগীত গ্রন্থ। বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানে এই সঙ্গীত পরিবেশিত হত। সামবেদের পঁচাত্তরটি মন্ত্র ব্যতীত সবই ঋগ্বেদ থেকে সংগৃহীত। আর্চিক ও গান এই দুইভাগে সামবেদকে বিভক্ত করা হয়ে থাকে। যে মন্ত্র কেবল সঙ্গীতের বাণী তাই আর্চিক এবং স্বরলিপিগুলিকে গান নামে অভিহিত করা হয়। জীবনে জলের প্রয়োজনীয়তা, বাস্তুতন্ত্রে জলের ভূমিকা, জলচক্র প্রভৃতি পরিবেশ সম্বন্ধীয় চিন্তাসূত্রের অনুসন্ধান আমরা সামবেদে পেয়ে থাকি। যৌক্তিক বিজ্ঞানভাবনার অভাবে সেই ভাবনাগুলি উৎকৃষ্টভাবে বিন্যস্ত ও সম্পূর্ণ নিখুঁত নয়।

ঋগ্বেদের নবম মন্ডলের ছয়টি সূক্তের দ্বারা সোম ইন্দ্র, অগ্নি, পূষা ও রুদ্রের অনুষঙ্গেই পূজিত হয়েছেন। এই সোম সর্বরোগনাশক, ধনরত্নপ্রদায়ক, সর্বশক্তিমান। এই সোমদেবতা সূর্যের মতো দীপ্তিমান। অপরপক্ষে তিনি কবি, সুকর্মা, বিদ্বান, সর্বদর্শী, সহস্রচক্ষু, পবমান (ক্ষরণশীল), রসরূপে বলবান। সোম শস্ত্রধারী, এর অস্ত্র পাশ। তাঁর ধনুনির্গত সহস্রমুখী বানে শত্রুবিনাশ ঘটে। বায়ুর রথের অশ্বের মতো অশ্ব তাঁর রথেও সংযোজিত। সোম ইন্দ্রের সঙ্গে এক রথে আসীন। তিনি মরুৎগণ পরিবৃত।[7] বৈদিক যুগে এক শব্দ ছিলো বহু অর্থ সমন্বিত। যেমন- 'গো' শব্দের অর্থগুলি হলো- পৃথিবী, গোরু, রশ্মি, বাক্য, জল ইত্যাদি। আবার অশ্বের প্রচলিত অর্থসমষ্টির মধ্যে- রশ্মি, ঘোড়া ইত্যাদি বহুল ব্যবহৃত। তেমনভাবেই জল ও সোম বহু ক্ষেত্রে সমান অর্থবাহী।

[7] সরকার, সুধীরচন্দ্র. (১৩৮০). পৌরাণিক অভিধান. কলকাতাঃ এম সি সরকার এন্ড সন্স. পৃঃ ৫৭৬.

আধুনিক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যানুসারে সূর্যতাপে মহাসাগরের জলের বাষ্পীভবন বায়ুমন্ডলে জলীয় বাষ্পের উৎস। জলীয় বাষ্প ঘনীভবন ও অধঃক্ষেপনের ফলে পুনরায় বায়ুমন্ডলের থেকে ভূপৃষ্ঠে ফিরে আসে এবং বৃষ্টিপাতের জলধারা নদীরূপে পুনরায় মহাসাগরে পতিত হয়। বৃষ্টিপাতের একাংশ ভূগর্ভে মিশে যায় এবং উদ্ভিদেরা বিভিন্ন ভৌম উৎস থেকে তাদের জলসংগ্রহ করে আবার বাষ্পমোচনের ফলে এই জল পুনরায় বায়ুমন্ডলে মিশে যায়। এই প্রক্রিয়া নিরন্তর ঘটমান এবং এটিই জলচক্র। এই জলচক্র বিষয়ের অবিন্যস্ত উপস্থিতি আমরা সামবেদে পাই।[৪]

জীবনের বিচিত্র ক্ষেত্রে, প্রাণের প্রকাশে এবং বাস্তুতন্ত্রে জলের ভূমিকার প্রসঙ্গ সামবেদের বিভিন্ন স্থানে উল্লিখিত হয়েছে। সামের আশ্রয় স্বর, স্বরের আশ্রয় প্রাণ, প্রাণের আশ্রয় অন্ন এবং অন্নের আশ্রয় জল। আধুনিক পরিবেশবিদদের ভাষায় জল হলো জীবনের অমৃতস্বরূপ (elixir of life)।[৯]

পূর্ণাঙ্গ বৈজ্ঞানিক ধারণার অনুপস্থিতির ফলে পরিবেশগত বিদ্যা দেবস্তুতিতে বিচিত্র আত্মপ্রকাশ করেছে। ঋগ্বেদ ও সামবেদের অধিকাংশ মন্ত্র মানুষের জীবনযন্ত্রণা ও বাসনার মূর্তরূপ। বিপদ পরিত্রাণের আহ্বান ও সমৃদ্ধি কামনায় সরব হয়েছিলেন এই ঋষিরা। তাই প্রাকৃতিক শক্তির বিভিন্ন উৎসের উপরেই আরোপিত হয়েছে দেবত্ব। যেমন বর্ষা ও মেঘ থেকে জলধারা বর্ষণ করার শক্তি হিসাবে ইন্দ্রের রূপকল্পনা। সামবেদে বর্ণিত প্রকৃতির প্রতি কিছু দৃষ্টিভঙ্গিকে নিম্নে বর্ণণা করা হয়েছে।

[৪] গুপ্ত, শুভেন্দু. (২০২১). প্রাচীন ভারতে পরিবেশ চিন্তা. কলকাতাঃ শিশু সাহিত্য সংসদ প্রা লি. পৃঃ ৫৭-৫৮.

[৯] গুপ্ত, শুভেন্দু. (২০২১). প্রাচীন ভারতে পরিবেশ চিন্তা. কলকাতাঃ শিশু সাহিত্য সংসদ প্রা লি. পৃঃ ৫৭-৫৮.

"অসাবি দেবং গোঋজীকমন্ধো ন্যস্মিন্নিন্দ্রো জনুসেমুবোচ।

বোধামসি ত্বা হর্যশ্ব যজ্ঞৈর্বোধা ন স্তোমমন্ধসো মদেষু।। "[10]

(সাম, উত্তর, ঐন্দ্রকান্ড, ৪/৯/৩১৩)

-দীপ্ত ঋজুরশ্মির সঙ্গে জলমিশ্রণের ফলে উৎপন্ন হন ইন্দ্র বা বজ্র। রশ্মি জলাকর্ষক এবং তাই মেঘের মধ্যে বিদ্যুতের উৎস। ইন্দ্র হলেন বিদ্যুৎ বা বজ্রস্বরূপ।

"অধ্বর্যো অদ্রিভিঃ সুতং সোম পবিত্র আনয়।

পুনাহীন্দ্রায় পতবে।। "[11]

(সাম, উত্তর, ৯/৭/১১/১২২৫)

-হে সূর্য, মেঘপুঞ্জ থেকে নিঃসারিত সোমকে রশ্মিতে বহন করে আনো। ইন্দ্রের পানের জন্য পরিশোধন করো।

"অব দ্রপসো অংশুমতীমতিষ্ঠদীয়ানঃ কৃষ্ণো দশভিঃ সহস্রৈঃ।

আবওমিন্দ্রঃ শচ্যা ধমন্তমপ স্নীহিতিং নৃমণা অধদ্রাঃ।।"[12]

(সাম, উত্তর, ৩/১০/৩২৩)

অর্থাৎ, সহস্র সহস্র সঞ্চারমান কালোমেঘ বা জলবিন্দু অংশুমতী নদী বা কিরণরাশিকে ঘিরে ছিলো, ইন্দ্র প্রজ্ঞাযুক্ত শক্তিশালী কর্ম দ্বারা সেই মেঘ রাশি থেকে জল নির্যুক্ত করে নিম্নে প্রবাহিত করালেন।

---

[10] ঠাকুর, পরিতোষ (সম্পা.). (১৯৭৫). *সামবেদ সংহিতা.* কলকাতা: হরফ প্রকাশনী. পৃঃ ৩০.

[11] গুপ্ত, শুভেন্দু. (২০২১). প্রাচীন ভারতে পরিবেশ চিন্তা. কলকাতাঃ শিশু সাহিত্য সংসদ প্রা লি. পৃঃ ৫৮.

[12] ঠাকুর, পরিতোষ (সম্পা.). (১৯৭৫). *সামবেদ সংহিতা.* কলকাতা: হরফ প্রকাশনী. পৃঃ ৩১.

"উচ্চা তে জাতমন্ধসো দিবি সদভূম্যা দদে।

উগ্রং শর্ম মহি শ্রবঃ।। "[13]

(সাম, উত্তর, ৫/১/৪৬৭)

-হে ক্ষরণশীল সোম, উর্দ্ধলোকে উৎপন্ন জল ভূমিতে পতিত করে প্রচুর অন্ন, বল ও সুখদান করো। ভূমিতে পতিত বৃষ্টিধারা মৃত্তিকাস্থিত লবণ ও অন্যান্য পুষ্টিদ্রব্যকে দ্রবীভূত করে যা উদ্ভিদের পুষ্টিবর্ধক,তাই এই জল হলো অন্নরস।

"সমুদ্রো অপসু মামৃজে বিষ্টম্ভো ধরুণো দিবঃ।

সোম পবিত্রে অস্ময়ুঃ।। "[14]

(সাম, উত্তর, ৭/১/৩/১০৪১)

-হে সোম, তুমি আমাদের হিতাকাঙ্খী মিত্র হয়ে সমুদ্রের জলরাশিকে রশ্মিসহায়ে উর্দ্ধলোকে ধারণ করে স্তম্ভিত করে রাখো।

এইভাবে সামবেদের একাধিক স্থানে জল, বৃষ্টি প্রভৃতি প্রকৃতির একাধিক উপাদানের বর্ণণা দ্বারা প্রকৃতির প্রতি বৈদিক ঋষিদের সজাগ দৃষ্টি প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া সামবেদের একাধিক স্থানে পশুকে দেবতাদের সাথে যুক্ত করে বর্ণণা করার ফলে প্রকৃতিকে রক্ষা করাও সম্ভব হয়েছে।

---

[13] ঠাকুর, পরিতোষ (সম্পা.). (১৯৭৫). *সামবেদ সংহিতা.* কলকাতা: হরফ প্রকাশনী. পৃঃ ৪৭.

[14] ঠাকুর, পরিতোষ (সম্পা.). (১৯৭৫). *সামবেদ সংহিতা.* কলকাতা: হরফ প্রকাশনী. পৃঃ ১০২.

১.৩ যজুঃ বেদে পরিবেশ চিন্তা

যজুর্বেদ দুইভাগে বিভক্ত- শুক্লযজুর্বেদ ও কৃষ্ণযজুর্বেদ। কৃষ্ণ যজুর্বেদের একমাত্র ব্রাহ্মণ তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ। তার আশ্রিত আরণ্যক এই ব্রাহ্মণের অংশ, যার নাম তৈত্তিরীয় আরণ্যক। যজুর্বেদের দুটি উপনিষদ- বৃহদারণ্যক ও ঈশ। বৃহদারণ্যক আকারে সবচেয়ে বৃহৎ উপনিষদ। ঈশ উপনিষদ যজুর্বেদে সংহিতার অংশ। যজুর্বেদের পরিবেশ সম্পর্কিত কিছু প্রাসঙ্গিক বিষয় এখানে আলোচিত হল-

"চিত্রং দেবানামুদগাদনীকং চক্ষুর্মিত্রস্য বরণস্যাগ্নেঃ।

আ২ প্রা দ্যাবা পৃথিবী অন্তরিক্ষং সূর্য আত্মা জাগতস্তস্থুষশ্চ।।"[15]

(শুক্লযজুর্বেদ, ১৩শ অধ্যায়, মন্ত্র ৪৬)

অর্থাৎ, কিরণপুঞ্জরূপ সূর্য আশ্চর্যরূপে উদিত হচ্ছে, সে সূর্য মিত্র, বরুণ ও অগ্নির চক্ষুর মতো প্রকাশক। উদিত হয়েই ভূলোক, দ্যুলোক, অন্তরিক্ষ লোক পূর্ণ করেছে। এখানে সূর্যকে স্থাবর ও জঙ্গমের আত্মা রুপে দেখা হয়েছে।

আয়নোস্ফিয়ার, স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার, ট্রপোস্ফিয়ার পেরিয়ে সূর্যালোক পৃথিবীতে পৌঁছায়। একথা বর্তমানে বিজ্ঞানসম্মত। পৃথিবীর প্রাণপ্রবাহের সবকিছুই প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সূর্যালোক থেকে প্রাপ্ত। সেই সূর্যকে স্থাবর ও জঙ্গমের আত্মা রুপে উপস্থাপন করাই যায়। এছাড়া শুক্লযজুর্বেদে বলা হয়েছে, সূর্য একাকী বিচরণশীল। চন্দ্রমা আবার জন্ম নেয় । অগ্নি হিমের ঔষধ। ভূমি মহৎ বপন স্থান। এখানে অমাবস্যা-পূর্ণিমার এবং ভূমি যে সকল প্রকার উদ্ভিদ ও তরুলতার আবাস, তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

---

[15] ঠাকুর, পরিতোষ (সম্পা.). (১৯৭৫). *সামবেদ সংহিতা.* কলকাতা: হরফ প্রকাশনী. পৃঃ ১০০.

"মধুশ্চ মাধবশ্চ বাসন্তিকাবৃতু শুক্রশ্চ শুচিশ্চ গ্রৈষ্মাবৃতু নভশ্চ নভস্যশ্চ বার্ষিকাবৃতু ইষশ্চোর্জ্জশ্চ শারদাবৃতু সহশ্চ সহস্যশ্চ হৈমন্তিকাবৃতু তপশ্চ তপস্যশ্চ শৈশিরাবৃতু...।"[16]

(শুক্লযজুর্বেদ, চতুর্থ কান্ড, চতুর্থ প্রপাঠক, মন্ত্র ১১)

চৈত্র বৈশাখ হলো বসন্ত ঋতুকে, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় গ্রীষ্ম ঋতুকে, শ্রাবণ ও ভাদ্র বর্ষা, অগ্রহায়ণ ও পৌষ হেমন্ত ঋতু, মাঘ ও ফাল্গুন শিশির ঋতুকে বোঝায়। এখানে লক্ষ্যণীয় যে, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠকে গ্রীষ্মের পরিবর্তে জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়কে গ্রীষ্ম ঋতু বলা হয়েছে, Precision of equinox- এর ফলে এটা সম্ভব হতে পারে যে বৈদিক যুগে হয়তো এমনটাই ছিলো।[17] এছাড়া যজুর্বেদে কৃষি, ভূমির সংরক্ষণ, পশু বৈচিত্র্য ও তাদের রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। শুক্লযজুর্বেদের চতুর্বিংশ অধ্যায়ে মোট ছয়শত নয়টি পশুর উল্লেখ আছে। এর মধ্যে দুশো ষাটটি বন্য। উল্লিখিতদের মধ্যে বহু পশু, পক্ষী ও দেবতা বর্তমানে অপরিচিত। পশু-পাখি গুলি হয়তো বর্তমানে ভিন্ন নামে পরিচিত অথবা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। বৈদিক দেবতা দুই প্রকার- নিত্য ও কর্মানুগ। তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ও অপ্রসিদ্ধ বহু দেবতা আছেন। অনেক পশুকে দেবতাদের সাথে যুক্ত করে বর্ণণা করা হয়েছে। যেমন- প্রজাপতির সঙ্গে অশ্ব ও শৃঙ্গ বিহীন গোসকলকে যুক্ত করা হয়েছে।[18]

যজুঃবেদে বলা আছে, বৃক্ষছেদন এবং পরিবেশ দূষণ সম্পূর্ণ বাস্তুতন্ত্রের ক্ষতি করে, তাছাড়া এখানে প্রাণীহত্যাকে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে, কারণ প্রাণীরা সমাজের উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তাই যেসব প্রাণীরা কৃষিক্ষেত্রে

---

[16] আজীজ, আব্দুল (সম্পা.). (১৯৭৫). *যজুর্বেদ সংহিতা.* কলকাতা: হরফ প্রকাশনী. পৃঃ ৫৬৬.

[17] গুপ্ত, শুভেন্দু. (২০২১). প্রাচীন ভারতে পরিবেশ চিন্তা. কলকাতাঃ শিশু সাহিত্য সংসদ প্রা লি. পৃঃ ৬৭.

[18] গুপ্ত, শুভেন্দু. (২০২১). প্রাচীন ভারতে পরিবেশ চিন্তা. কলকাতাঃ শিশু সাহিত্য সংসদ প্রা লি. পৃঃ ৬৮.

আমাদের বিশেষ সহায়ক, যেমনগরু, বলদ প্রভৃতি প্রাণীর হত্যা থেকে রাজাকেও বিরত থাকার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

তাছাড়া গরু আমাদের দুধ দিয়ে ধন্য করে, তাই যেসব প্রাণী প্রয়োজনে কাজে লাগে সেসব প্রাণী হত্যা করলে শাস্তির বিধান ছিল যজুঃবেদে। যজুর্বেদ অনুসারে, গাছপালা এবং প্রকৃতি তথা গাছপালা থেকে প্রাপ্ত ঔষধ সামগ্রীককে 'রুদ্র' (Rudras) বলা হয়। দুই ধরণের 'রুদ্র' আছে। একটি হল 'শৈব'- এটি প্রকৃতির পক্ষে মঙ্গলদায়ক। অন্যটি হল 'রুদ্র', এটিকে প্রকৃতির পক্ষে ক্ষতিকারক বলা হয়। যখন প্রকৃতিতে বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য বজায় থাকে, তখন শৈব অস্তিত্বশীল বুঝতে হবে। কিন্তু প্রকৃতির ভারসাম্য যদি বিঘ্নিত হয় তবে রুদ্রের প্রকোপে তা হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়। রুদ্র'কে সাধারণত ভগবান শিবের সঙ্গে তুলনা করা যায়। যিনি সমুদ্র মন্থনে আগত সমস্ত গরল কণ্ঠে ধারণ করে এই বিশ্বকে জীবন উপহার দিয়েছিলেন। গাছপালা এবং সবুজ বনাঞ্চল আমাদের জীবনদায়ী অক্সিজেন প্রদান করে এবং বাতাসের ক্ষতিকারক কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে, এসব কারণে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের উচিত প্রকৃতিকে রক্ষা করা।

"ইমা রুদ্রায় তবসে কপর্দিনে ক্ষয়দ্বীরায় প্র ভরামহে মতী:।

যথা শমসদ্ দ্বিপদে চতুষ্পদে বিশ্বং পুষ্ঠং গ্রামে অস্মিন্ননাতুরম।

যা তে রুদ্র শিবা তনুঃ শিবা বিশ্বাহা ভেষজী।।

শিবা রুতস্য ভেষজী তয়া নো মৃড জীবসে।।

পরি নো রুদ্রস্য হেতির্বৃণক্তু পরি ত্বেষস্য দুর্মতিরঘায়োঃ।

অব স্থিরা মঘবদ্ভ্যস্তনুষব মীবস্রবস্তোকায় তনয়ায় মৃড।।"[19]

(শুক্লযজুর্বেদ ১৬/ ৪৮, ৪৯, ৫০)

১.৪ অথর্ববেদে পরিবেশচিন্তা

অথর্ববেদে ঋতকে সত্যের সঙ্গে এবং সত্যকে ধর্মের সঙ্গে একাত্ম করে বোঝানো হয়েছে। নৈতিক দিক দিয়ে সত্য সকল কিছুকে নির্দিষ্ট নিয়মে ঘটায়, অন্যদিকে ধর্মও হল তা যা সকল কিছুকে ধারণ করে। ঋতকে নৈতিক নিয়মের রক্ষক বলা হয়। এ প্রসঙ্গে 'অসু'র ধারণাও প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়। এই 'অসু'র ধারণা পরবর্তীকালে ধর্মীয় ও দার্শনিক চিন্তাকে প্রভাবিত করে। আর্যরা মনে করতেন, এক সর্বব্যাপী রহস্যময়ী শক্তি আছে, যা সব কিছুর উৎপত্তি ঘটিয়েছে এবং সবকিছুর ধারক- এটি হল 'অসু'। মনে করা হত যার যত বেশী 'অসু' আছে সে তত বেশী পরিমাণে রহস্যময় শক্তির অধিকারী। অথর্ববেদে প্রকৃতির সকল উপাদানের স্বগতমূল্য স্বীকৃত হয়েছে। আজ থেকে প্রায় চার হাজার বছর পূর্বে অথর্ববেদের পৃথিবীসূক্তে ধরিত্রী-মাতার স্তুতি আছে এবং তাতে নিবিড় বাস্তবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এই পৃথিবীসূক্তে জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও দীর্ঘস্থায়ী পরিবেশ ভাবনার চিত্র পাওয়া যায়। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম- পরিবেশের এই পঞ্চ মহাভূতের সংরক্ষণের কথা অথর্ববেদে উল্লেখিত হয়েছে। অর্থববেদের একাধিক মন্ত্রে বিভিন্ন দেব-দেবীর কৃপায় পঞ্চমহাভূতের প্রাণলাভের কথাও বলা আছে। অথর্ববেদের পৃথিবীসূক্তে যে ৬৩টি মন্ত্র আছে তাকে একত্রে পরিবেশের রক্ষার অনুকূল বস্তুবাদের দর্শন বলা হয়। অথর্ববেদে দুধ, পুষ্টিকর

---

[19] আজীজ, আব্দুল (সম্পা.). (১৯৭৫). *যজুর্বেদ সংহিতা.* কলকাতা: হরফ প্রকাশনী. পৃঃ ১২৩.

খাদ্যসামগ্রী, শস্য, কৃষিজ ফসল ও ফুলের সুগন্ধী দাত্রী পৃথিবী মাতার কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে শক্তি, স্থৈর্য ও সম্পদের দ্বারা জীবকূলকে ভূষিত করার জন্য, এর প্রকাশ নিম্নের অথর্ববেদের মন্ত্রে আমরা দেখতে পাই।

"শান্তিবা সুরভিঃ স্যোনা কীলালোগ্নী পয়স্বতী।

ভূমিরধি ব্রবীতু মে পৃথিবী পয়সা সহ।।"[20] (অথর্ববেদ ১২/১/৫৮)

এই পৃথিবীতে সবচেয়ে উন্নত জীব মানুষ নিজেকে সবকিছুর নিয়ন্তা বলে মনে করে। কিন্তু একটু অন্বেষণ করলে বোঝা যাবে আর পাঁচটা জীবের সঙ্গে তার বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই। কেবলমাত্র কতগুলি বৈশিষ্ট্য ব্যতিরেকে। আরও একটু অনুসন্ধান করলে বোঝা যাবে তার দৈনন্দিন জীবনের বেশিরভাগ অংশটাই প্রকৃতির কঠোর নিয়মের দ্বারা পরিচালিত। অর্থাৎ পরিবেশ সংক্রান্ত আলোচনা বা পরিবেশের প্রতি আমাদের আচার-আচরণ ভারতীয় মনিষীদের চিন্তাধারার মধ্যে বহুপূর্ব থেকেই নিহিত আছে। তারা পরিবেশকে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ করে পরিবেশের প্রতি নৈতিক চেতনা ও দায়বদ্ধতা এনে দিয়েছিলেন জনমানসে।

বৈদিক সাহিত্যের রচয়িতাগণ তাদের বিভিন্ন লেখার মধ্য দিয়ে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক নির্ণয়ের চেষ্ঠা করেছেন। সেখানে পৃথিবী, অরণ্য, পর্বত, নদী ইত্যাদির কথা বারবার উঠে এসেছে। ঋকবেদে দশম মন্ডলের ৭৫নং সূক্তে একুশটি নদীর স্তবস্তুতি উল্লিখিত হয়েছে। নদীর সঙ্গে জননীর সম্পর্ক বিভিন্ন রূপক চিত্রের মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে। জননী যেমন গাভীর দুগ্ধ নিয়ে শিশুর কাছে ছুটে আসে, নদীও তেমনি শব্দ করতে করতে জল নিয়ে তোমার চতুর্দিকে আসছে। যুদ্ধ করার সময় রাজা যেমন

[20] গোস্বামী, বিজনবিহারী (সম্পা.). (১৯৭৮). *অথর্ববেদ সংহিতা.* কলকাতা: হরফ প্রকাশনী. পৃঃ ৩০৯.

সৈন্য নিয়ে যায়, সেরূপ তোমার সহগামিনী নদীকে নিয়ে মানুষ এগিয়ে চলেছে। এখানে একুশটি নদীর মধ্যে গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, সিন্ধু ইত্যাদি নদীর স্তব করা হয়েছে। একইভাবে চিরযৌবনা ও সুন্দরীর সঙ্গে নদীর কল্পনা করা হয়েছে।

অথর্ববেদের পার্থিব চরিত্র্যর মধ্যে প্রকৃতির কথা, সেইসঙ্গে গাছপালা, নদী-পর্বত ইত্যাদির সঙ্গে ভেষজের সম্পর্ক জড়িয়ে আছে বলে পৃথিবীর স্তুতি করা হয়েছে। অথর্ববেদে দ্বাদশ কান্ডের প্রথম সূক্তে সূর্যের স্তুতি করা হয়েছে। কারণ সূর্য সকল বিপদ, রোগ ও মৃত্যু পরিহারের কারণ স্বরূপ। প্রার্থনা করা হয়েছে সূর্য পাপ, ক্রব্যাদ[21] ইত্যাদি অগ্নি অপহরণ করা হয়। তাছাড়া অথর্ববেদে পৃথিবী সূক্তে উজ্জ্বল, বিস্ময়কর, কাব্যময় প্রকৃতির ঐশ্বর্য বর্ণনা করা হয়েছে। তাই বিনম্র ও কবিত্বময় রূপটি বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে,

"ভূমে মাতর্নি ধেহি মা ভদ্রয়া সুপ্রতিষ্ঠিতম্।
সংবিদানা দিবা কবে শ্রিয়াং মা ধেহি ভূত্যাম্।। "

(অথর্ববেদ ১২/০১/৬৩)[22]

অথর্ববেদের দ্বাদশকান্ডর প্রথম অনুবাদের প্রথম সূক্তে পৃথিবীর বিভিন্ন বিষয়ের স্বাভাবিক বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। উক্ত সূক্তের মন্ত্রগুলি মূলতঃ প্রকৃতির প্রতি আর্য-ঋষিদের শ্রদ্ধা ও ভালবাসার কথা বলা হয়েছে। উক্ত মন্ত্রে ধরিত্রীর সাথে মানুষের

[21] অগ্নি তিন প্রকার। যথা - আমাদ, ক্রব্যাদ ও হ্যবাহ। যার দ্বারা মানুষ পাক বা রান্না করে অর্থাৎ যে লৌকিক অগ্নি অপক্ক যা, তা ভক্ষন করে; তাই আমাদ অগ্নি। শবদাহের সময় যে অগ্নি মাংস ভক্ষন করে অর্থাৎ চিতার যে আগুন দ্বারা মানুষকে দাহ করা হয়; তাই হল ক্রব্যাদ অগ্নি। দেবতাকে সন্তুষ্ট করতে যে যাগ-যজ্ঞ করা হয়, সেখানে দেবতাদের উদ্দেশ্যে আহুতি দেওয়া অন্ন যে অগ্নি ভক্ষন করে, তাই হল হব্যবাহ অগ্নি।

[22] গোস্বামী, বিজনবিহারী (সম্পা.). (১৯৭৮). *অথর্ববেদ সংহিতা.* কলকাতা: হরফ প্রকাশনী. পৃঃ ৩০৯.

আত্মিক যোগসূত্র উল্লিখিত হয়েছে। ধরিত্রী মাতার কাছে ঋষিগণের প্রার্থনা মূলতঃ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যর জন্যই। কিন্তু সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য কামনা করতে গিয়ে লোভ ও হিংসার দ্বারা চালিত হয়ে ধরিত্রীমাতার কোনো ক্ষতি যাতে না হয় সেদিকে সদা সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিলেন। এই ধরিত্রীর বিষয়গুলির মধ্যে তৃণ-লতা-গুল্ম-বৃক্ষরাজি-পর্বত-সমুদ্র ইত্যাদি হল ধরিত্রী মায়ের ঐশ্বর্য। সেই ঐশ্বর্য মূলত মানুষের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানের অঙ্গরূপে বিবেচিত। কিন্তু মানুষের সুখ-শান্তি বিধানের জন্য যেন ধরিত্রী মাতার এই অঙ্গগুলির কোনো হানি না ঘটে সেদিকে ঋষিগণ সদা সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।

বৈদিক যুগের সত্যানুসন্ধানী ঋষিগণের মনে বিভিন্ন রকম দার্শনিক প্রশ্নের উদয় হয়েছিল, যেমন- আত্মার স্বরূপ কি? এই মহাবিশ্বের প্রাণ ও আত্মার অবস্থান কোথায়? ইত্যাদি। মানুষের বিশ্বের সৃষ্টিকাল সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণের সীমাহীন আকাঙ্খা ছিল। এই বিশ্বের সৃষ্টি প্রসঙ্গে ঋকবেদের একটি সূত্রে বলা হয়েছে, মহাবিশ্ব প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে এক সারসত্তার কল্পনা করা হয়েছে। সেই সারসত্তার বাইরে কোনো কিছুর অস্তিত্ব ছিল না। যেমন- সৎ (অস্তিত্ব), অসৎ (অনস্তিত্ব), বায়ুমন্ডল, মৃত্যু, অমরত্ব, দিন-রাত্রি ইত্যাদি। সেই সারসত্তা থেকে বিস্ফোরিত হল মহা শক্তিশালী সৃষ্টিক্ষমতা। প্রকৃতির যে কার্যসমূহ ও সৌন্দর্যকে ঋষিগণ দেবতা বলে পূজা করতেন তাঁরা কেউ আদি দেবতা নন। কারণ তাঁরাও তো সৃষ্ট বস্তু। স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে তাহলে আদি কারণ কে? বা কোথা থেকে এসব সৃষ্টি হল? ঋষিগণ স্বীকার করে নিয়েছেন যে, এইসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া মনুষ্যের সাধ্য নয়। ঋকবেদের দশম মন্ডলের ১২৯ নং সূক্তে ষষ্ঠ অংশে ঋষির স্বীকারোক্তি হল –

"কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্র বোচৎকুত আজাতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ।

অর্বাগদেবা অস্য বিসর্জনেনাথা কো বেদ যত আবভূব।।"[23]

(ঋগ্বেদ ১০/১২৯/৬)

আবার মুণ্ডক উপনিষদের সৃষ্টি সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলা হয়েছে, এক অনির্বচনীয় পরমসত্তা থেকে ক্রমশ প্রাণশক্তি, মন ও ইন্দ্রিয়ক্ষমতা ছাড়াও অন্যান্য গ্যাসীয়, তরল ও কঠিন পদার্থ উৎপন্ন হয়েছে। আবার তৈত্তরীয় উপনিষদে মহাজাগতিক বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় বলা হয়েছে এক অভিন্ন আদিম শক্তি থেকে উৎপন্ন হয়েছে ইথার। তারপর সেই ইথার কণা থেকে স্পন্দনশীল অবস্থায় রূপান্তরিত হয় এমন কিছু যা বায়ু নামে পরিচিত। এটি পদার্থের আকর্ষণ ও সম্মেলনের ফলে উত্তপ্ত অবস্থায় রূপান্তরিত হয়। প্রচন্ড তাপমাত্রার জন্য এটি কখনও কখনও বস্তুজগতের গ্যাসীয় অবস্থায় পরিণত হবে। সেই চরম তাপ বিকিরিত হয়ে ঠান্ডা অবস্থায় রূপান্তরিত হলে তা তরল অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তা সংস্কৃত ভাষায় অপ। এই তরল অবস্থা মহাশূন্যেও তাপ ছড়িয়ে দিয়ে আরও ঠান্ডা হলে পদার্থকণা বদলে যায় কঠিন বস্তুপিন্ড রূপে, যা পৃথিবী নামে পরিচিত। আবার, এই কঠিন বস্তুপিন্ড যখন আরও ঠান্ডা হয় তখন ভৌত অবস্থা প্রাপ্ত হয়, যার মধ্যে থাকে জীবনের বীজ। সর্বপ্রথম আর্বিভূত হল বৃক্ষলতা, তারপর অন্যান্য জীবের জন্ম এবং সর্বশেষে সৃষ্টি হয় মানুষ।

প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, মানুষ পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তার ক্রিয়াকলাপ ঘটাবে, প্রকৃতিকে শোষণ বা নিজের বিচার বুদ্ধির শক্তিতে অন্যান্য প্রাণীর ওপর আধিপত্য করার কঠোর নিন্দা প্রাচীন শাস্ত্রে করা হয়েছিল। ভারতীয়

[23] গুপ্ত, শুভেন্দু. (২০২১). প্রাচীন ভারতে পরিবেশ চিন্তা. কলকাতাঃ শিশু সাহিত্য সংসদ প্রা লি. পৃঃ ৬৪০.

ঋষিরা মানুষের জীবনধারণের জন্য যেটুকু প্রয়োজনীয়, কেবল সেই পরিমাণই প্রকৃতি থেকে গ্রহণ করার পক্ষপাতী ছিলেন। এর প্রমাণ স্বরূপ প্রাচীন ভারতীয় চিন্তাবিদদের লেখায় অপরিগ্রহের ধারণার উল্লেখ পাই। অন্য প্রাণীর স্বার্থ ক্ষুন্ন করে নিজের বিলাসিতাকে প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রসমূহ, দর্শনসম্প্রদায়সমূহ ও ধর্মগুলি কখনওই সমর্থন করেননি। বেদান্ত দর্শনে, ব্রহ্মকেই কেবল সত্য বলা হয়েছে, সকল জীবকে অর্থাৎ ক্ষুদ্র প্রানী থেকে শুরু করে উন্নত স্তন্যপায়ী মানুষকেও এই ব্রহ্মেরই অংশ বলে মনে করা হত।

ভারতীয় দর্শন তথা শাস্ত্রে সকল প্রাণকে পবিত্র বলা হয়েছে। সকল প্রাণকে ঈশ্বরের প্রকাশ হিসাবে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে। তাই কোন প্রানীকে আঘাত বা কোনো প্রানীর কোনোরূপ ক্ষতি ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য করা হত। কৃষ্ণ-যজুর্বেদ সংহিতায় বলা আছে, পরমেশ্বরের দ্বারা পরিদৃশ্যমান সব কিছুই আচ্ছন্ন রয়েছে। তাই স্বর্গ, মর্ত ও পাতালের সবকিছুকে ত্যাগের দ্বারা ভোগ করতে বলা হয়েছে। এর থেকে প্রমাণিত হয় মানুষই হোক বা মনুষ্যতের প্রাণীই হোক, সকলের মূল্য ও বেঁচে থাকার সমান অধিকার আছে। একইভাবে উপনিষদে বাস্তুতাত্ত্বিক শৃঙ্খলার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় আমরা পাই।

অন্যদিকে প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রেও প্রাণীহত্যার বিরোধিতা দেখতে পাওয়া যায়। মনুস্মৃতিতে[24] বলা হয়েছে, প্রাণী হিংসা করা অনুচিত। প্রাণীবধকে স্বর্গলাভের সহায়ক বলা হয়নি। তাই মাংস পাওয়ার জন্য পশুহত্যা বন্ধের নির্দেশ মনুস্মৃতিতে রয়েছে।

[24] ভট্টাচার্য্য, রবীন্দ্রনাথ (সম্পা.). (২০১৫). *পরিবেশ ভাবনায় সংস্কৃত সাহিত্য.* কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার. পৃঃ ৪৩-৫২.

এমনকি মনুস্মৃতিতে পশুহত্যার জন্য বা গাছ কাটার জন্য বিভিন্ন শাস্তির বিধানও আছে। মনু গাছকে পূজা করার কথা বলেছেন কারণ প্রাচীনকালে প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান, এমনকি অনেক উদ্ভিদকেও ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করা হত। যেমন বটগাছের পাতা শিবের পূজায় ব্যবহৃত হয়। তুলসী গাছের পাতাকে, এমনকি তুলসী গাছেকেও পরম পবিত্র বলে গন্য করা হয়। স্কন্ধপুরাণ অনুসারে তুলসী গাছ হিন্দু গৃহে দ্বারের সম্মুখে পরিবারের মহিলাদের দ্বারা পূজিত হয়; কারণ এমন বিশ্বাস করা হত যে যেখানে গৃহে তুলসী গাছকে প্রত্যহ পূজা করা হয়, মৃত্যুর দেবতা যম সেই গৃহে প্রবেশ করতে পারেন না। সাধারণভাবে মনে করা হত, প্রত্যেক বৃহৎ উদ্ভিদই দেবতা বা 'বৃক্ষদেবতা'। তাই আজও পথের পাশে বিভিন্ন বটগাছকে পূজা করতে আমরা দেখতে পাই। বৈদিক যুগে উদ্ভিদকে জীবিত হিসাবে মনে করা হত, কিন্তু কোন রকম বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ছাড়া প্রাচীন বৈদিক ঋষিরা যে সত্যকে উপলব্ধি করেছিলেন, তা বিজ্ঞানসম্মতভাবে পরবর্তীকালে উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক যেমন শ্রী জগদীশ চন্দ্র বোস, চার্লস ডারউইন প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ উদ্ভিদকে জীবিত বলে দাবি করেন।

অর্থশাস্ত্রেও প্রাণীর স্বার্থরক্ষার কথা বলা হয়েছে। কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে গাছ-পালার ধংসকারীর কঠিন শাস্তি দেওয়ার বিধান দিয়েছিলেন।[25] অর্থশাস্ত্রে বিভিন্ন প্রানীর রক্ষা ও দেখাশুনা করার জন্য রাষ্ট্রের থেকে আধিকারিক বা কর্মচারী নিয়োগের কথা বলা হয়েছে। এই কর্মচারীকে বিভিন্ন প্রাণীদের খাদ্য সরবরাহের নির্দেশও দেওয়া

---

[25] ভট্টাচার্য্য, রবীন্দ্রনাথ (সম্পা.). (২০১৫). *পরিবেশ ভাবনায় সংস্কৃত সাহিত্য.* কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার. পৃঃ ৫৬-৬১.

হয়েছিল তাদের প্রয়োজন ও স্বভাব অনুসারে। শুধুমাত্র প্রাণীদের খাদ্যের দিকেই অর্থশাস্ত্রে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে- এমন নয়। অর্থশাস্ত্রে বিভিন্ন প্রাণীর রক্ষা ও বিভিন্ন রোগ থেকে তাদের সারিয়ে তোলার ব্যাপারেও গুরুত্ব দেওয়া হত। তাছাড়া বিভিন্ন প্রাণী যাতে চোর বা চোরা শিকারীদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ না হয় সে ব্যাপারেও লক্ষ্য রাখা হত। বিভিন্ন বন্যপ্রাণীর চলাচল ও থাকার জন্য অরণ্যকে সংরক্ষণ করা হত। বিভিন্ন ভীতু প্রাণীকে রক্ষা করার জন্য তাদের গলায় ঘন্টা বাধার কথা অর্থশাস্ত্রে বলা হয়েছে যাতে তাদের খুব সহজেই খুঁজে পাওয়া যায়। এমনকি অর্থশাস্ত্রে নির্দিষ্ট সময় অন্তর কতগুলি প্রজাপতির কয়টি প্রানী আছে তা নথিভুক্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে শুধুমাত্র প্রাণীদের রক্ষার কথাই বলা হয়নি, এখানে পরিবেশ রক্ষাকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং পরিবেশের ক্ষতি করলে শাস্তি দান বা জরিমানার কথা বলা হয়েছে। এইভাবে ভারতীয় চিন্তায় পরিবেশকে কখনো ঈশ্বরের সঙ্গে, কখনো শক্তির সঙ্গে তুলনা করে পরিবেশের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিকে ভারতীয় ঋষিরা প্রকাশ করার কথা বলেছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পরিবেশ সম্পর্কে পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গি

২.১ বাইবেলে পরিবেশ চিন্তা

সৃষ্টির সূচনায় বলা হয় ঈশ্বর প্রথম আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি করেছেন। পৃথিবীতে তখন গভীর শূন্যতা বিরাজ করতো। এই ফাঁকা পৃথিবীতে তখন কেবল গভীর অন্ধকার বর্তমান ছিল। ঈশ্বর সেই সময় জলের ওপর অবস্থান করতেন। তারপর ঈশ্বরের নির্দেশে দীপ্তি (আলো) উৎপন্ন হল। তিনি দেখলেন আলো অন্ধকারের তুলনায় উত্তম, তখন তিনি আলো থেকে অন্ধকারকে পৃথক করলেন। এরপর তিনি দীপ্তি বা আলোকে 'দিন' এবং অন্ধকারকে 'রাত্রি' নামে আভিহিত করলেন। তারপর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল আসলে প্রথম দিন হল। এরপর তিনি জলের মধ্য থেকে মহাকাশ সৃষ্টি করলেন এবং জলকে দুই ভাগে বিভক্ত করলেন। এইভাবে ঈশ্বর ক্রমে আকাশ মন্ডল সৃষ্টি করলেন। এরপর তাঁর নির্দেশে আকাশ মন্ডলের নীচের সমস্ত জল এক স্থানে সংগৃহীত হল এবং স্থল প্রকাশিত হল। এইভাবে স্থল হিসাবে ভূমি এবং জল হিসাবে সমুদ্র আত্মপ্রকাশ করল। এরপর ঈশ্বর দিনের ওপর কর্তৃত্ব করার জন্য এক মহাজ্যোতি এবং রাত্রির ওপর কর্তৃত্ব করার জন্য অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র এক মহাজ্যোতি নির্মাণ করলেন। তারপর ঈশ্বরের ইচ্ছায় জলের মধ্যে নানান প্রাণী, আকাশে উড়তে পারে এমন পাখিতে পৃথিবী ভরে উঠল। এরপর ঈশ্বর বিভিন্ন জাতির গ্রাম্য পশু, বন্য পশু, ভূচর সরীসৃপ নির্মাণ করলেন। এইভাবে ঈশ্বর এক আদর্শ পৃথিবী রচনার প্রয়াসে ব্রতী হলেন। সমস্ত সৃষ্টির পরেই সেই সৃষ্টি ঈশ্বরের নিকট উত্তম বলে বিবেচিত হল।

পবিত্র বাইবেল অনুসারে সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় চতুর্থ দিবস অতিবাহিত হয়ে পঞ্চম দিবসে ঈশ্বর মানুষ নির্মাণে মনযোগী হলেন।[1] ঈশ্বর নিজের আদল বা প্রতিমূর্তিতে বা সাদৃশ্যে মানুষ তৈরী করেছে বলে বাইবেলে কথিত আছে। তাছাড়া মানুষকে সমুদ্রে মৎস্যদের ওপর, আকাশে পাখিদের ওপর, পৃথিবীতে পশুদের ওপর, ভূমিতে গমনশীল যাবতীয় সরীসৃপের ওপর; এক কথায় সমস্ত পৃথিবীর ওপর কর্তৃত্ব করতে বলা হয়েছে। এই কারণে মানুষের সৃষ্টিকালে ঈশ্বর আপন আদলে পুরুষ ও স্ত্রী হিসাবে তাদের সৃষ্টি করলেন। এরপর ঈশ্বর মানুষকে দীর্ঘ জীবন ও বংশবৃদ্ধির আশীর্বাদ দিয়ে পৃথিবীকে পরিপূর্ণ ও বশীভূত করতে বললেন। এইভাবে মানুষকে তিনি সমুদ্রে মৎস্যদের ওপর, আকাশের পাখিদের ওপরে এবং ভূমিতে গমনশীল যাবতীয় জীব-জন্তুর ওপরে কর্তৃত্ব করার অধিকার দিলেন। বাইবেল অনুসারে ঈশ্বর ভূতলে নিজের সৃষ্ট সমস্ত উদ্ভিদ, বীজ উৎপাদক উদ্ভিদ, যাবতীয় ফলদায়ী বৃক্ষ মানুষকে খাদ্য হিসাবে প্রদান করেন। তাছাড়া ভূচরের যাবতীয় পশু, আকাশের যাবতীয় পাখি, ভূমিতে গমনশীল কীট প্রভৃতিরাও নিজেদের খাদ্য হিসাবে এই সবুজ বনানী ভোগ করতে পারবে। এইভাবে ঈশ্বর নিজের সৃষ্ট সমস্ত বস্তু খুবই ভালো বলে অনুভব করলেন। ক্রমে ষষ্ঠ দিবস উপস্থিত হল। এই হল বাইবেল অনুসারে ঈশ্বরের দ্বারা আকাশ ও পৃথিবী এবং এদের বস্তুসমূহ সৃষ্টির বৃত্তান্ত।

সৃষ্টিকালে সদাপ্রভু ঈশ্বর যখন আকাশ মন্ডল ও পৃথিবী তৈরী করেছিলেন সেই সময় পৃথিবীতে উদ্ভিদ ছিল না, কারণ তখনও ঈশ্বর পৃথিবীতে বর্ষা দেননি, তখন পৃথিবীতে কৃষিকাজ করার জন্য মানুষ ছিল না। এরপর পৃথিবী জলসিক্ত হল। পৃথিবীতে

[1] Zondervan. (2013). *Holy Bible.* United States: Zondervan. Pg- 1.

উদ্ভিদকুল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও পরিপূর্ণ হল। সদাপ্রভু ঈশ্বর পৃথিবীর মাটির ধূলিকণা থেকে 'আদম'-কে (অর্থাৎ মানুষ) নির্মাণ করলেন। মানুষের নাসিকায় প্রাণবায়ুর প্রবেশ ঘটিয়ে তিনি মানুষকে সজীব প্রাণী করা তুললেন। ক্রমে ঈশ্বরের ইচ্ছায় সর্বজাতীয় সুন্দর ও সুখদায়ক বৃক্ষ, নদীসমূহ (পীশোন, গীহোন, হিদূকেল, ফরাৎ নদীর নাম বাইবেলে পাওয়া যায়) প্রভৃতি উৎপন্ন হল। তাছাড়া ঈশ্বর সৎ-অসৎ জ্ঞানদায়ক বৃক্ষ ছাড়া সমস্ত বৃক্ষের ফল স্বচ্ছন্দে খাওয়ার জন্য মানুষকে অনুমতি দেন। পরে করুণাময় ঈশ্বর আদমকে ঘোর নিদ্রায় মগ্ন করে তাঁর শরীরের অংশ থেকেই নারীর নির্মাণ করলেন।

এইভাবে দেখা গেল, বাইবেলে ঈশ্বরকে পৃথিবী, আকাশ, মানুষ প্রভৃতি সবকিছুর রচয়িতা বলা হয়েছে। তাছাড়া মানুষকে পৃথিবী, আকাশ, পৃথিবীর সমস্ত প্রাণী-উদ্ভিদ ইত্যাদির ওপর কর্তৃত্ব করার কথা বলা হয়েছে। পৃথিবী সমস্ত কিছুই মানুষের ভোগের জন্য নির্মিত বলা হয়েছে। এসব থেকে বোঝা যায় বাইবেলে মানুষকে সর্বশ্রেষ্ঠ আসনে আসীন করে এই সুন্দর পৃথিবীকে মানুষের জন্য নির্মিত একথা বলা হয়েছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি গভীর বাস্তুতন্ত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এরূপ চিন্তাধারা পৃথিবীর সমস্ত উপাদানের ওপর মানুষের অত্যাচারের আরো বৃদ্ধিকে প্রশ্রয় দেবে।

২.২ অন্যান্য পাশ্চাত্য ধর্মে পরিবেশের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি

ধর্ম মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণের উপর প্রভাব বিস্তার করছে। তা নৈতিকতার অন্যতম উৎস। পরিবেশের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক ও পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার কথা প্রতিটি ধর্মেই আলোচিত। ইহুদি ও খ্রিষ্টধর্ম দুটি প্রখ্যাত ধর্ম। পাশ্চাত্যের জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণের ক্ষেত্রে এই দুই ধর্মের প্রভাব প্রসারিত। এই দুই ধর্মের পৌত্তলিকতা মুক্তি পাশ্চাত্যের মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করে।

পৌত্তলিকতাবাদে মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্কের ভিত্তি ছিলো সর্বপ্রাণবাদ। এই মতানুসারে সমস্ত বস্তুর চেতনা বা আত্মা বর্তমান। মানুষ এখানে প্রকৃতির অঙ্গ। মানুষের প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টি এখানে শ্রদ্ধাশীল। কিন্তু উপরোক্ত দুই ধর্ম কেবল মানুষের আত্মা বা চেতনা আছে বলে মনে করে। মানুষের এই প্রাধান্য প্রকৃতির প্রতি মানুষের যথেচ্ছ আচরণের পথ সুগম করে।

পাশ্চাত্য দর্শন ও ধর্মে পরিবেশের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বোঝা যায় যে কেবল ভূমি নয়, মনুষ্যেতর ও প্রকৃতির প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ছিলো মানবকেন্দ্রিক। তাই স্বাভাবিকভাবেই সনাতন পাশ্চাত্য নীতিবিদ্যাও অনেকাংশে মানবকেন্দ্রিক। নীতিবিদ্যা কেবল সামাজিক মানুষের ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়ের পর্যালোচনা করেছে, পরিবেশের উপাদানের সঙ্গে মানুষের আচরণকে নীতিবিদ্যার অঙ্গীভূত করা হয় নি। অর্থাৎ পাশ্চাত্য নীতিবিদ্যা মূলত মানবকেন্দ্রিক।[2]

২.৩ রেনে দেকার্তের অভিমত

মানুষেরই কেবল নৈতিক মর্যাদা থাকতে পারে বলে পাশ্চাত্যের বেশীরভাগ চিন্তাবিদ্ মনে করেন। না-মানুষের (মনুষ্যতর প্রাণী, উদ্ভিদকূল প্রভৃতি) নৈতিক মর্যাদাকে বহু যুগ পূর্ব থেকে পাশ্চাত্যে অবহেলা করা হয়। বিচারবুদ্ধি (reason) কেবল এবং কেবলমাত্র মানুষেরই আছে। অন্যনা মানুষের বিচারবুদ্ধি থাকার সম্ভাবনাকে বেশিরভাগ পাশ্চাত্যের চিন্তাবিদগণ অস্বীকার করেছেন। তার মধ্যে অন্যতম হলেন রেনে দেকার্ত। বিজ্ঞানের আলোয় দর্শনকে সুনিশ্চিত জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস

[2] Chapple, Christopher Key. (2006). *Jainism and Ecology.* Delhi: Motilal Banarsidass Publishers. Pg- 13-17.

আধুনিক যুগের দর্শনে দেখতে পাওয়া যায়। এর অন্যতম পথিকৃৎ ছিলেন রেনে দেকার্ত (১৫৯৬-১৬৫০), রাসেল রেনে দেকার্তকে আধুনিক দর্শনের জনক হিসাবে অভিহিত করেন। জগতের অধিসত্তা অনুসন্ধানের প্রয়াস দর্শনের সূচনাকাল থেকেই দার্শনিকরা করে আসছেন। তবে বিভিন্ন দার্শনিক এই সম্পর্কে বিভিন্ন মনোভাব পোষণ করেন। রেনে ডেকার্ত অধিসত্তা বিষয়ক আলোচনায় 'দ্রব্য'(substance) শব্দটি উল্লেখ করেন। দ্রব্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ডেকার্ত মনে করেন, "দ্রব্য হলো এমন কিছু যা তার অস্তিত্বের জন্য অন্য কিছুর ওপর নির্ভরশীল নয়" (An existent thing which requires nothing but itself in order to exist) এবং দ্রব্যের ধারণাকে বোঝার জন্য অন্য কোনো ধারণার সাহায্য নিতে হয় না। ডেকার্ত তিন প্রকার দ্রব্য স্বীকার করেন।[3] যথা- ঈশ্বর(God), দেহ(Body) ও মন(Mind), ঈশ্বর হলেন নিরপেক্ষ দ্রব্য এবং দেহ ও মন হল ঈশ্বর সাপেক্ষ দ্রব্য। যদিও তিনি দ্রব্য বলতে বোঝান, যা তার অস্তিত্বের জন্য কারও ওপর নির্ভরশীল নয়, সেই দিক থেকে দেখলে দেহ ও মনকে দ্রব্য বলা যায় না, কারণ তারা ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল। সেই অর্থে ঈশ্বরকেই একমাত্র দ্রব্য বলে অভিহিত করা যায়। এই প্রসঙ্গে পরবর্তী আলোচনার সুবিধার্থে বলে রাখি, ডেকার্ত ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে কয়েকটি যুক্তির উপস্থাপনা করেছেন। কিন্তু আমি এখানে সেই আলোচনায় যাব না। যদিও সেই সমস্ত যুক্তিগুলি খুবই আকর্ষনীয়। তথাপি বর্তমানে আমার গবেষণার আলোচনার সঙ্গে ঠিক অতোটা প্রাসঙ্গিক না বলে মনে করি।

দ্রব্য সংক্রান্ত আলোচনায় এক পর্যায়ে ডেকার্ত গুণ (Attribute) ও প্রত্যংশ (Modes) সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, দ্রব্যের আবশ্যিকধর্ম বা বৈশিষ্ট্য, যা

[3] Russell, Bertrand. (1945). *A History of Western Philosophy.* New York: Simon and Schuster. 564

আবশ্যিকভাবে দ্রব্যের মধ্যে নিহিত থাকে, তাকে গুণ বলে। অন্যদিকে দ্রব্যের পরিবর্তনশীল গৌণ বৈশিষ্ট্যকে বলে প্রত্যংশ। দেহ বা জড় দ্রব্যের আবশ্যিক ধর্ম বা গুণ হল বিস্তৃতি (Extention)। আবার মন নামক দ্রব্যর অপরিহার্য বা আকস্মিক বৈশিষ্ট্য হলো চিন্তন বা চেতনা (Thought or thinking)। তিনি দেহ ও মনকে পৃথক সত্তা বলে চিহ্নিত করেন। তবে এই দুটি সত্তা মানুষের মধ্যে মিলিত হয় এক জটিল সামঞ্জস্য নিয়ে, দেহ তার অস্তিত্বের জন্য মনের ওপর এবং মন তার অস্তিত্বের জন্য দেহের উপর নির্ভরশীল নয়। তবে এই দুটি দ্রব্য (দেহ ও মন) পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করে বলে ডেকার্ত মনে করেন। মানুষের মধ্যে দৈহিক ও মানসিক ঘটনার সামঞ্জস্য দেখতে পাওয়া যায়। ডেকার্ত মনে করেন, ঈশ্বর দেহ ও মনকে সৃষ্টি করেছেন। দেহ (Matter) ও মন (Mind) তাদের অস্তিত্বের জন্য ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল। দেহ ও মন প্রকৃতিতে অবস্থান করে এবং মানুষের মধ্যে দেহ ও মনের সমন্বয় পরিলক্ষিত হয়। বাহ্যবস্তু বা অন্যান্য দেহধারী উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহের মতো মানুষের দেহ আছে। সকল দেহের গুণ হল বিস্তৃতি (extention)। তাই মানুষের দেহেও বিস্তৃতি নামক মুখ্য বৈশিষ্ট্য বা গুণ বর্তমান। ডেকার্ত মনে করেন, সকল বিস্তৃতিসম্পন্ন দেহ যান্ত্রিক নিয়মে চলে এবং দেহগুলির প্রত্যেকটি হল স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র (Automata or moving machines)।

জড় বা দেহের প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি যন্ত্রের সঙ্গে দেহের তুলনা করেন। অর্থাৎ জড় বা দেহের ব্যাখ্যায় তিনি হলেন যান্ত্রিকতাবাদী। তিনি দুই ধরনের যান্ত্রিকতার কথা বলেন। যথা- কৃত্রিম যান্ত্রিকতা এবং প্রাকৃতিক যান্ত্রিকতা। বিষয়টি একটু ভেঙে বললে এরকম দাঁড়ায় মানুষ যে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র তৈরি করে তাকে কৃত্রিম

যান্ত্রিকতার দ্বারা অভিহিত করা যায়। অন্যদিকে প্রকৃতিতে বিদ্যমান দেহগুলি হলো প্রাকৃতিক যান্ত্রিকতার উদাহরণ। অনেকেই মনে করেন মানুষ বা অন্য দেহগুলি ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন। তাই তুলনামূলক আলোচনায় ডেকার্ত বলেন, মানুষের সৃষ্ট কৃত্রিম যন্ত্রগুলি থেকে ঈশ্বরের সৃষ্টি করা দেহগুলি অধিকতর জটিল ও উন্নত। ঈশ্বর হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ স্রষ্টা এবং তাঁর সৃষ্ট যন্ত্র সর্বাপেক্ষা উন্নততর হবেই। ঈশ্বরের সৃষ্টি করা প্রকৃতি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র হিসাবে আমরা উদ্ভিদ, প্রাণী ও মানুষের উল্লেখ করতে পারি। ডেকার্ত মনে করেন, এদের মধ্যে মানবদেহ সবচেয়ে জটিল সংগঠন এবং এটি সর্বাপেক্ষা উন্নত, যদিও মানবদেহও যান্ত্রিক নিয়মে চলে।

কিন্তু মানুষের মধ্যে দেহ ছাড়া মনের সমন্বয় দেখা যায়। এই মনের (Mind) আবশ্যিক বৈশিষ্ট্য বা গুণ হলো চিন্তা করা (Thought / Thinking)। এছাড়া ডেকার্ত *Discourse on Method*-এর পঞ্চম অংশে বলেছেন, আত্মার প্রকৃতি হলো চিন্তা করা।[4] ডেকার্ত তাই মন বা আত্মার কার্যাবলীকে শরীরের বা দেহের কার্যাবলী থেকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক বলেছেন। যদিও এই চিন্তাক্ষমতা বা বুদ্ধি প্রয়োগর ক্ষমতা (Reason) মানুষ ছাড়া না-মানুষের থাকতে পারে না বলে ডেকার্ত মনে করেন। দেহ ও মনের সারধর্ম ও কার্যাবলী ভিন্ন হলেও দেহ ও মন পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করে বলে ডেকার্ত মনে করেন। মনের চিন্তা-চেতনা ভালোলাগা-মন্দলাগা দ্বারা দেহ প্রভাবিত হয়, আবার দেহের অবস্থান দ্বারাও মন প্রভাবিত হয়। যেমন শরীর খারাপ হলে মনও খারাপ লাগে। যাই হোক আমার গবেষণার প্রেক্ষাপটে আলোচনার বিষয়বস্তু হল,

[4] Descartes, Rene. (2006). *A Discourse on the Method.* Maclean, Ian (trans.). New York: Oxford University Press. Ch- 5.

মানুষের কি কেবল বিচারবুদ্ধি আছে? বা ডেকার্ত কি মনে করেন, বুদ্ধিসম্পন্ন আত্মা (rational) একমাত্র মানুষের আছে? -নিম্নে এইসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করবো। দেকার্ত আত্মার বা মনের আবশ্যিক বৈশিষ্ট্য বা গুণ হিসাবে 'চিন্তা করা'কে (to think) বুঝিয়েছেন। এই বৈশিষ্ট্য (চিন্তা করা) যাদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়, তাদেরকেই উন্নত জীব বা মানুষের অনুরূপ বলা যেতে পারে বলে ডেকার্ত মনে করেন। কিন্তু ডেকার্ত যুক্তির দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে বিচারবুদ্ধি বা চিন্তনক্ষমতা একমাত্র মানুষেরই আছে। উদ্ভিদ বা মনুষ্যেতর প্রাণীর (না-মানুষ) বিচার বুদ্ধি বা চিন্তন ক্ষমতা বলে বাস্তবিকপক্ষে কিছু নেই। অতএব মানুষ না-মানুষ অপেক্ষা উন্নততর জীব। এই প্রসঙ্গে দেকার্তকে অনুসরণ করে নিম্নে কিছু যুক্তির অবতারণা করা হল-

প্রথমত: মানুষ শব্দ বা সংকেতের মাধ্যমে অন্যের কাছে তার মনের ভাব বা চিন্তা তুলে ধরে। কিন্তু পশুরা শব্দ বা যথার্থ কোন সংকেতের ব্যবহার করতে পারে না। কিন্তু আমরা তো এমন যন্ত্রের (machine) কল্পনা করতে পারি, যা শব্দ উচ্চারণ করতে পারে। তাছাড়া শব্দ উচ্চারণ তো সম্পূর্ণভাবে দৈহিক বিষয়, ইন্দ্রিয়ের কর্ম বা শারীরিক কর্ম বলা যেতে পারে, অতএব প্রশ্ন হলো, শব্দের ব্যবহার কি চিন্তার অনুমাপক হতে পারে? এর উওরে দেকার্তকে অনুসরন করে বলা যায়, শব্দ উচ্চারণ করতে পারলেই তা চিন্তার প্রকাশ করে না একথা যেমন সত্য, তেমনি একই শব্দের ক্ষেত্রবিশেষে বিভিন্ন অর্থ হতে পারে এবং তা কেবল বিচার-বুদ্ধি বা চিন্তন ক্ষমতা দ্বারাই বোঝা যায় বা প্রয়োগ করা যায়। অর্থাৎ প্রশ্ন অনুসারে, সঠিক শব্দ চয়ন করে নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে মনের ভাবকে সঠিকভাবে শব্দ বা সংকেতের মাধ্যমে একমাত্র মানুষই প্রকাশ করতে পারে। যেমন স্পর্শ অনেক ধরনের হতে পারে এবং স্পর্শ

অনুসারে অন্যরা কি বলতে চাইছে তা প্রকাশিত হয়। সেই কারণে কোনো স্পর্শ সুখের অভিব্যক্তিব্যঞ্জক শব্দ উচ্চারণ করায় এবং কোনো স্পর্শ পেয়ে মানুষ চিৎকার করে ওঠে এবং বলে ওঠে 'সে ব্যথা পেয়েছে' প্রভৃতি। কিন্তু কোন যন্ত্র (যা শব্দ উচ্চারন করতে পারে) ভিন্ন অনুভূতিতে ভিন্ন-ভিন্ন শব্দের ব্যবহার করতে অক্ষম। যদিও কোন নির্বোধ মানুষও তা বোঝাতে সমর্থ্য।

দ্বিতীয়ত: অনেক সময় দেখা যায় মানুষ ছাড়া বিভিন্ন দেহধারী যন্ত্র (পশু-পাখি) এমন অনেক কাজ করতে পারে যা মানুষ করতে সক্ষম। হয়তো বা মানুষের থেকে ভালোভাবে তারা কোন কাজ সম্পাদন করছে, এর থেকে কি এসব না-মানুষদের (যন্ত্র) চিন্তনক্ষমতা নেই- একথা বলা যায়? এর উত্তরে ডেকার্ত বলেন, এইসব না-মানুষেরা বিভিন্ন ধরনের কাজই পারদর্শীতার সাথে কখনো হয়তো করছে। কিন্তু অন্য কোন সাধারণ কাজ হয়তো করতে তারা ব্যর্থ হবে বা সেই কাজ করতে অনেকের মতো তারা অবশ্যই সমর্থ হবে না। কিন্তু তা প্রমাণ করে এইসব না-মানুষরা এসব কাজ করে তাদের ইন্দ্রিয়ের প্রবণতা অনুসারে; কখনই বোঝা (understanding) বা চিন্তার (thinking) সাহায্যে তারা কাজটি করেনি। বিচার-বুদ্ধি একটি সার্বিক বিষয়, যা মানুষ যে কোনো পরিস্থিতিতে যেকোন কাজের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে, কিন্তু বিভিন্ন মনুষ্যেতর প্রাণী বা না-মানুষরা তা করতে পারে না। না-মানুষদের কোন বিশেষ স্বভাব দ্বারা চালিত হতে হয় বা প্রবণতা (disposition) প্রয়োজন হয় কোন বিশেষ কাজ করার জন্য, কিন্তু কোন দেহরূপী যন্ত্রে এত ইন্দ্রিয় থাকেনা, যা প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট কাজ করার জন্য পৃথক–পৃথক প্রবণতা সরবরাহ করবে। মানুষ বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সঠিকভাবে

বিভিন্ন কাজ করতে সক্ষম, কারণ বিচার-বুদ্ধি বা চিন্তা কেবল মানুষেরই আছে। এই যুক্তি প্রমাণ করে মানুষ পশুদের (না-মানুষ) থেকে পৃথক ও উন্নত যন্ত্র।

তৃতীয়ত: অনেক নির্বোধ ব্যক্তি, এমন কী পাগলও নিজের চিন্তাকে বা মনের ভাবকে প্রকাশ করতে সক্ষম। তারা হয়তো বিভিন্ন শব্দকে একসঙ্গে সাজিয়ে বাক্য গঠন করে বলতে পারেনা, তথাপিও তাদের চিন্তাকে আমরা বুঝতে পারি। কিন্তু মানুষ ছাড়া অন্য কোনো প্রাণী; সেই প্রাণী যতই নিখুঁতভাবে তার কাজ করতে পারুক না কেন বা তাকে যতই শেখানো হোক না কেন সেই প্রাণী (মানুষ ব্যতিত) কখনই তাদের চিন্তাকে প্রকাশ করতে পারবে না। এর কারণ শুধুমাত্র এই নয় যে, সেসব প্রাণীদের (না-মানুষ) কথা বলার ইন্দ্রিয় (organs of speech) আছে; এটির একমাত্র কারণ হল এইসব প্রানীদের বিচার-বুদ্ধি নেই। যদি তা না হতো তবে অনেক টিয়া বা তোতাপাখি তো মানুষের মতো কথা বলতে পারে, কিন্তু তাদের এই কথা বলাটা কখনোই তাদের চিন্তা বা বিচারবুদ্ধির প্রকাশক নয় বলে ডেকার্ত মনে করেন। অন্যদিকে একজন মানুষ মূক (dump) বা বধির (deaf) হলেও ধ্বনি-যন্ত্রে অর্থাৎ কথা বলার ইন্দ্রিয়ে (organ of speech) তার সমস্যা থাকলেও সে নিজের মতো করে সংকেত বানিয়ে বা অন্য কোনোভাবে যাদের সাথে সে আছে তাদের কাছে নিজের চিন্তা বা মনের ভাবকে ঠিকমত প্রকাশ করতে পারে। অন্য মানুষ চাইলে এইসব মূক-বধিরদের ভাষা শিখে তাদের সঙ্গে কথা বলতেই পারে। এই যুক্তি প্রমাণ করে, কথা বলতে সক্ষম হওয়াটা কখনই বিচারবুদ্ধি থাকাকে প্রমাণ করে না। আরও বলা য়ায়, কথা বলতে গেলে সেই অর্থে বিচার-বুদ্ধি থাকার দরকার হয় না। তাছাড়া এই যুক্তি দ্বারা ডেকার্ত ইহাও প্রমাণ করেন যে, মানুষের থেকে পশুদের কম বুদ্ধি আছে তাই নয়, পশুদের কোনো বিচার-

বুদ্ধিই নেই (And that proves not only that the brutes have less reason than man, but that they have none at all)।

চতুর্থত: অনেকে মনে করতে পারেন, একটি নির্দিষ্ট প্রজাতির জন্তুদের মধ্যে কিছু জন্তু এমন থাকতে পারে যাদের মানুষের সাথে তাদের তুলনা চলে। যুক্তি দিয়ে তারা হয়তো বলবেন এইসব উন্নত জন্তুদের খুব সহজেই প্রশিক্ষিত করা যায় অন্যান্য জন্তুদের তুলনায়, তাই এইসব জন্তুদের বিচার-বুদ্ধি আছে এমন ভাবতে সমস্যা কি? ডেকার্ত এই সম্ভাব্য প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বলেছেন, তাহলে এমন কিছু জীব-জন্তু আছে ধরে নেওয়া যাক, যারা অন্যান্য জীব-জন্তুদের তুলনায় উন্নততর বা সমর্থ্য সম্পন্ন (So we have the notion of beasts that are abler or superior to their fellows)। এখন স্পষ্টতই কথা বলার ক্ষমতার ক্ষেত্রে খুব বেশি বিচার-বুদ্ধির নিশ্চিত ভাবেই প্রয়োজন হয় না। সুতরাং ডেকার্ত মনে করেন কোন প্রাণীর যদি বিচার-বুদ্ধি থাকে তবে আমরা আশা করতে পারি উচ্চতর প্রজাতির একটি বানর বা উচ্চতর প্রজাতির একটি তোতা পাখি (high grades monkeys or parrots) অন্তত তেমন হবেই। তাই আমরা আশা করতে পারি, যেহেতু কথা বলার জন্য খুব বেশি বিষয়বুদ্ধির যেহেতু প্রয়োজন হয় না, সেহেতু উচ্চতর প্রজাতির একটি বানর বা তোতাপাখি অন্ততপক্ষে একটি নির্বোধ শিশুর (Stupid child) মতো বা মাথার সমস্যা আছে এমন একজন মানসিকভাবে অসুস্থ শিশুর (A child with a defected brain) মতো অন্তত কথা বলতে পারবে। কিন্তু কোন উচ্চতর প্রজাতির বানর বা তোতা পাখি বা অন্য কোনো প্রাণী সেটুকু কথা বলতে পারবে না। এর দ্বারা ডেকার্ত প্রমাণ করেন, জীবজন্তুর আত্মা মানুষের আত্মা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। মানুষের আত্মার আবশ্যিক

বৈশিষ্ট্য বা গুণ হল চিন্তন (বিচার-বুদ্ধি)। কিন্তু জীবজন্তুর এই বিচারবুদ্ধির কোন ক্ষমতা নেই।

পঞ্চমত: বিশেষত প্রাচীনকালে বা আজও অনেকে মনে করেন যে,পশু-পাখিদের নিজস্ব একটি ভাষা আছে যা আমাদের অর্থাৎ মানুষের বোধগম্য হবে না। যদিও তাদের প্রজাতির অন্য পশুরা সেই ভাষা বুঝতে পারে। কিন্তু ডেকার্ত এ কথা মানেন না যে পশু পাখিদের নিজস্ব একটি ভাষা আছে, কিন্তু সেই ভাষা মানুষ বুঝতে অক্ষম। দেকার্ত যুক্তি দিয়ে বলেন, এমন অনেক পশু-পাখি আছে তারা হয়তো ক্ষেত্রবিশেষে খুবই নিখুঁতভাবে কোন কাজ করেছে বা করতে সক্ষম। কিন্তু এর দ্বারা প্রমাণিত হয় কি পশু-পাখিদের বিচারবুদ্ধি (reason) আছে? ডেকার্ত মনে করেন কিছু পশু-পাখি কোন একটি কাজ দক্ষতার সাথে করলেও সমপ্রজাতির অন্যান্য পশুপাখিরা হয়তো সেই কাজ করতে সক্ষম হবে না। ডেকার্ত আরো বলেন সেই বিশেষ কাজ যা পশুপাখিরা করতে সক্ষম তা কখনোই একজন মানুষের থেকে বেশী ভালোভাবে বা দক্ষতা সহকারে তারা করতে পারে না। এইসব পশু-পাখি কোন একটি কাজ করে তাদের ইন্দ্রিয়ের প্রবণতা (disposition of their organ) থেকে, উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যেমনভাবে একটি ঘড়ি তার যন্ত্রগুলি দ্বারা অর্থাৎ চাকা, স্প্রিং প্রভৃতির দ্বারা যেমন একেবারে সঠিক ভাবে সময়ের পরিমাপ করতে সক্ষম, কিন্তু একজন বিচার-বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের সকল দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও সে সময়ের পরিমাপ ঘড়ির মতো নিখুঁত ভাবে করতে পারে না। অর্থাৎ এটার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, একটি ঘড়ি তার যন্ত্রগুলির কাজের প্রবণতা দ্বারা মানুষের থেকেও নিখুঁতভাবে সময়ের পরিমাপ করতে পারে। একইভাবে যেসব পশুপাখি দক্ষতা সহকারে কোন কাজ করছে, তারা সেই কাজ বিচার-বুদ্ধি থেকে করে না, বরং ইন্দ্রিয়ের

প্রবণতা অনুসারেই সেই কাজ করে। এইভাবে ডেকার্ত প্রমাণ করলেন পশু-পাখিদের কোনও মন (mind) নেই এবং তাদের বিচার-বুদ্ধিও (reason) নেই। ডেকার্ত তার *Discourse on Method* পুস্তকের পঞ্চম অংশে বিচার-বুদ্ধি সম্পন্ন আত্মা নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং অন্তিমে দেখিয়েছেন মানুষের কেবল বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন আত্মা ও চিন্তার ক্ষমতা যুক্ত মন আছে।[5]

আত্মার সঙ্গে বা মনের সঙ্গে দেহের সম্পর্ক ব্যাখা করতে গিয়ে ডেকার্ত বলেন একজন জাহাজের নাবিকের সঙ্গে তার জাহাজের যেমন সম্পর্ক, মানুষের সঙ্গে তার আত্মা বা মনের সম্পর্ক অনেক বেশি গভীর। কারণ জাহাজের ক্ষতি হলে নাবিকের সরাসরি কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু মানুষের শরীরের ক্ষতি হলে তার দ্বারা মনও প্রভাবিত হয়। আবার মন ক্ষতিগ্রস্ত হলে তার প্রভাব শরীরের উপর পড়ে। কারণ নাবিক যেমনভাবে জাহাজ চালনা করে, আত্মার সঙ্গে দেহের সম্পর্ক তেমন নয়। আত্মার বা মনের মধ্যে অনুভূতি এবং চাহিদা গুলি (ক্ষুধা-তৃষ্ণা) থাকে। এভাবে দেকার্ত দেহ ও মন মানুষের ক্ষেত্রে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত থাকে ও তারা পরস্পর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করে বলে মনে করেন। উপরের আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট যে দেকার্ত মানুষের মধ্যে চেতন আত্মা বা বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন আত্মা (Rational Soul) স্বীকার করলেও তা উদ্ভিদ বা মনুষ্যেতর প্রাণীর মধ্যে নেই বলে মনে করেন। এই বুদ্ধিমত্তা ঈশ্বর কেবলমাত্র মানুষের জন্যই সৃষ্টি করেছেন বলে ডেকার্ত মনে করেন।

---

[5] Descartes, Rene. (2006). *A Discourse on the Method.* Maclean, Ian (trans.). New York: Oxford University Press. Ch- 5.

২.৪ জন লকের অভিমত

ব্রিটিশ দার্শনিক জন লক মধ্যযুগীয় ধর্মীয় সার্বভৌমত্বের উপরে কার্তেজিয় সহজাত ধারণা অস্বীকার করেন এবং সংবেদন ও অন্তর্দর্শনকে জ্ঞানের উৎস বলেন। কিন্তু প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির বিষয়ে তিনি বুদ্ধিবাদী জ্ঞানবিদ্যা এবং আত্মবাদী নীতিবিদ্যার সমর্থক। লকের সম্পত্তিতত্ত্বে প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্যণীয়।[6] সম্পত্তিতত্ত্বে লক প্রাকৃতিক অধিকারের নীতিতে বিশ্বাসী, যে নীতিতে এই অধিকারকে ঈশ্বর প্রদত্ত বলা হয়, এই অধিকার হল জীবন, স্বাধীনতা ও ভূসম্পত্তির অধিকার। জীবন, স্বাধীনতা ও ভূসম্পত্তির অধিকারকে লক প্রাকৃতিক অধিকার বলে বর্ণণা করেছেন।[7] জগত সৃষ্টির সঙ্গে মানুষকে ঈশ্বর বুদ্ধি দিয়েছেন জীবনকে সহজ করে তোলার জন্য। লক স্পষ্ট বলেছেন পৃথিবীর সবকিছু মানুষের উপভোগের ও বিলাসের জন্য বিষয় সামগ্রী।[8] প্রকৃতির প্রতি প্রয়োগিত শ্রমের দ্বারা মানুষ প্রকৃতির মালিকানা অর্জন করে এবং শ্রমের ফলে রূপান্তরিত প্রকৃতি ব্যক্তির নিজস্ব সম্পত্তি। প্রাকৃতিকভাবে উৎপন্ন সমস্ত কিছুর উপর মানুষের অধিকার আছে।[9] বুদ্ধি মানুষকে জগতের কর্তৃত্ব প্রদান করে। বুদ্ধি দ্বারা মানুষ নিজের শ্রমকে ব্যবহার করে উন্নয়ন ঘটিয়ে এই জগৎকে

---

[6] Locke, John. (1963). *Two Treatise of Government.* Laslett, Peter (ed.). New York: New American Library. Book- II.

[7] Sabine, George H. (1951). *A History of Political Theory.* New York: Henry Holt and company. Pg- 531.

[8] Hargrove, Eugene C. (1989). Foundation of Environmental Ethics. New Jersey: Prentice Hall. Pg-70.

[9] Locke, John. (1963). *Two Treatise of Government.* Laslett, Peter (ed.). New York: New American Library. Pg-329.

নিজের প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহার করে। একে লক ঈশ্বরের নির্দেশ বলেন এবং এভাবেই মানুষ ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারী হয় বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।

লকের সম্পত্তিতত্ত্ব অনুসারে মানুষ নিজের স্বার্থে সম্পত্তি ধ্বংসের অধিকারও পায়। সম্পত্তি ধ্বংসের অধিকারের প্রসঙ্গটি পশু হত্যাকেও সমর্থন করে। নৈতিক দিক থেকে লকের সম্পত্তিতত্ত্ব অনুসারে আত্মবাদকে সমর্থন করে। আত্মবাদ প্রকৃতির ব্যবহারকে মানুষের শ্রমের ও ভোগের ক্ষমতাকেন্দ্রিক করে তোলে। তাই এই দৃষ্টিভঙ্গি মানবকেন্দ্রিক নৈতিকতার অনুগামী। কারণ এখানে প্রকৃতি মানুষের ভোগের উপকরণ, তার নিজস্ব মূল্য নেই। তাই খাদ্যের জন্য পশুহত্যা সমর্থন করতে গিয়েই সম্পত্তি ধ্বংসের বিষয়টি তিনি বলেন। তবে এক্ষেত্রে অপরের সম্পত্তির প্রতি সম্ভাব্য ধ্বংসাত্মক আচরণের ক্ষেত্রে সরকারের হস্তক্ষেপ প্রত্যাশী।[10] তাই লকের মত মানলে পরিবেশের প্রতি মানুষের নৈতিক বোধ গড়ে উঠতে পারেনা।

২.৫ ডেভিড হিউমের অভিমত

হিউম তাঁর *An Enquiry Concerning Human Understanding* গ্রন্থে মানুষের বোধ বা বুদ্ধিশক্তি নিয়ে আলোচনা করেছেন। এই গ্রন্থে তিনি 'Of the reason of animals' নামক শিরোনামে একটি সম্পূর্ণ বিভাগ পশুদের বিচারশক্তি নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাই আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে মানুষের বিচারবুদ্ধি সম্পর্কে আলোচনায় এইরকম পশুদের বিচারশক্তি নিয়ে আলোচনা বোধ হয়

[10] Locke, John. (1963). *Two Treatise of Government.* Laslett, Peter (ed.). New York: New American Library. 1st treatise, 2nd treatise: sec- 92, sec- 31.

অপ্রাসঙ্গিক, কিন্তু হিউম *Enquiry* গ্রন্থের নবম অধ্যায় এই সম্পর্কে যা আলোচনা করেছেন তা বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় তাঁর আলোচনা একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক নয়।

হিউমের মতে কার্যকারণ সম্বন্ধ হলো বাস্তব বিষয় সম্পর্কে অনুমানের ভিত্তি। আমরা যখন বলি 'a হল b এর কারণ'-এই আকারের বাক্যে যে জ্ঞান ব্যক্ত হয় তার মূলে আছে আমাদের অভ্যাস বা অভ্যাস থেকে উৎপন্ন হওয়া প্রত্যাশা। দুটি ঘটনা a এবং b এর মধ্যে নিয়ত সহচর (নিয়মিতভাবে সংযুক্ত থাকতে দেখা) দেখি আমরা বিশেষ অভ্যাস আয়ত্ত করি এবং তারই ফলে পরবর্তীকালে a দেখলে আমাদের b-এর প্রত্যাশা হয়। এছাড়া বাস্তব ব্যাপার সংক্রান্ত অনুমানকে সাদৃশ্যভিত্তিক অনুমান বলা হয়ে থাকে। যেখানে পূর্বের কারণ এবং বর্তমানের কারণ সম্পূর্ণ এক রকম হয়, সেখানে সাদৃশ্য অনুমানটি নির্দোষ হয় এবং আমাদের সিদ্ধান্তটি অধিকতর সঠিক হয়। আমরা দেখেছি a কারণের ফলে b কার্য ঘটেছে, সুতরাং a এর সমতুল্য কোন ঘটনা দেখলে স্বাভাবিকভাবেই আমরা সাদৃশ্যের ভিত্তিতে অনুমান করি যে অতীতে a এর ফলে b ঘটনা ঘটেছে। বর্তমানেও a ঘটলে b কে ঘটতে দেখছি, কাজেই ভবিষ্যতেও a ঘটলে b সদৃশ্য ঘটনা ঘটবে।

মানুষ হল ভাবপ্রবণ এবং সে যে অনুমান করতে পারে বা করে থাকে সেটা তার বোধশক্তি বা বিচারবুদ্ধির পরিচয় দেয়। দুটি ঘটনার মধ্যে সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ করে তার ভিত্তিতে সাদৃশ্য অনুমান মানুষের বোধশক্তিকে প্রকাশিত করে। তাই মানুষকে বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন জীব বলা যেতে পারে, কারণ মানুষ সাদৃশ্যভিত্তিক অনুমান করতে পারে। বাস্তব ঘটনা বিষয়ক সমস্ত যুক্তি অর্থাৎ আরোহ যুক্তির মূলে আছে কার্যকারণ সম্বন্ধ, অন্যভাবে বললে কার্যকারণ জ্ঞানের থেকে উৎপন্ন হওয়া আমাদের অভ্যাস বা

প্রবণতা। এই তত্ত্বের সমর্থনে হিউম মনুষ্যেতর প্রাণীর (পশু পাখি প্রভৃতি) বিচার শক্তির উল্লেখ করেন।

পশুদের বিচার শক্তির আলোচনায় হিউম প্রথমেই বলেছেন এটি প্রতীয়মান হয় যে মানুষ যেমন অভিজ্ঞতার দ্বারা অনেক কিছু শেখে পশুরাও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অনেক কিছু শিখতে পারে। মানুষের মতো মনুষ্যেতর প্রাণীরাও অনুমান করতে পারে যে একই ঘটনা ঘটলে একই ধরনের কার্য ঘটবে। এভাবে সাদৃশ্যমূলক অনুমানের ভিত্তিতে পশুরাও বিভিন্ন বস্তুর বিভিন্ন ধর্মের সঙ্গে পরিচিত হয়। পশুরা তাদের জন্মের পর থেকে ধীরে ধীরে বাহ্য জগতের বিভিন্ন বস্তুর ও বস্তু ধর্মের সঙ্গে যেমন জল, আগুন, মাটি, পাথর, উচ্চতা, গভীরতা ইত্যাদির সঙ্গে পরিচিত হয় এবং তাদের সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে (It seems evident, that animal as well as man learn many things from experience and infer that the same events will always follow from the same causes. Why this principle the become aquinted which the mayor obvious properties of external objects and gradually from their birth treasure up a knowledge of the nature of fire water stones heights day etc and of the effects which result from there operation.)[11]

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে পশুদের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। অভিজ্ঞ পশু যত সহজে নিজেকে বিপদ থেকে মুক্ত করতে পারে, অভিজ্ঞতাসম্পন্ন নয় বা কম অভিজ্ঞতা

[11] David, Hume. (2007). *An Enquiry Concerning Human Understanding.* New York: Oxford Unversity Press. Pg- 73.

সম্পন্ন পশু তা করতে পারে না। এর কারণ হলো অভিজ্ঞ পশু সাদৃশ্য অনুমান করতে যতটা সমর্থ্য অনভিজ্ঞ পশু সাদৃশ্য অনুমান করতে ততটা পটু হয়ে ওঠে না। একটি ঘোড়ার উদাহরণ টেনে হিউম বলেন, যে ঘোড়া দৌড় প্রতিযোগিতায় কখনো অংশগ্রহণ করেনি সে মাঠ, সঠিক উচ্চতা প্রভৃতির সাথে পরিচিত নয়। অন্যদিকে যে ঘোড়া মাঠের সঙ্গে পরিচিত সে ঘোড়া জানে সে কতটা লাফ দিতে পারে এবং সে কখনোই তার ক্ষমতার থেকে বেশি লাফ দেওয়ার চেষ্টা করে না। একইভাবে একটি গ্রেহাউন্ড কুকুরের দলের মধ্যে যে সর্বাপেক্ষা বৃদ্ধ সে তার পূর্ব অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে জানে অর্থাৎ উপদেশ দিতে পারে অতি দ্রুতগামী শিকারকে ধরার ক্ষমতা তার নেই, তাই দলের অন্যান্য দ্রুতগামী কুকুরেরা খরগোশের মতো দ্রুতগামী শিকারের প্রতি দৌড়াতে উদ্যত হলেও বৃদ্ধ কুকুরটি কখনোই করে না।[12]

পশুদের ক্ষেত্রে যে অভিজ্ঞতা ভিত্তিক অনুমানের কথা বলা হয় সেক্ষেত্রে হিউম পশুদের প্রশিক্ষণের কথাও বলেন। তাঁর মতে পুরস্কার অথবা শাস্তির মাধ্যমে পশুদের শিক্ষা দেওয়া যায় এবং এমন কর্মে তাদের দুঃখিত করে তোলা যায় যা তাদের স্বাভাবিক প্রবণতা ও প্রবৃত্তির বিরোধী। যেমন হিউম বলেন, কুকুরের সামনে যখন তার মালিক চাবুক তোলেন তখন সে প্রহার বা পূর্বের থেকে পাওয়া ব্যথার অভিজ্ঞতা থেকে ভয় পায়, অনেক সময় কুকুরকে নির্দিষ্ট নাম দেওয়া হয় এমন ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে সেই কুকুরটি সাড়া দিচ্ছে। এর মূলে অবশ্যই আছে অভিজ্ঞতা নির্ভর অনুমান। কাজেই

[12] David, Hume. (2007). *An Enquiry Concerning Human Understanding.* New York: Oxford Unversity Press. Pg- 73.

হিউমের অভিমত হল পশুরা নির্বোধ নয় কারণ সাদৃশ্য অনুমান প্রয়োগ করে মানুষের মতো তাদের অনেক কিছু শেখানো যায়।

হিউম অবশ্য বলেন পশুদের অনুমান সামর্থ্য থাকলেও সে অনুমান প্রক্রিয়ার সচেতন বা যৌক্তিক পদ্ধতির আশ্রয় নির্ভর হওয়া সম্ভব নয়। সচেতনভাবে যৌক্তিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অনুমান করা পশুদের পক্ষে অসম্ভব কারণ এর পেছনে আছে অবরোহ ও আরোহ যুক্তি। কিন্তু পশুদের অনুমানে যুক্তি বা বিচারবুদ্ধির কোন স্থান নেই। কিন্তু তার মানে এই নয় যে পশুরা বিচারশীল নয়। মানব শিশুদের অনুমান অনেক সময় বিচার বিশ্লেষণমূলক হয় না। মানুষও বহু ক্ষেত্রে দৈনন্দিন জীবনে যৌক্তিক প্রক্রিয়ার আশ্রয় নিয়ে অনুমান করে না। হিউম আরো অগ্রসর হয়ে বলেন এমনকি দার্শনিকরা কখনো কখনো সাধারণ মানুষ ও শিশুদের মতো অভ্যাসবশতই অনুমান করে থাকেন।

২.৬ মানবকেন্দ্রিকতাবাদ ও অ-মানবকেন্দ্রিকতাবাদ

পাশ্চাত্য দর্শন ও ধর্মে পরিবেশের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মানবকেন্দ্রিক। মানবকেন্দ্রিকতাবাদ বলতে বোঝায় মানুষ বিশ্বের কেন্দ্রে অবস্থান করছে এবং বিশ্বে তার স্থান সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই মতবাদ কেবল নৈতিক মানদন্ডগুলো মানুষের উপর আরোপ করে। অ-মানব প্রকৃতির নৈতিক মূল্য এখানে স্বীকার করা হয়নি, এর মূল্য ব্যবহারিক।

মানবকেন্দ্রিকতাবাদের বিপরীতে আছে অ-মানবকেন্দ্রিকতাবাদ, এই মতবাদ মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির স্বতঃমূল্য স্বীকার করে এবং প্রাকৃতিক সত্তাকেও নৈতিক

বিবেচনার অধীন করে। মানবকেন্দ্রিক নৈতিকতায় মানবস্বার্থের বিবেচনাই পরিবেশগত নীতি নির্ধারণের মানদন্ড।[13] এর ফলে সৃষ্টির ধ্বংস প্রক্রিয়া তরান্বিত হবে। তাই আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করে পৃথিবীর সকল উপাদানের সঙ্গে নিজেদের একাত্ম করে তুলতে হবে। মানুষ, পশু-পাখি, উদ্ভিদ, নদী, অরণ্য প্রভৃতি প্রকৃতির সমস্ত উপাদান সমান গুরুত্বপূর্ণ এবং এই পৃথিবীর ভারসাম্য বজায় রাখতে সমস্ত উপাদানের গুরুত্বই আপরিসীম। এইরকম চিন্তার প্রতিফলন পরবর্তীকালে Aldo Leopold-এর গভীর বাস্তুতান্ত্রিক চিন্তা-ভাবনার মধ্যে পাওয়া যায়। তাই পরবর্তী অধ্যায়ে বাস্তুতন্ত্রের প্রেক্ষিতে পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হল।

[13] নন্দী, নবকুমার ও বল, মানিক. (২০১৩). ব্যবহারিক নীতিবিজ্ঞান. কলকাতা: শ্রীভূমি পাবলিশিং হাউস. পৃঃ- ১৩০-১৫১.

তৃতীয় অধ্যায়

বাস্তুতন্ত্রের প্রেক্ষাপটে পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যা

৩.১ ইকোলজি শব্দের অর্থ

একজন সাধারণ মানুষ বা স্কুলের একজন মেধাবী ছাত্রকে যদি প্রশ্ন করা হয় বাস্তুতন্ত্র বা ইকোলজি (Ecology) কী? তাহলে তার উত্তর সাধারণত এমন হবে যে, বাস্তুতন্ত্র, যে পরিবেশে উদ্ভিদ এবং প্রাণী বসবাস করে তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ক তত্ত্ব (Ecology is concerned with the relationship between plants and animals and the environment in which they live.)। কিন্তু এই ব্যাখ্যা দ্বারা উপরে বর্ণিত সম্পর্ক নামক বিষয়টি পরিপূর্ণভাবে বোঝানো সম্ভব হচ্ছে না। কাজেই আমাদের প্রথম কাজ হবে 'ইকোলজি' সম্পর্কে আমাদের চিরাচরিত ধারণার অন্তর্গত এই দুটি শব্দকে (সম্পর্ক ও পরিবেশ) ব্যাখ্যা করা।

প্রথমেই প্রশ্ন হল, 'সম্পর্ক' বলতে এই চিরাচরিত ধারণায় ঠিক কী বোঝানো হয়েছে? কারণ সম্পর্ক বলতে অনেক ধরণের সম্ভাব্য সম্পর্ক থাকতে পারে, জৈব জগতের (organism) বিষয়ের (উদ্ভিদ, প্রাণী এবং অন্যান্য জীবিত বিষয়) সঙ্গে অজৈব জগতের (non-living world) বিভিন্ন সম্পর্ক থাকতে পারে। এখানে আরও একটি প্রশ্ন ভীষণ জরুরী তা হল- খাদ্য-খাদক সম্পর্ক, যা বাস্তুতন্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক।

অন্যদিকে পরিবেশ বলতে কী বোঝায় তা পূর্বে আমি আলোচনা করেছি। তথাপি বর্তমান প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে, পরিবেশের ধারণা সমস্ত জৈব জগত এবং অজৈব

জগত সবকিছুকে অন্তর্ভুক্ত করে। আবহাওয়া, মাটির জৈব ও রাসায়নিক গঠন, ঋতু পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে দিন ও রাত্রি- এই সমস্ত কিছুই আমাদের পরিবেশের অন্তর্গত। তাই পরিবেশ বলতে যথার্থই বলা হয়েছে, 'যা আমাদের ঘিরে রাখে'। কোন জীবন পরিবেশ ছাড়া অস্তিত্বশীল হতেই পারেনা। [1]

Hans Reiter 1868 সালে ইকোলজির যে ধারণা দিয়েছেন তা হল, 'Ecology' শব্দটি দুটি শব্দের মেলবন্ধনে তৈরী হয়েছে। একটি হল 'oikos' যার অর্থ হল বাসস্থান বা গৃহ এবং 'logos' শব্দের অর্থ হল আলোচনা বা পড়াশোনা (study)। এই ইকোলজি সম্পর্কে 1869 সালে জার্মান জীববিজ্ঞানী Ernest Haeckel বলেছেন, ইকোলজি হল বিজ্ঞানের এমন এক শাখা যা জীবিত প্রাণীসমূহ এবং তাদের পরিবেশের আন্তঃসম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে (Ecology is a branch of science which deals with the study of interrelationship between living organisms and their surroundings.[2])।

Woodbury 1954 সালে ইকোলজিকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে বলেছেন, বাস্তুতন্ত্র হল এমন একটা বিজ্ঞান যা জীবের সঙ্গে পরিবেশের সম্পর্ক নিয়ে অনুসন্ধান করে (Woodbury defined Ecology as science that investigate organisms in relation to the environment.[3])।

---

[1] Haeckel, Ernst. (2013). History of Ecological Science (Part 47). Ernst Haeckel's Ecology. *Bulletin of the Ecological Society of America*. July. Pg: 222-224.

[2] Ibid. Pg: 222-224.

[3] Owen, D. F. (1974). *What is Ecology?* New York: Oxford University Press. Pg- 1-5.

E. P. Odum 1969 সালে বলেছেন, ইকোলজি প্রকৃতির গঠন ও কার্যকারিতা সম্পর্কে অধ্যয়ন (Ecology as the study of structure and function of nature.)[4]। তিনি আরও বলেছেন, বাস্তুতন্ত্র হল জীবকূল ও তার চারপাশের প্রাকৃতিক পরিবেশ নিয়ে গঠিত এমন এক মৌলিক কর্মভিত্তিক একক যাতে উদ্ভিদ ও প্রাণীকূল পরস্পরের সঙ্গে এবং চারপাশের প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কে আবদ্ধ থাকে।

ব্রিটিশ বিজ্ঞানী A. G. Tansley 1935 সালে তাঁর 'Ecology' পত্রিকায় বাস্তুতন্ত্র সম্পর্কে বলেছেন- "...এটি হল এমন একটি সমগ্র ব্যবস্থা, যার অন্তর্ভুক্ত শুধুমাত্র জীবকূলই নয় সমগ্র প্রাকৃতিক বিষয়গুলিও" (The whole system including not only the organism complex but also the whole complex of physical factors...)[5]।

Arthur George Tansley (1871-1955) ছিলেন একজন ব্রিটিশ উদ্ভিদ বাস্তুবিদ (Plant Ecologist). যিনি 1913 সালে ব্রিটিশ ইকোলজিকাল সোসাইটির প্রথম প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন। 1935 সালে তিনি বাস্তুসংস্থান সম্পর্কিত শব্দগুলিকে এবং তাদের ব্যবহারকে, উদ্ভিদের মৌলিক ধারণাসহ তখন ব্যবহৃত পরিবেশগত পদগুলি নিয়ে প্রশ্নের উত্থাপন করেন। তিনি সর্বপ্রথম ecosystem শব্দটি ব্যবহার করেন।[6] 'Ecosystem' হল Ecology-র আলোচনার মূল বিষয়।

---

[4] Owen, D. F. (1974). *What is Ecology?* New York: Oxford University Press. Pg- 1-5.

[5] Tansely, A. G. (1935). The Use and Abuse of Vegetational Concepts and Terms. *Ecology.* Vol- 16. Pg- 284-307.

[6] Ibid. Pg- 284-307.

সাধারণত বিজ্ঞানীরা মনে করেন, সজীব উপাদান (biotic components) এবং জড় উপাদান (abiotic components) একত্রে মিলিত হয়ে বাস্তুতন্ত্র গঠন করে। অর্থাৎ বাস্তুতন্ত্র এমন একধরনের গুরুত্বপূর্ণ একক যেখানে সজীব ও জড় বা অজীব উপাদান পারস্পরিক মিথষ্ক্রিয়া করে।[7] বাস্তুতন্ত্রের সজীব উপাদানের অন্তর্গত হল মানুষ। কাজেই মানুষের সঙ্গে বাস্তুতন্ত্র তথা পরিবেশের প্রতিনিয়ত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ঘটে। মানুষ ও পরিবেশের পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলে যে নীতিসূত্রগুলির উদ্ভব হয়, সেগুলি যেখানে আলোচনা করা হয় তাকে পরিবেশ নীতিশাস্ত্র (Environmental Ethics) বলে। মানুষের সমস্ত কাজকর্ম, জীবনযাত্রা এবং কর্মনীতি বিভিন্নভাবে আমাদের পরিবেশ তথা বাস্তুতন্ত্রকে প্রভাবিত করে। তাই সবকিছুই পরিবেশ নীতিশাস্ত্রের অন্তর্গত। তাছাড়া পরিবেশ নীতিশাস্ত্রে এমন অনেক জটিল নৈতিক প্রশ্ন নিয়েও আলোচনা করা হয়, যার সম্মুখীন আমরা প্রতিনিয়ত হই। আমরা জানি ব্যবহারিক জীবনে নানা ধরনের কঠিন ও জটিল বিষয়ের নৈতিক সমাধানের জন্য যে নীতিবিজ্ঞানের উদ্ভব ঘটেছে তাকে ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা বলে। ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা নীতিবিদ্যার এমন একটি শাখা যা মানুষের ব্যক্তিগত, পেশাগত, প্রযুক্তিগত প্রভৃতি যে কোনো নৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যবহার করা হয় (Applied ethics is a branch of ethics devoted to the treatment of moral problems, practices and politics in personal life, professions, technology and government.) । অর্থাৎ সেদিক থেকে বিবেচনা করলে পরিবেশ নীতিশাস্ত্র হল

[7] Owen, D. F. (1974). *What is Ecology?* New York: Oxford University Press. Pg- 3-8.

ব্যবহারিক নীতিবিদ্যার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। শুধুমাত্র মানুষই এর আলোচনার আংশ নয় বায়ু, মাটি, উদ্ভিদ, জল প্রভৃতি সবই পরিবেশ নীতিশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত।[৪]

৩.২ Leopold-এর ভূমি নীতিবিদ্যা

মানুষ বহু শতাব্দী ধরে পরিবেশ তথা বাস্তুতন্ত্রের প্রত্যেকটি উপাদানকে নিজের ইচ্ছামতো ব্যবহার করে চলেছে এবং মানুষ মনে করতো এই উপাদানগুলি বোধহয় মানুষের প্রয়োজন মেটানোর জন্যই সৃষ্টি হয়েছে। তাই মানুষ সীমাহীনভাবে বনাঞ্চল ধ্বংস করেছে। জীবনদায়ী জলকে দূষিত করেছে, কল-কারখানা ও যানবাহনের ধোঁয়ায় পরিবেশ দূষণ বৃদ্ধি করে নিজের এবং অন্যান্য প্রাণীদের জীবন দুর্বিসহ করে তুলেছে। মানুষ ভেবেছিল প্রকৃতি বোধহয় নীরব শ্রোতার মতো এসব সহ্য করতেই থাকবে। কিন্তু অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, ভূমিকম্প, প্লাবন প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয় মানুষকে বুঝিয়ে দিয়েছে প্রকৃতি প্রতিশোধ নিলে তা মানুষের জন্য কতটা ভয়াবহ হতে পারে। পূর্বের পরিচ্ছেদে আমরা দেখেছি কিভাবে পরিবেশ নীতিশাস্ত্র ব্যবহারিক নীতিবিদ্যার অংশ হিসাবে পরিচিত হয়েছে। নীতিশাস্ত্রের আলোচনার মধ্যে পরিবেশগত তথা বাস্তুতন্ত্রের সমস্যাকে অন্তর্ভুক্ত করে চিন্তাধারায় পরিবর্তনের মাধ্যমে বাস্তুতন্ত্রের সমস্যার সমাধান দার্শনিক আলোচনার দ্বারাই সম্ভব- এরূপ মত সম্ভবত আমেরিকান চিন্তাবিদ্ Aldo Leopold (1887-1948) সর্বপ্রথম ব্যক্ত করেন।[৯]

Leopold বনবিভাগে কর্মরত থাকাকালীন অরণ্যের ধ্বংসকে নিজের চোখে দেখে নৈতিকতার গুরুত্বকে বুঝেছিলেন। বাস্তুতন্ত্রের প্রতিনিয়ত ক্ষতি হওয়া দেখে তিনি

---

[৪] চক্রবর্তী, নির্মাল্য নারায়ণ. (২০০২). *পরিবেশ ও নৈতিকতা.* কলকাতা: প্রগ্রেসিভ বুক ফোরাম. পৃঃ ১-৫.

[৯] চক্রবর্তী, নির্মাল্য নারায়ণ. (২০১৯). *পরিবেশ ও নীতিবিদ্যা.* কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ. পৃঃ ৬.

বুঝেছিলেন এর সাথে মানুষের টিকে থাকাও হুমকির সম্মুখীন হবে। তিনি প্রত্যক্ষভাবে অরণ্য তথা বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের সাথে জড়িত না থাকলেও বাস্তুতন্ত্রের সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তাকে অন্তর থেকে অনুধাবন করেছিলেন। মানুষের মানবিক মূল্যবোধের অন্তর্গত নৈতিক মূল্যবোধের দ্বারা আমরা উচিত অনুচিতের ধারণা পেতে পারি। তাই মানুষের বাস্তুতন্ত্রের ধ্বংসকে নৈতিকতার মানদন্ডে অবশ্যই অনুচিত কাজ বলে গণ্য করতে হয়। [10]

ব্যক্তি হল সমাজের সদস্য এবং সমাজের প্রত্যেকটি সদস্য পারস্পরিক নির্ভরশীলতার সম্পর্কের দ্বারা আবদ্ধ। মানুষের নৈতিক মূল্যবোধ মানুষকে বাস্তুতন্ত্র তথা সমাজের সকল উপাদানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সহাবস্থান তথা সহযোগিতার কথা বলে। তাই নৈতিকতার ধারণার মধ্যে মাটি, উদ্ভিদ, প্রাণীজগৎ, জল প্রভৃতি সকল কিছুরই স্থান পাওয়া উচিৎ- Leopold একে Land Ethics (ভূমি নীতিবিদ্যা) বলেছেন। এই সকল প্রকৃতির উপাদানকে (উদ্ভিদ, প্রাণীজগৎ, জল, মাটি প্রভৃতি) তিনি 'মাটি' (land) নামে অভিহিত করেছেন। অন্যভাবে বললে, ভূমি নীতিবিদ্যার পরিধির অন্তর্ভুক্ত হল মাটি, জল, উদ্ভিদ, প্রাণীজগৎ অথবা এদের সকলকে একত্রে ভূমি (the land) বলা যেতে পারে।[11] তাঁর ভূমি নীতিবিদ্যায় পরিবেশের সকল উপাদানের বেঁচে থাকার অধিকারকে স্বীকার করা হয়েছে। ভূমি নীতিবিদ্যা মানুষের ভূমিকাকে জমির বিজেতা থেকে জমির একজন সাধারণ সদস্যতে পরিবর্তন করার কথা বলে, যাতে পরিবেশের অন্য সকল সদস্যের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধার ভাবনা জাগ্রত হয়। তাছাড়া বাস্তুতন্ত্রের ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা

---

[10] Leopold, Aldo. (1949). The Land Ethics. *A Sand County Almanac.* Pg- 201-226.

[11] Ibid. Pg- 204.

দিলেও বোঝা যাবে মানুষ কেবল জৈব জগতের একজন সদস্য। অনেক ঐতিহাসিক ঘটনাকে এখনো পর্যন্ত মানুষের পরিপ্রেক্ষিতেই ব্যাখ্যা করেছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে একে মানুষ ও ভূমির জৈব ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলশ্রুতি হিসাবে দেখা যেতে পারে।

বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ পরিবেশ তথা বাস্তুতন্ত্রের সংরক্ষণের কথা বলে থাকে। কিন্তু প্রশ্ন হল সংরক্ষণ (conservation) বলতে ঠিক কি বোঝায়? এর উত্তরে বলা যায়, মানুষ ও ভূমির এক সামঞ্জস্যপূর্ণ সহাবস্থান হল সংরক্ষণ (Conservation is a state of harmony between man and land)[12]। Leopold সেই সময়ে সংরক্ষণের যে ধীর গতির কথা বলেছিলেন, আমার মনে হয় আজও সেকথা সমানভাবে সত্য। সংরক্ষণ বিষয়ক শিক্ষার ব্যাপক প্রসার হওয়া দরকার। সংরক্ষণের একটি ন্যায্য সারাংশ দেওয়া খুবই কঠিন। কিন্তু Leopold মনে করেন সাধারণভাবে সংরক্ষণ বলতে যা বোঝায় তা হল- আইন মানা, ভোটাধিকার প্রয়োগ, কিছু প্রতিষ্ঠানে যোগদান করা এবং যে ধরণের সংরক্ষণ করলে ভূমির (উদ্ভিদ, প্রাণীজগৎ, জল, মাটি) মঙ্গল হবে তার অনুশীলন করা। ব্যক্তি এই কাজ করবে এবং অবশিষ্ট কাজ সরকার করবে। কিন্তু তাঁর মতানুসারে, এই সংজ্ঞাটি কোনো ঠিক ভুল নির্ধারণ করেনা, কোন বাধ্যবাধকতা নির্ধারণ করেনা, কোন ত্যাগের আহ্বান জানায় না, মূল্যবোধের দর্শনের ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তনকেও নির্দেশ করেনা। ভূমি ব্যবহারের বিষয়ে এটি শুধুমাত্র পরিমার্যিত আত্মস্বার্থের শিক্ষা দেয়। তাই এই শিক্ষা সুদূরপ্রসারী নয়। কিছু সাধারণ সহজ সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে পরিবেশ সংক্রান্ত শিক্ষার বিস্তার প্রয়োজন। মানুষকে এমন শিক্ষা দিতে হবে যাতে ভূমির প্রতি মানুষের কর্তব্য প্রকাশিত হয়- তবেই পরিবেশ সংরক্ষণ সম্ভব।

---

[12] Leopold, Aldo. (1949). The Land Ethics. *A Sand County Almanac.* Pg- 207.

এখনো মানুষ বৃষ্টির জলকে ঠিকমতো সংরক্ষণ বা ব্যবহার করতে পারেনা, ফসলা জমির বৈচিত্র্য ও নান্দনিকতাকে সংরক্ষণ করতেও এখনো মানুষ অসমর্থ। কারণ মানুষ অর্থনৈতিক স্বার্থের বাইরে অন্য কিছু বৃহত্তর স্বার্থ ভাবতেই পারে না। তাই মানুষের বিবেককে জাগ্রত করতে হবে, তবেই ভূমির প্রতি মানুষের কর্তব্যপরায়ণতা জাগ্রত হবে। নীতিশাস্ত্রের কোনো গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন ছাড়া কখনোই সম্ভব নয়। Leopold-এর মতে, সংরক্ষণের ধারণা যেহেতু দর্শন ও ধর্মের ভিত্তি স্পর্শ করতে পারেনি বা গৃহীত হয়নি, তাই সংরক্ষণ তার ব্যপকতা লাভ থেকে বঞ্চিত রয়েছে।[13]

Leopold মনে করেন, সংরক্ষণ ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। প্রকৃতির যে উপাদানের কোনো অর্থনৈতিক মূল্য নেই, তারা সংরক্ষণযোগ্য নয় বলে মানুষ মনে করে থাকে। কিন্তু সকল উদ্ভিদ ও প্রাণী এক বৃহৎ জৈব সমাজের অংশ এবং এদের স্থায়ীত্ব বা টিকে থাকা সমগ্র জীব সমাজের স্থায়ীত্বের জন্য প্রয়োজন। কেবলমাত্র অর্থনৈতিক লাভ-ক্ষতির হিসাব করে যদি সংরক্ষণ নীতি নির্ধারিত হয় তবে তা আমাদের সকলের জন্য মঙ্গলজনক নাও হতে পারে। সমাজের সকল উপাদানেরই গুরুত্ব আছে বলে তিনি মনে করেন। তাই পরিবেশের যে উপাদান অর্থনৈতিকভাবে অ-লাভজনক তাকে নিয়ে চিন্তা না করে কেবল লাভজনক উপাদানকে মূল্যবান মনে করলে পরিবেশগত সমস্যার সমাধান প্রায় অসম্ভব। কারণ অর্থনৈতিক দিক থেকে সমাজের যে উপাদানগুলি লাভজনক তাকে কেন্দ্র করেই সরকারের সমস্ত প্রকল্প গৃহীত হয়। তাই সমাজের সকল উপাদানকে মানুষকেই গুরুত্ব দিতে হবে। তিনি বাস্তুতন্ত্রের

[13] Leopold, Aldo. (1949). The Land Ethics. *A Sand County Almanac*. Pg- 210.

গুরুত্বকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জীব পিরামিডের কথা বলেন। জমি ব্যবহারের ক্ষেত্রে মানুষ অর্থনৈতিকভাবে নিজের স্বার্থের কথাই ভাবে এবং এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, যাতে মানবসমাজেরই লাভ হয় কিন্তু এমন চিন্তাভাবনা পরিবেশ তথা জমির অবক্ষয় রোধ করতে পারে না। জমি তথা পরিবেশের প্রতি মানুষের বিবিধ কর্তব্য আছে কিন্তু পরিবেশ শিক্ষায় মানুষের এই কর্তব্যকে যদি ব্যাখ্যা করা না হয় তবে প্রকৃত অর্থে পরিবেশ সংরক্ষণ সম্ভব হবে না। পূর্বেই বলেছি বাস্তুতন্ত্রকে বোঝার জন্য Leopold জীব পিরামিডের কথা বলেছেন। এই পিরামিডের একদম নীচে মাটি আছে, তাঁর উপরে আছে উদ্ভিদ। সেখানে বিভিন্ন ধরণের কীট-পতঙ্গের ও পশু-পাখির বাস। এইভাবে নীচ থেকে উপর পর্যন্ত বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণী এই জীব পিরামিডে স্থান পেয়েছে এবং একেবারে শীর্ষে রয়েছে বৃহত্তর মাংসাশী প্রাণীর দল (The bottom layer is the soil, a plant layer rests on the soil and insects layer on the plants, a bird and rodent layer on the insects and so on up through various animal groups to the apex layer, which consists of the larger carnivorous.)[14]।

এই পিরামিডের প্রত্যেকটি স্তর কখনো খাদ্য-খাদক সম্পর্কে আবার কখনো অন্যান্য বিভিন্ন প্রয়োজনীয় কাজ করার ক্ষেত্রে একে অপরের উপর নির্ভরশীল। এই পিরামিডের একেবারে নীচের দিকে বিভিন্ন প্রজাতির উল্লেখ থাকলেও যত উপরের দিকে ওঠা যায় তত প্রজাতির সংখ্যাগত প্রাচুর্যে হ্রাস ঘটে। এইভাবে ভাবলে জমি শুধুমাত্র আর জমি থাকেনা, তা বিভিন্ন শক্তির প্রাণকেন্দ্র হয়ে ওঠে। খাদ্যশৃঙ্খল বিচার

[14] Leopold, Aldo. (1949). The Land Ethics. *A Sand County Almanac.* Pg- 215.

করে এই প্রাণশক্তি পিরামিডের নীচ থেকে উপর দিকে অগ্রসর হয়। মানুষ এর মধ্যে একটি মধ্যবর্তী স্তর। এই পিরামিডের একটি স্তরের কোনো পরিবর্তন ঘটলে বা ক্ষতিগ্রস্ত হলে অন্যান্য স্তরও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিবর্তনের এই দীর্ঘ পথে বিভিন্ন পরিবর্তন যুগ যুগ ধরে ঘটে চলেছে। এরফলে প্রাণশক্তির প্রবাহ ধীরে ধীরে বিস্তৃতি লাভ করেছে। বিবর্তনের এই গতিপথে মানুষ নতুন নতুন বিষয় আবিষ্কার করেছে। বিভিন্ন যন্ত্র, কৃষিবিজ্ঞানের উন্নতি প্রভৃতি নানান আবিষ্কারের ফলে সভ্যতায় বৈচিত্র্য এসেছে। এই শক্তিকে ব্যবহার করার ফলে ভূমিক্ষয় প্রতিনিয়ত বেড়েছে। জলদূষণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বিভিন্ন জায়গায় মানুষ তার প্রয়োজনে বাঁধ নির্মাণ করে অন্যান্য পশুপাখির স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে ব্যাহত করেছে।[15]

Leopold বলেন, জমি বলতে শুধুমাত্র মাটি নয় (Land then, is not merely soil; it is a function of energy following through a circuit of soil, plants and animals.)[16]। এটি একটি শক্তির প্রবাহ যা উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্যে শক্তির প্রবাহকে উন্মুক্ত রাখে। বিবর্তনের ফলে যে পরিবর্তন দেখা যায়, সেই পরিবর্তন গুণগতভাবে আলাদা এবং মানুষের সৃষ্টি করা পরিবর্তনের ফল অনেক ব্যাপক এবং অনুমানের উপর নির্ভরশীল। এই আলোচনার প্রেক্ষিতে যে বিষয়টি আমাদের সামনে উঠে আসে তা হল- বাস্তুতন্ত্রে মানুষের হস্তক্ষেপ বা বাস্তুতন্ত্রের উপর মানুষের করা হিংসা যত কম হবে পিরামিডের বিভিন্ন উপাদানগুলি পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ততই ভালোভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ গতিতে এগিয়ে চলতে পারবে। এর জন্য সর্বপ্রথম যা প্রয়োজন

---

[15] চক্রবর্তী, নির্মাল্য নারায়ণ. (২০১৯). *পরিবেশ ও নীতিবিদ্যা.* কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ. পৃঃ ১৮.

[16] Leopold, Aldo. (1949). The Land Ethics. *A Sand County Almanac.* Pg- 217-218.

তা হল মানবসমাজের এই বিপুল জনসংখ্যার হ্রাস ঘটানো। জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঘটলে স্বাভাবিকভাবেই মানুষ আরও চাহিদার আশায় প্রকৃতিকে এভাবেই প্রতিদিন ধ্বংস করে চলবে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঘটলে জনঘনত্বও বাড়বে এর ফলে পরিবেশের উপর মানুষের চাপ আরও বেড়ে যাবে। ভূমি নীতিবিদ্যা এক বিবেক জাগ্রত করার কথা বলে যেখানে মানুষের পরিবেশের প্রতি কিছু কর্তব্য তথা দায়বদ্ধতা আছে। তাই ভূমির স্বাস্থ্যের প্রতি মানুষকে গুরুত্ব দেওয়া জরুরী। ভূমির নিজের অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে নিজেকে পুনরুদ্ধার করার যে ক্ষমতা তাই হল জমির স্বাস্থ্য। শক্তিপ্রবাহকে উদ্ভিদের এবং প্রাণীর মাধ্যমে ভূমিতে ফিরিয়ে আনতে হবে। উর্বরতা হল ভূমির সেই ক্ষমতা যা শক্তিগ্রহণ সঞ্চয় করে এবং এই শক্তিকে প্রকাশের ক্ষেত্রে ভূমির উপস্থিতি প্রয়োজন। তাই সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ভূমির স্বাস্থ্য রক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। তাই Aldo Leopold-এর এই শক্তিপ্রবাহকে ব্যাখ্যা করে তিনটি মূল নীতির উল্লেখ করা যায়-

(১) ভূমি বলতে নিছক মাটি নয়, ভূমি হল প্রাণের ভিত্তি (The land is not merely soil.)।

(২) দেশীয় উদ্ভিদ ও প্রাণী জীব পিরামিডের শক্তিপ্রবাহকে অক্ষুন্ন রাখে (That the native plants and animals kept the energy circuit open; others may or may not.)।

(৩) মানুষের দ্বারা যে পরিবর্তন প্রকৃতির জগতে সাধিত হয় তা ক্রমান্বয়ে অন্য পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করতে পারে, এর ফলে কিছু অনিচ্ছাকৃত পরিবর্তন ঘটতে পারে এবং তা অভাবনীয় রূপ ধারণ করতে পারে (That manmade changes are of a

different order than evolutionary changes and have effects more comprehensive that is intended or foreseeing.)।[17]

Leopold-এর মতে, বিজ্ঞানীদের মাঝে এমন ধারণা কাজ করে যেখানে প্রকৃতিকে মানুষ যেন নিজের ইচ্ছামতো ব্যবহার করতে পারে। যেমন- অরণ্য ও অরণ্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে মানুষ নিজের ইচ্ছামতো প্রকৃতিকে ব্যবহার করে অথচ জাতীয় অর্থনীতিতে ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় অরণ্যের গুরুত্ব আমরা সচেতনভাবে প্রকাশ করি। একটি অরণ্যে বহু ধরণের উদ্ভিদ, প্রাণী, লতা-গুল্ম প্রভৃতির সংমিশ্রণ দেখতে পাওয়া যায়। একটি অরণ্য গড়ে উঠতে হাজার হাজার বছর সময় লাগতে পারে, সেখানে কত নতুন পশুপাখি, উদ্ভিদজগৎ নিজেদের বাস্তুতন্ত্রকে বজায় রেখে অরণ্যকে সমৃদ্ধ করে চলেছে। এমন অরণ্যকেই প্রাকৃতিক অরণ্য বলে। মানুষের সীমাহীন লোভের ফলে এই অরণ্য আজ বিলুপ্তির পথে। জীব বৈচিত্র্যকে রক্ষা করতে ভূমির মূল্য মানুষ আজ বুঝতে পেরেছে, তাই ভূমির পরিবর্তন ঘটাতে হলে আমাদের স্থিতিশীল পরিবর্তনের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে, যাতে অন্যান্য প্রাণীরাও টিকে থাকতে পারে। ভূমি হল বাস্তুতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। জীব পিরামিডের আলোচনায় দেখা গেছে, জৈব এবং অজৈব উভয় উপাদানের মিথস্ক্রিয়ার ফলে সমস্ত বাস্তুতন্ত্রের টিকে থাকা, বিকাশ ও বৃদ্ধি নির্ভরশীল। বাস্তুতন্ত্রের পরিবর্তন জীবসমূহকে তথা বাস্তুতন্ত্রের প্রত্যেকটি উপাদানকে প্রভাবিত করে, তাই আমাদের এমন পরিবর্তন থেকে বিরত থাকতে হবে, সেখানে অন্যান্য জীবের বেঁচে থাকার উপাদানের অভাব যেন না ঘটে।[18]

---

[17] Leopold, Aldo. (1949). The Land Ethics. *A Sand County Almanac.* Pg- 218.

[18] খানম, রাশিদা আখতার. (২০১৩). *পরিবেশ নীতিবিদ্যা,* ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ. পৃঃ ১৬.

Leopold ভূমির সঙ্গে নৈতিক সম্পর্কের কথা বলেন। যেখানে তিনি ভূমির প্রতি ভালোবাসা, শ্রদ্ধা এবং প্রশংসার কথা বলেছেন। মূল্যবোধ ছাড়া ভূমিকে কখনোই রক্ষা করা যাবে না বলে তিনি মনে করেন। ভূমিকে অর্থনৈতিকভাবে বিচার না করে জনমানসে ভূমির প্রতি এক গভীর চেতনার উন্মেষ ঘটানোর দিশা তিনি দেখিয়েছেন। ভূমির সঙ্গে বহু আধুনিক মানুষের কোনো সাক্ষাৎ সম্পর্ক যেহেতু নেই, তাই ভূমিকে তারা নিজের ইচ্ছামতো ব্যবহারের কথা ভাবতে পারে। মানুষ ভূমিকে নিজের বিনোদনের জন্য, পরিবহনের জন্য, ফসল উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় বলে মনে করে অর্থাৎ ভূমির থেকে মানুষের উপযোগিতাকে মানুষ অনেক বেশি প্রয়োজনীয় বলে মনে করে। এখন কৃষক অনেক সময় জমিকে তার খারাপ অবস্থার জন্য দায়ী করে তার প্রতি নিজের ভালোবাসা হারায়। এমন হলে প্রকৃতপক্ষেই প্রকৃতি রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। ভূমি সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞানলাভের জন্য বা বাস্তুতন্ত্র সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞানলাভের জন্য তথাকথিত শিক্ষার উর্দ্ধে উঠে মানুষকে বাস্তুতন্ত্রের বোধ জাগ্রত করতে হবে।

Leopold মনে করেছেন, ভূমিকে শুধুমাত্র অর্থনৈতিকভাবে না দেখে নৈতিক ও নান্দনিক ভাবেও দেখা প্রয়োজন। বাস্তুতন্ত্রের সমস্ত উপাদানের অখন্ডতা, ভারসাম্য ও সৌন্দর্য রক্ষার ক্ষেত্রে মানুষকে তার চিন্তাধারার পরিবর্তন করা দরকার। ভূমি নীতিকে সামাজিক বিবর্তনের অঙ্গ হিসাবে গুরুত্ব দেওয়া আশু প্রয়োজন। জমি তথা পরিবেশের সংরক্ষণের সদিচ্ছা থাকলেও চিন্তাশীল পরিকল্পনা ছাড়া তা বাস্তবায়িত করা সম্ভব নাও হতে পারে। নৈতিক কাজের প্রতি সামাজিক সম্মতি ও অর্থনৈতিক লাভজনক কিন্তু

বাস্তুতন্ত্রের প্রতি ক্ষতিকারক- এমন কাজের প্রতি জনমানসে সামাজিক বিরোধিতা জাগ্রত করতে পারলে তবেই ভূমি নীতিবিদ্যার উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হবে।[19]

৩.৩ গভীর ও অগভীর বাস্তুতন্ত্র

পৃথিবী যখন অবিরাম জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে লড়াই করে চলেছে তখন প্রকৃতি এবং মানুষের মধ্যে সম্পর্ককে নতুন করে উদ্ভাবন করে পরিবেশগত দর্শনকে বোঝা প্রয়োজন। এই পরিবেশগত দর্শন দুটি হল- গভীর ও অগভীর পরিবেশবাদ।

পরিবেশগত অবক্ষয় মোকাবিলা করার জন্য আমরা প্রচলিত দূষণ এবং পরিবেশগত অবক্ষয় ব্যবস্থার থেকে ভিন্ন কিছু অনুসন্ধান করতে চাই। এই প্রসঙ্গে একজন নরওয়ের দার্শনিক Arne Naess 1970 সালে পরিবেশগত সংকটের কেন্দ্রে মানুষকে উপস্থাপন করার সময় প্রকৃতিতে মানুষের ভূমিকাকে বোঝার জন্য গভীর বাস্তুতন্ত্রের উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন।[20]

Arne Naess মনে করেন- এটি একটি আন্দোলন। একটি অগভীর বাস্তুতন্ত্র (shallow ecology) কিন্তু বর্তমানে খুবই শক্তিশালী একটি আন্দোলন। অন্যটি গভীর বাস্তুতন্ত্র (deep ecology) কিন্তু তুলনামূলক কম শক্তিশালী একটি আন্দোলন, যা আমাদের মনোযোগের দ্বারা শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে। এই দুই প্রকার আন্দোলনের বৈশিষ্ট্যকে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস করেছেন Arne Naess। গভীর বাস্তুতন্ত্রের কোনো সংজ্ঞা না দিয়ে তিনি গভীর বাস্তুতন্ত্রের সমর্থনে কতগুলি নীতির উল্লেখ করেন। এই

---

[19] চক্রবর্তী, নির্মাল্য নারায়ণ. (২০১৯). *পরিবেশ ও নীতিবিদ্যা.* কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ. পৃঃ ১৯.

[20] Naess, Arne. (1973). The Shallow and Deep, Long-Range Ecology Movement. A Summary. *Inquiry.* Vol-16. Pg- 95-100.

নীতিগুলি গভীর বাস্তুতন্ত্রের সমর্থকরা প্রায় সকলেই স্বীকার করে নিয়েছেন। অন্যভাবে বলতে গেলে, যদি এই নীতিগুলির কোনো একটিকে কেউ না স্বীকার করেন তবে তাকে গভীর বাস্তুতন্ত্রের সমর্থক বলে দাবি করা যাবে না। এই নীতিগুলো নিম্নরূপ- [21]

(১) পৃথিবীতে মানুষ ও মানুষ ছাড়া সকল জীবনের মঙ্গল এবং বিকাশের স্বতঃমূল্য আছে।

(২) প্রাণের যে প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্য জগতে দেখতে পাওয়া যায় তা স্বতঃমূল্যের উপলব্ধিতে অবদান রাখে। প্রাণের এই প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্য নিজেরাও স্বতঃমূল্যবান।

(৩) মানুষের অত্যাবশ্যকীয় চাহিদা মেটানো ছাড়া এই সমৃদ্ধি ও বৈচিত্র্যকে হ্রাস করার কোনো অধিকার মানুষের নেই।

(৪) মানবজীবন ও সংস্কৃতির বিকাশ মানুষের জনসংখ্যার উল্লেখযোগ্য হ্রাসের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অর্থাৎ মানুষ ছাড়া অন্যান্য মনুষ্যেতর জীবজন্তুর বিকাশের জন্য স্বল্প জনসংখ্যার প্রয়োজন।

(৫) বর্তমানে মানুষের অত্যাধিক হস্তক্ষেপের ফলে মানুষ ছাড়া অন্যান্য মনুষ্যেতর জীবজন্তু তথা প্রাণীর অবস্থা আরও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

(৬) সুতরাং, মানুষকে তার নীতির পরিবর্তন করতে হবে। এই নীতিগুলি মৌলিক, অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিগত, আদর্শগত কাঠামোকে প্রভাবিত করে, ফলে পরিস্থিতি বর্তমানের থেকে গভীরভাবে ভিন্ন হবে।

[21] Ibid. Pg- 95-100.

(৭) মতাদর্শগত পরিবর্তন হল, জীবনযাত্রার ক্রমবর্ধমান উচ্চমান মেনে চলার পরিবর্তে জীবনযাত্রায় গুণমানের বিষয়টিকে লক্ষ্য রাখা। বড়ো হওয়ায় অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও মহান হওয়ার মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে মানুষকে সচেতন হতে হবে।

(৮) যারা পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তগুলির সঙ্গে সহমত পোষণ করবেন, তারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রাসঙ্গিক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবেন। নিম্নে এই সিদ্ধান্তগুলি সম্পর্কে বিশদে আলোচনা করা হল।

৩.৪ গভীর বাস্তুতন্ত্রের নীতিসমূহ

পৃথিবীতে মানুষ ও মানুষ ছাড়া সকল জীবের মঙ্গল ও বিকাশের স্বতঃমূল্য আছে। এই মতটি সামগ্রিকভাবে জীবজগত বা বস্তুজগতের ক্ষেত্রে বলা যায়। একে অনেক সময় বাস্তুতান্ত্রিকতা নামেও অভিহিত করা যেতে পারে। এর মধ্যে সকল ব্যক্তি, প্রজাতি, জনসংখ্যা, বাসস্থান, মানুষ ও মনুষ্যেতর প্রাণীর সংস্কৃতি প্রভৃতি সবকিছুই পড়ে। বাস্তুতন্ত্রের সকল উপাদানের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক আছে। এর ফলে আমরা বলতে পারি, এই সকল উপাদানের প্রতি আমাদের সকলের শ্রদ্ধা থাকা উচিৎ এবং প্রকৃতির সকল উপাদানের ভালো থাকাকে নিশ্চিত করা আমাদের কর্তব্য। প্রাকৃতিক বিষয়গুলির মধ্যেও এমন এক স্বতঃমূল্য আছে যা আমাদের জ্ঞান, ইচ্ছা, অভিপ্রায় থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে রয়েছে। তাই পৃথিবীতে মানুষের যেমন স্বতঃমূল্য আছে তেমন মানুষ ছাড়া অন্যান্য প্রাণী এমনকি আপাতদৃষ্টিতে জড়বস্তুরও স্বতঃমূল্য আছে। এগুলির উপযোগিতা মানুষের কাছে একরকমের হলেও তার দ্বারা স্বতঃমূল্য বিচার্য নয়।

প্রাণের যে প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্য জগতে দেখতে পাওয়া যায়, তা এই স্বতঃমূল্যের উপলব্ধিতে অবদান রাখে। দ্বিতীয় নীতি থেকে একথা স্পষ্ট হয় যে, উদ্ভিদকূল ও প্রাণীজগৎ উভয়ই জীব-বৈচিত্র্য রক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উদ্ভিদ, পশুপাখি প্রভৃতি প্রকৃতির প্রত্যেকটি উপাদানের স্বতঃমূল্য আছে এবং এদের উচ্চবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষরা বিবর্তনের পথে শুধুমাত্র একটি ধাপ বলে মনে করলে তা সঠিক হবে না। বিবর্তনের পথে প্রাণের অস্তিত্বের অর্থই হল তার প্রকাশের বিভিন্নতা, যেমন- দুজন মানুষের মধ্যেই জীবনের কল্পনা করা যেতে পারে। একজন শহরে বসবাসকারী মানুষ এবং অন্যজন গ্রামে বসবাসকারী মানুষ। এদের দুজনের মধ্যে জীবনযাত্রার পার্থক্য থাকলেও, গ্রামে বসবাসকারী মানুষের জীবনের মধ্যে শহরে বসবাসকারী মানুষের চেয়ে যে অধিক বৈচিত্র্য আছে একথা মেনে নিতে হয়। যদিও এখানে বৈচিত্র্য বলতে বিভিন্ন গুণের প্রকাশকেই বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ প্রকৃতির মধ্যে প্রাণের বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্য যে দেখতে পাওয়া যায় তা এই স্বতঃমূল্যের প্রকাশকে আরও কার্যকরী করে তোলে। প্রাণের এই প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্য তাই নিজেরাও স্বতঃমূল্যবান।

মানুষের অত্যাবশ্যকীয় চাহিদা মেটানো ছাড়া এই বৈচিত্র্যকে ও সমৃদ্ধিকে হ্রাস করার কোন অধিকার মানুষের নেই।- প্রাণের এই প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্য জীবনের নতুন সম্ভবনাকে, সমৃদ্ধিকে, তথাকথিত জীবন সংগ্রামকে এবং পারস্পরিক সহাবস্থানের চিন্তাধারাকে আরও উদ্ভাসিত করে তোলে, এটি জীবনযাত্রার নতুন দিকের উন্মোচন করে। হত্যা, শোষণ, যোগ্যতমের উদ্বর্তন (survival of the fittest) প্রভৃতির পরিবর্তে বাঁচো এবং বাঁচতে দাও (live and let-live) বাস্তুতন্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। এখানে মানুষের কখনই নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করার

জন্য এই প্রাণের প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্যকে হ্রাস করার কোনো অধিকার নেই, কেবলমাত্র অত্যাবশ্যকীয় চাহিদা মেটানো ছাড়া। এখন প্রশ্ন হল, কোনটি অত্যাবশ্যকীয় চাহিদা ও কোনটি নয় তার একটি সর্বজন-স্বীকৃত সংজ্ঞা পাওয়া কঠিন। প্রাকৃতিক উপাদানের পরিবর্তন, সামাজিক স্তর বিন্যাসের পরিবর্তন প্রভৃতিকে এর মধ্যে রাখা যেতে পারে।

মানবজীবন ও সংস্কৃতির বিকাশ মানুষের জনসংখ্যার উল্লেখযোগ্য হ্রাসের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।- একথা অস্বীকার করা যায় না যে উন্নত ধনী দেশগুলি খুব সহজে প্রকৃতির অন্যান্য উপাদানের উপর তাদের কর্তৃত্ব হ্রাস করবে না। মানুষের জনসংখ্যা কমতে এবং স্থিতিশীল পর্যায়ে গিয়ে এমন অবস্থায় পৌঁছাতে হয়তো আরও কয়েকশো বছর সময় লেগে যাবে, যে অবস্থায় মানুষের অত্যাবশ্যকীয় চাহিদা মেটাতে প্রকৃতির উপর অত্যাধিক চাপ সৃষ্টি হবে না। কিন্তু এই সমস্ত কিছুই নির্ভর করছে আজকে মানুষের নেওয়া কিছু সিদ্ধান্তের উপর। পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য মানুষ যে ছোটো ছোটো পদক্ষেপগুলি নিচ্ছে, তাতে সন্তুষ্ট হয়ে থেমে গেলে হবেনা। কারণ বাস্তুতন্ত্রে সংকট প্রতিনিয়ত জটিল আকার ধারণ করেছে। তাই পরিবেশ রক্ষায় কিছু কঠিন সিদ্ধান্ত আমাদের নেওয়া প্রয়োজন। যদি তা না হয় তবে বহু প্রজাতি অচিরে বিলুপ্ত হবে। তাই মানুষের নিজের এবং অন্যান্য প্রকৃতির উপাদানের স্থিতিশীল বিকাশের জন্য স্বল্প জনসংখ্যাকে গুরুত্ব দিতে হবে। মানুষ যদি নিজেরা প্রচেষ্টা করে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত, নীতিপ্রকৃতির দ্বারা যদি জনসংখ্যা হ্রাস না করে তবে মনুষ্যেতর প্রাণী, প্রকৃতি এবং অবশেষে বাস্তুতন্ত্রের প্রত্যেকটি উপাদানের উপর ঘোরতর সংকট ঘনিয়ে আসবে।

বর্তমানে মানুষের অধিক হস্তক্ষেপে মানুষ ছাড়া অন্যান্য মনুষ্যেতর জীবজন্তু ও প্রাণীর অবস্থা আরও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ইতিহাস আমাদের দেখিয়েছে মানুষ যুগ যুগ ধরে

নানাভাবে এই পৃথিবীতে পরিবর্তন এনেছে এবং ভবিষ্যতেও এই পরিবর্তন মানুষের কাছ থেকে কাম্য। মানুষ স্বাভাবিকভাবেই বিচার বুদ্ধিসম্পন্ন হওয়ায় বাস্তুতন্ত্রের মধ্যে পরিবর্তন আনবে- এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এই পরিবর্তনের বা হস্তক্ষেপের প্রকৃত রূপ ও বিস্তৃতি কতটা হবে তা আমাদের বিচার করতে হবে। হিসাব করে দেখা গেছে যে, ধনী দেশগুলিতে প্রতি ব্যক্তি সাপেক্ষে অরণ্য ও বাস্তুতন্ত্রের অন্যান্য উপাদানের ধ্বংসের পরিমাণ খুবই ভয়াবহ। অনুন্নত দেশগুলিও আজকাল ধনী দেশগুলিকে অনুকরণ করতে শুরু করেছে। আমাদের সকলের ভাবনায় আনা দরকার যাতে করে অরণ্যকে রক্ষা করা যায় ও তার বিস্তৃতিতে সহযোগিতা করা যায়, যাতে প্রাণের প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্য আরও ত্বরান্তরিত হতে পারে। এখানে বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণী বিবর্তিত হওয়ার সুযোগ পায়। একথা ঠিক মানুষ অনেক অভয়ারণ্যের সৃষ্টি করেছে সেগুলি যথেষ্ট বৃহৎ নয় বিভিন্ন উদ্ভিদকূল ও জীবকূলের পরিবর্তনের জন্য।

মানুষের তার নীতির পরিবর্তন করা প্রয়োজন। বাস্তুতন্ত্রের তত্ত্বে একটি নীতি প্রণয়ন করা আবশ্যক। বর্তমানে শিল্পে উন্নত দেশগুলি যেভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে বিবেচনা করছে এবং সেই প্রেক্ষিতে প্রকৃতিকে ব্যবহার করছে, তার সঙ্গে উপরের কোনো বক্তব্যই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় বলে মনে হয়। তাই আধুনিক তথাকথিত উন্নত দেশগুলি নিজেদের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে যে নীতিগুলি প্রণয়ন করেছে, তার সঙ্গে পরিবেশ সংরক্ষণের তেমন একটা যোগাযোগ নেই। বর্তমানের জীবন হল উপভোগের জীবন। প্রকৃতির এমন অনেক উপাদানকে মানুষ প্রতিনিয়ত উপভোগ করে চলেছে যেগুলি মানুষ নিজেও জানে এই উপাদানগুলি প্রকৃতিতে খুব কম পরিমাণে আছে। যত বেশি ভোগ তত বেশি প্রকৃতিতে বর্জ্যপদার্থ নির্গত হয়। তাই আমাদের

নিজেদের ভোগকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। মানুষকে এমন নীতি প্রণয়ন করতে হবে যেখানে আত্মনিয়ন্ত্রণ, স্বয়ংসম্পূর্ণতা, সহাবস্থানে প্রকৃতি প্রকাশিত হয়। অনুন্নত দেশগুলি এখনো পরিবেশ সংকট তথা গভীর বাস্তুতান্ত্রিক সমস্যাগুলিকে উপলব্ধি করে, সেই অনুসারে নীতি গ্রহণ করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে না। তাই তথাকথিত উন্নত দেশগুলিতে কঠিন বাস্তুতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত কখনই বাস্তবায়িত হয়না। তাই বেসরকারি আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির পক্ষ থেকে সারা বিশ্বে বাস্তুতন্ত্রের স্বার্থে মানুষকে শিক্ষাদানে উদ্যোগী হতে হবে। প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রেও মানুষকে প্রকৃতির জন্য কম ক্ষতিকারক ও বিকল্প পদ্ধতির কথা ভাবতে হবে।

মতাদর্শগত পরিবর্তন হল জীবনযাত্রার ক্রমবর্ধমান উচ্চমান মেনে চলার পরিবর্তে জীবনযাত্রায় গুণমানের বিষয়টিকে লক্ষ্য রাখা। স্থানীয় স্বায়ত্ত্বশাসন ও বিকেন্দ্রীকরণ গভীর বাস্তুতন্ত্রকে রক্ষার একটি অন্যতম পথ। মানুষকে কেবলমাত্র নিজের জীবনযাত্রার মানকে উন্নত করার দিকে মনোযোগ দিলে চলবে না। ‘জীবনযাত্রার মান’ এই কথাটির কোনো সর্বজনস্বীকৃত অর্থ আমরা পাই না। একটু ভাবলে বোঝা যায় যে, জীবনযাত্রার মানের কোনো পরিমাপ সম্ভব নয়। আমাদের মানসিক স্বয়ংসম্পূর্ণতাকে শক্তিশালী করার যে প্রয়াস তার সঙ্গে তথাকথিত ‘জীবনযাত্রার মান’-এর তেমন একটা সম্পর্ক নেই। শুধুমাত্র পরিমাণগত দিক থেকে জীবনযাত্রার মানের বৃদ্ধি ঘটালে চলবে না। গুণগত দিক থেকে উন্নত জীবন যাত্রার মানের প্রতি আগ্রহ মানুষের মধ্যে জাগ্রত করতে হবে। মানুষ যেদিন অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির থেকে মহৎ মানুষ হওয়া, প্রকৃতির সকল উপাদানকে গুরুত্ব দেওয়া প্রভৃতিকে

মূল্য দেবে তখনই পরিবেশগত সংকট দূর করে গভীর বাস্তুতন্ত্রের নীতিকে বাস্তবায়িত করা যাবে।

গভীর বাস্তুতন্ত্রের নীতিকে যাঁরা সমর্থন করবেন তাঁরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রাসঙ্গিক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবেন। আমাদের মনে রাখতে হবে, গভীর বাস্তুতান্ত্রিক আন্দোলনের নিয়ম এবং প্রবণতা কোনো বাস্তুতন্ত্রের থেকে প্রাপ্ত আরোহ যুক্তির দ্বারা নির্গত নয়। পরিবেশগত জ্ঞান এবং বাস্তুতন্ত্রের ক্ষেত্রে যাঁরা কাজ করছেন সেই পরিবেশবিদগণের দীর্ঘদিনের সাধনার ফলশ্রুতি হল গভীর বাস্তুতন্ত্রের এই নীতিগুলি। অনেকক্ষেত্রেই মনে হতে পারে এই নীতিগুলি অস্পষ্ট ও সাধারণীকরণের মাধ্যমে প্রাপ্ত। কিন্তু সমস্ত পৃথিবী গভীর বাস্তুতন্ত্রের থেকে অনুপ্রেরণা গ্রহণ করে পরিবেশ সংরক্ষণকে ত্বরান্বিত করতে চাইছে। তাই পরিবেশ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে কোন্ কাজটি প্রথমে করণীয় এবং কোন্ নীতিটি পরে প্রণয়ন করা আবশ্যক তা নিয়ে মত পার্থক্য থাকলেও একথা স্পষ্ট গভীর বাস্তুতন্ত্রের নীতিগুলি প্রত্যেকটি পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। পরিবেশগত সমস্যা মানুষের কাছে বহুদিন পূর্বেই ধরা দিয়েছে এবং এই নিয়ে আলোচনা প্রতিনিয়ত হচ্ছে। এটি খুবই প্রশংসনীয় যে গভীর বাস্তুতান্ত্রিকগণ স্পষ্টভাবে কিছু নীতি প্রণয়ন করেছেন। গভীর বাস্তুতন্ত্রের সমর্থকদের মত হল যারা এই নীতিগুলি সঠিকভাবে মেনে চলতে পারবে, তারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে স্থিতিশীল বাস্তুতন্ত্রের স্বার্থে সঠিক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবে।

গভীর বাস্তুতন্ত্র হল পরিবেশগত দর্শনের একটি সাম্প্রতিক শাখা। যা মানব জাতিকে পৃথিবীর পরিবেশের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে বিবেচনা করে, দর্শন মানুষ এবং মানুষ ছাড়া অন্যান্য সকল প্রাণের এমনকি বাস্তুতন্ত্র এবং প্রাকৃতিক

উপাদানকেও স্বতঃমূল্যবান বলে থাকে। এটি পরিবেশগত আন্দোলনের একটি ভিত্তি স্থাপন করে এবং পরিবেশগত নৈতিকতার একটি নতুন দিকের উন্মোচন করে। গভীর বাস্তুতন্ত্রের মূল বক্তব্য হল, সমগ্র প্রাণী জীবজগতের তথা সকল উপাদানের বেঁচে থাকার ও বিকাশলাভের সমান অধিকার রয়েছে। এখন প্রশ্ন হল গভীর বাস্তুতন্ত্রের অন্তর্গত 'গভীর' শব্দের প্রকৃত অর্থ কী? অন্যভাবে বললে 'গভীর' বাস্তুশাস্ত্র নিজেকে 'গভীর' হিসাবে বর্ণনা করে, কারণ এটি 'কেন' এবং 'কীভাবে' প্রভৃতি দার্শনিক প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করে এবং এইভাবে সংকীর্ণ গন্ডির মধ্যে না থেকে মানবজীবনকে এই বাস্তুতন্ত্রের অংশ হিসাবে উপস্থাপন করে। গভীর বাস্তুতন্ত্র আমরা যে বিশ্বে বাস করি তার একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসন্ধান করে।

৩.৫ গভীর ও অগভীর বাস্তুতন্ত্রের পার্থক্য

গভীর বাস্তুতন্ত্রের অন্তর্গত 'গভীর' শব্দের প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করতে গেলে আমাদের গভীর ও অগভীর বাস্তুতন্ত্রের পার্থক্য আলোচনা করতে হবে। গভীর বাস্তুতন্ত্রকে কোনো নির্দিষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক আদর্শের সঙ্গে তুলনা করা যায় না। জীবনের নানা দিক থেকে মানুষ গভীর বাস্তুতন্ত্রের ধারণার সঙ্গে সহমত পোষণ করেন। অন্যান্য সামাজিক আন্দোলনের মতো গভীর বাস্তুতন্ত্রের সমর্থকরাও বেশ কিছু বাণী প্রচার করেন, যা মানুষকে একত্রিত হতে সাহায্য করে। কোনো পরিবেশগত সংকট উপস্থিত হলে মানুষ যাতে স্বাভাবিক প্রতিবাদ জানায়- এমন শিক্ষা গভীর বাস্তুতন্ত্র আমাদের দিয়ে থাকে। আজ বহু গুণী ব্যক্তি এবং বিদ্বজ্জন এই গভীর বাস্তুতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পরিবেশ রক্ষায় নিজেদের নিয়োজিত করেছেন, তাই একে আমরা দর্শন না

বলে আন্দোলন বলে অভিহিত করেছি। গভীর বাস্তুতন্ত্র ও অগভীর বাস্তুতন্ত্রকে সঠিকভাবে বুঝতে গেলে উভয়ের পার্থক্যসূচক কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন।[22]

প্রথমত, অগভীর বাস্তুতন্ত্রের বক্তব্য হল আমরা পরিবেশ দূষণকে যেমন- বায়ুদূষণ, জলদূষণ প্রভৃতিকে প্রতিরোধ করার জন্য এই দূষণকে বৃহৎ এলাকা জুড়ে সমানভাবে বন্টন করতে পারি যাতে একটি বিশেষ স্থানে দূষণের প্রভাব প্রকটিত না হয়। এক্ষেত্রে বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করে দূষণ প্রতিরোধে ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। অগভীর বাস্তুতন্ত্র এমনও বলে, যে শিল্পগুলি অত্যধিক মাত্রায় দূষণ ছড়ায়, অনুন্নত দেশে যেখানে দূষণের পরিমাণ কম সেখানে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে। অন্যদিকে, গভীর বাস্তুতন্ত্রে দূষণকে সমগ্র জীবজগতের প্রেক্ষিত থেকে বিচার করা হয়। এক্ষেত্রে শুধুমাত্র মানুষের শরীর নয় সকল প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণীর তথা বাস্তুতন্ত্রের উপর দূষণের প্রভাব বিবেচনা করা হয়। গভীর বাস্তুতন্ত্র দূষণের মূল কারণগুলি খুঁজে বের করে তা দূর করার কথা বলে, যার দ্বারা আপাত দৃষ্টিতে দূষণ কম মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে দূষণ বাড়তেই থাকে।

দ্বিতীয়ত, অগভীর বাস্তুতন্ত্রে কেবল মানুষের প্রয়োজনেই সম্পদের বিষয়টি গুরুত্ব পায়। ধনী সমাজ যেমন মনে করে ভালো থাকাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে ভোগের নেশায় সারা পৃথিবী আজ নিজেদের নিয়োজিত করেছে। অগভীর বাস্তুতন্ত্রে বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদের প্রতিনিয়ত হ্রাস পাওয়া নিয়ে কোনো চিন্তা দেখা যায় না কারণ যে সম্পদ কমে যায়, তার মূল্য বেড়ে যায় এবং অল্পসংখ্যক মানুষই তা ব্যবহার করতে পারে। যেমন- কয়লা, খনিজ তেল প্রভৃতি। অগভীর বাস্তুতন্ত্র

[22] চক্রবর্তী, নির্মাল্য নারায়ণ. (২০১৯). *পরিবেশ ও নীতিবিদ্যা.* কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ. পৃঃ ২৫-২৯.

উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে সেই সম্পদ ফুরিয়ে গেলে তার বিকল্প আবিষ্কার করার কথা বলে। উদ্ভিদ, পশুপাখি, নৈস্বর্গিক বিষয়গুলিকে কেবল মানুষের প্রয়োজনেই মূল্যবান বলে মনে করে। গভীর বাস্তুতন্ত্রে সম্পদের কথা বলার সময় সকল প্রাণীর স্বতঃমূল্যকে স্বীকার করা হয়। সকল প্রাণীর স্বাভাবিক বাসস্থান এবং প্রাকৃতিক সম্পদের উপর সবার সমান অধিকারের কথা গভীর বাস্তুতন্ত্রে বলা হয়। যেকোনো প্রাকৃতিক বিষয় কেবল মানুষের উপভোগের নয়, এমন মত তারা প্রকাশ করে এবং বাস্তুতন্ত্রের পরিপ্রেক্ষিতে সম্পদকে বোঝার চেষ্টা করে। দেশ এবং কালের পরিপ্রেক্ষিত থেকে এক দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থা গ্রহণের কথা গভীর বাস্তুতন্ত্রে বলা হয়।

তৃতীয়ত, অগভীর বাস্তুতন্ত্র জন-বিস্ফোরণকে উন্নয়নশীল দেশের সমস্যা বলে মনে করে। নিজের দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে বিভিন্ন অর্থনৈতিক কারণ বা সাময়িক যুক্তি দেখিয়ে মানুষ সমর্থন করে। এরফলে বিভিন্ন প্রাণীর অত্যধিক জনসংখ্যার কারণে বেঁচে থাকা দুর্বিসহ হয়ে ওঠে। বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে যে সামাজিক সম্পর্ক আছে তাকেও অগভীর বাস্তুতন্ত্র অস্বীকার করে কিন্তু গভীর বাস্তুতন্ত্রে জনসংখ্যার বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণের কথা বলা হয়েছে। মানুষের জনসংখ্যা বৃদ্ধি যে অন্যান্য প্রাণী তথা বাস্তুতন্ত্রের বিভিন্ন উপাদানের জন্য ধ্বংসকে আহ্বান করছে সেকথা গভীর বাস্তুতান্ত্রিকগণ প্রতিনিয়ত বলে থাকেন।

চতুর্থত, অগভীর বাস্তুতন্ত্রে মনে করা হয় যে, উন্নয়নশীল দেশগুলির লক্ষ্য পাশ্চাত্যের দেশগুলির মতো শিল্পে উন্নত হওয়া। কিন্তু পাশ্চাত্যে প্রযুক্তিবিদ্যা উন্নতির সঙ্গে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এবং অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশের পাশ্চাত্য চিন্তার প্রেক্ষিতে সদর্থক সমাজ ভাবনার মধ্যে কোনো বিরোধ নেই বলে মনে করা হয়। গভীর বাস্তুতন্ত্র

শিল্পে অনুন্নত তথাকথিত অনুন্নত দেশগুলিকে অর্থনৈতিকভাবে উন্নত দেশের আগ্রাসন থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করে চলে। উন্নত দেশগুলির যে জীবনশৈলী তাকে অনুসরণ করলে তথাকথিত অনুন্নত (শিল্পে অনুন্নত) দেশগুলির সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য তথা বাস্তুতান্ত্রিক জীববৈচিত্র্য যে বিঘ্নিত হবে- একথা স্বীকার করতেই হবে। শিল্পে উন্নত দেশগুলির মধ্যেও বিভিন্ন মানবগোষ্ঠী আছে, তাদের কথা ভেবে বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণ করা প্রয়োজন। উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যা যখন মানুষের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়, তখন মানুষকে নিজের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য রক্ষায় উপযুক্ত পদক্ষেপের কথা গভীর বাস্তুতান্ত্রিকগণ বলে থাকেন।

পঞ্চমত, অগভীর বাস্তুতন্ত্রে ভূমি বৈচিত্র্য, বাস্তুতন্ত্র, নদী এবং প্রাকৃতিক সকল উপাদানকে খন্ড খন্ড হিসাবে দেখা হয়। এদের সামগ্রিক রূপ অগভীর বাস্তুতন্ত্রকে স্বীকার করে না, এদের খন্ড খন্ড অংশকে বিভিন্ন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা রাষ্ট্রের সম্পত্তিরূপে দেখা হয়। সংরক্ষণের কথা যখন অগভীর বাস্তুতন্ত্রে ভাবা হয়, তখন তা মানুষের উপযোগিতার ভিত্তিতেই ভাবা হয়। বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে মানুষের যে ক্ষতি হবে তাকে বিবেচনা করেই এইসব বিপর্যয় মোকাবিলায় স্বল্প মেয়াদী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় অর্থাৎ মানুষের প্রয়োজনে প্রকৃতিকে রক্ষা করার কথা বলে অগভীর বাস্তুতন্ত্র। অন্যদিকে গভীর বাস্তুতন্ত্রে মনে করা হয় এই পৃথিবী তথা প্রাকৃতিক সম্পদ কেবল মানুষের ভোগের জন্য নয়। নদী, সমুদ্র, পাহাড় প্রভৃতি কখনোই দেশের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হতে পারে না। বাস্তুতন্ত্রের অন্যান্য উপাদানের মতো মানুষ হল একটি উপাদান এবং নিজের জীবনরক্ষার জন্য মানুষ কেবল প্রকৃতির কিছু সম্পদের ব্যবহার করতে পারে মাত্র কিন্তু মানুষের অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজন ছাড়া অনাবশ্যক প্রয়োজন মেটাতে

যদি প্রকৃতিকে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করা হয় তবে অন্যান্য প্রাণীর প্রকৃতি থেকে অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজন মেটানো অসম্ভব হয়ে পড়বে। গভীর বাস্তুতন্ত্র আরও বলে উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যা কখনই বাস্তুতন্ত্রের ধ্বংসকে রোধ করতে পারবে না, তার জন্য প্রয়োজন মানসিকতার পরিবর্তন।

ষষ্ঠত, অগভীর বাস্তুতন্ত্রে মনে করা হয় পরিবেশগত সংকট এবং অপ্রতুল সম্পদের ক্রমাগত হ্রাস পাওয়ার সমস্যার সমাধানের জন্য বিশেষজ্ঞের দ্বারা কমিটি গঠন করা প্রয়োজন, যারা অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সুস্থ সহাবস্থানময় পরিবেশের মধ্যে ভারসাম্য আনতে সক্ষম হবে। আমাদের এইসময় প্রয়োজন হল উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যা যা এই ভারসাম্যকে রক্ষা করতে কার্যকরী ভূমিকা নেবে। বৈজ্ঞানিক আলোচনায় কঠিন বিজ্ঞানগুলিকে প্রাধান্য দিয়ে তার সাহায্যে এমনভাবে মানুষ প্রকৃতি থেকে নিজের প্রয়োজন মেটাবে যাতে প্রকৃতির অন্যান্য উপাদানের কোনো ক্ষতি না হয়- এমন কথা অগভীর বাস্তুতান্ত্রিকরা মনে করেন। কিন্তু গভীর বাস্তুতন্ত্রের মতে আমরা যদি সুস্থ বাস্তুতান্ত্রিক নীতি প্রচলন করতে পারি তবে প্রকৃত পরিবেশ সংরক্ষণ সম্ভব হবে। প্রকৃত শিক্ষাব্যবস্থা তাই যা অর্থনৈতিক মূল্যের ঊর্ধ্বে উঠে উপভোগ্য বিষয় থেকে মানুষের দৃষ্টিকে দূরে সরাতে সক্ষম হবে।

৩.৬ গভীর বাস্তুতন্ত্রের সমালোচনা

গভীর বাস্তুতন্ত্র সম্বন্ধে যে আলোচনা করা হয়েছে তা থেকে এটা স্পষ্ট যে, প্রচলিত পরিবেশ নীতিশাস্ত্রে মানুষের মঙ্গলকে বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, গভীর বাস্তুতন্ত্র তার ঘোরতর বিরোধী। প্রকৃতি সম্বন্ধে মানুষের ধারণাকে দার্শনিক দিক থেকে

সম্পূর্ণ গভীরভাবে বোঝার চেষ্টা করে গভীর বাস্তুতন্ত্র। মানুষের সকল প্রকার উদ্ভিদকে ধ্বংস করার যে প্রচেষ্টা তার সম্পূর্ণ বিরোধিতা এখানে দেখতে পাওয়া যায়। তথাপি গভীর বাস্তুতন্ত্রের বিরুদ্ধে সমালোচকরা আপত্তি উত্থাপন করেছেন। নিম্নে সেগুলি বর্ণনা করা হলো:

প্রথমত, গভীর বাস্তুতন্ত্রে মানবকেন্দ্রিকতা থেকে জীবকেন্দ্রিকতার উদ্দেশ্যে যাত্রা দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই বক্তব্য থেকে এমন সিদ্ধান্ত কখনোই করা যায় না যে, মানুষের প্রয়োজন ব্যাতিরেকে জীবসংরক্ষণকেই কেবল গুরুত্ব দিতে হবে।

দ্বিতীয়ত, বর্তমান বিশ্বে যে গভীর বাস্তুতন্ত্র প্রচলিত তা আমেরিকান পরিবেশবিদ Arne Neass কর্তৃক আলোচিত হয়েছে। কিন্তু ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ইতিহাস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ভিন্ন, তাই ভারতবর্ষের প্রেক্ষিতে গভীর বাস্তুতান্ত্রিক চিন্তা কতটা কার্যকরী- সে প্রশ্ন থেকেই যায়। এরূপ আপত্তি গভীর বাস্তুতন্ত্র সম্বন্ধে অনেকেই উত্থাপন করেছেন।[23]

তৃতীয়ত, মানুষ প্রকৃতিতে হস্তক্ষেপ করবে না এবং অরণ্যের উপর অত্যধিক গুরুত্ব দেবে প্রভৃতি গভীর বাস্তুতান্ত্রিক চিন্তার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যদি কোথাও মানুষের প্রভাবে অরণ্যের ক্ষতি হয়, তবে তাকে পুনরায় সংরক্ষণ করে স্বরূপে ফিরিয়ে দেওয়াকে এখানে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তা করতে গিয়ে গভীর বাস্তুতন্ত্র পরিবেশের অন্যান্য দিককে গুরুত্ব দেয়নি। আবার অনেকক্ষেত্রেই অরণ্য সংরক্ষণকারী বা বন্যপশু সংরক্ষণকারী বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য বহু মানুষকে তাদের বাসভূমি থেকে উৎখাত করা হয়ে থাকে- যা কখনোই নৈতিক দিক থেকে সমর্থনযোগ্য নয়।

---

[23] Guha, Ramchandra. (1989). Radical American Environmentalism and Wilderness Preservation: A third World Critic. *Environmental Ethics.* Vol- 11. No-1. Pg: 71-93.

চতুর্থত, অনেক গভীর বাস্তুতান্ত্রিক চিন্তাবিদ এমন মনে করেন যেহেতু মানুষের দ্বারা প্রকৃতি ক্ষতিগ্রস্ত হয় সেহেতু মানুষের সংখ্যা কমিয়ে ফেলতে হবে অথবা পৃথিবীর এক বিরাট অংশের মানুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ করতে হবে।[24] এমনভাবেই বাস্তুতন্ত্রের সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে বলে এইসব সমালোচকরা মনে করে থাকেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এমনভাবে গভীর বাস্তুতান্ত্রিক চিন্তার সাফল্য নৈতিক এবং সামাজিক দিক থেকে সমর্থনযোগ্য নয়।

পঞ্চমত, অনেকে মনে করেন প্রকৃতপক্ষে যারা পরিবেশের সংরক্ষণের পক্ষপাতী তারা অধিকাংশই উচ্চবিত্ত ধনী সম্প্রদায়। যেমন- আন্তর্জাতিক বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ এবং আন্তর্জাতিক স্তরে কিছু পরিবেশ সংরক্ষণবাদীরা পাশ্চাত্যের অরণ্য সংরক্ষণের ধারণাটিকে ভারতে বা উন্নয়নশীল অনেক দেশে প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছেন। এই সংরক্ষণ করতে গিয়ে স্থানীয় মানুষজনের স্বার্থের কথা ভাবা হয়নি। অনেক অভয়ারণ্য ধনী পর্যটকদের বিনোদনের ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। তাছাড়া শিকারীদের দল নিজেদের স্বার্থে বন্যপ্রাণী বা অরণ্য সংরক্ষণের কথা বলেন বলে অনেকে মত প্রকাশ করেছেন।[25]

গভীর বাস্তুতান্ত্রিক চিন্তায় দেখানো হয়েছে যে পাশ্চাত্যে পরিবেশ সংরক্ষণের ধারণাটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মানবকেন্দ্রিক। এখানে বলা হয়েছে নৈতিক আলোচনার কেন্দ্রে মানুষ আছে এবং তাকে কেন্দ্র করেই পরিবেশ সংরক্ষণের চিন্তা আবর্তিত হয়, যদিও এই মতে বেশ কিছু ব্যতিক্রম পাশ্চাত্য চিন্তাবিদগণের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যেহেতু পাশ্চাত্যে পরিবেশকেন্দ্রিক চিন্তা মানবকেন্দ্রিকতাকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে, তাই সেখানে গভীর বাস্তুতন্ত্রের তুলনায় অগভীর বাস্তুতন্ত্রের

---

[24] চক্রবর্তী, নির্মাল্য নারায়ণ. (২০১৯). *পরিবেশ ও নীতিবিদ্যা.* কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ. পৃঃ ৩০-৩৪.

[25] চক্রবর্তী, নির্মাল্য নারায়ণ. (২০১৯). *পরিবেশ ও নীতিবিদ্যা.* কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ. পৃঃ ২৮-৩৫.

গুরুত্ব অনেক বেশি। বরং গভীর বাস্তুতন্ত্রের বক্তব্য অনুসারে প্রাচ্য দর্শন ও ধর্মে তার সাযুজ্য দেখতে পাওয়া যায়। প্রাচীন বৈদিক চিন্তা, বৌদ্ধ ধর্ম প্রভৃতিতে গভীর বাস্তুতান্ত্রিক চিন্তার প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই। পরবর্তী অধ্যায়ে পরিবেশ সম্পর্কে বৌদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখবো সেখানেও এই গভীর বাস্তুতান্ত্রিক চিন্তার প্রতিফলন বিদ্যমান।

চতুর্থ অধ্যায়

পরিবেশ সম্পর্কে বৌদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি

বৌদ্ধধর্মের সাথে পরিবেশের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তির ভিত্তি হল প্রকৃতি ও পরিবেশ। গৌতম বুদ্ধের জন্ম রাজপ্রাসাদে নয়, লুম্বিনী বনের শালবৃক্ষের নীচে। জন্মগ্রহণ করেই তিনি প্রকৃতিকে আলিঙ্গন করেছেন। শুধু তাই নয় শৈশবে, কৈশোরে তাঁকে দেখা গেছে প্রকৃতির সঙ্গে মিশতে এবং প্রকৃতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে। এমনকি রাজপুত্র হয়েও প্রকৃতি ও পরিবেশের সাথে ছিল তাঁর গভীর বন্ধুত্ব। অনেক সময় রাজপ্রাসাদের নানা অনুষ্ঠানে তাঁকে দেখা যায়নি। তাঁকে দেখা গেছে তখন রাজ উদ্যানে কোন গাছের নীচে কিংবা হ্রদের পাশে বসে একান্ত মনে ধ্যান করতে। গৃহত্যাগের পরও তিনি দুঃখ মুক্তির সন্ধান করে যাচ্ছেন কোনো না কোনো বৃক্ষের নিচে। এভাবে গৌতম বুদ্ধ পরিবেশ ও প্রকৃতিকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। প্রকৃতির সাথে নিজেকে একাত্ম করে নিয়েছেন। তাই তাঁর ধর্ম প্রচারের প্রথম থেকেই প্রকৃতি ও পরিবেশের বহু উপাদানের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। যেমন- তিনি বলেছেন, কোন গাছের শিকড় যদি ভেঙ্গে যায় তার শিকড় থেকে আবার গাছ বেড়ে উঠে। ঠিক তেমনই মানুষের লোভ যদি ধ্বংস করতে না পারা যায় তাহলে বিভিন্ন সময়ে লোভ নামক শত্রুটি বেড়ে উঠে। এতে মানুষের অনেক ক্ষতি হবার আশঙ্কা থাকে। ঘাস ও আগাছার কারণে যেমন জমি অনুর্বর হয়, তেমনি মানুষের অন্তর কলুষিত হয় রাগ, লোভ ও হিংসার কারণে।

পরিবেশ-প্রকৃতিতে বুদ্ধ শুধু গাছ-পাতা-লতা ইত্যাদির কথা বলেননি। প্রকৃতি থেকে জন্ম নেয়া সকল প্রাণীর কথাও তিনি গভীর মমতা দিয়ে অনুভব করেছেন। তাঁর মতে, দীর্ঘ, বৃহৎ, মাঝারি, ছোট অথবা ক্ষুদ্র যেসব প্রাণী আছে অথবা যে সকল প্রাণী দেখা যায়, আর যে সকল প্রাণী দেখা যায় না; যারা দূরে বাস করে; যারা জন্মেছে বা জন্মাবে তারা সকলেরই সখের কামনা করা উচিত। এছাড়াও প্রকৃতির সকল উপাদানের রক্ষা করার প্রতি ছিল বুদ্ধের সচেতন দৃষ্টি। কারণ বুদ্ধ বুঝেছিলেন বৃক্ষ কেবল নিসর্গ প্রকৃতির শোভা নয়। তা মানুষের জীবনের অপরিহার্য অংশ। পশুপাখিরাও তাদের নিজস্ব পরিবেশে জন্ম নেয়।

মানব জীবনে প্রাকৃতিক পরিবেশ অতীব গুরুত্বপূর্ণ। পরিবেশ রক্ষায় বৃক্ষের ভূমিকা অসাধারণ। বৃক্ষহীন পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্বই কল্পনা করা যায় না। দেশের বনাঞ্চল প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আবহাওয়া ও জলবায়ু প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। তাই প্রাকৃতিক পরিবেশের বিপর্যয়ের হাত থেকে দেশকে তথা বিশ্বকে রক্ষা করতে জনগনকে সচেতন ও সম্পৃক্ত করতে হবে। দেশে ব্যাপক বৃক্ষরোপণ ও বনায়ন সৃষ্টি করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।[1]

বুদ্ধের সময়েও বৃক্ষরোপণের প্রবণতা ছিল। ধ্যানের জন্য নির্জন বন ও শান্ত পরিবেশ উত্তম। রাজা ও শ্রেষ্ঠীগণ নানা বিহার ও আবাস নির্মাণ তৈরি করেছিলেন ছায়া ঘেরা বন-বনাঞ্চলে। যেমন জেতবন বিহার, বিশাখারাম, আম্রকানন বিহার, বেণুবন

[1] ভদন্ত করুণা বংশ. (অনু.). (২০০৭). *বিনয় পিটকে পাচিত্তিয়.* বংলাদেশ: অনমদর্শী মহাস্থবির মহোদয়ের শিষ্যবৃন্দ (রাঙামাটি). পৃঃ ৯৬.

বিহার প্রভৃতি। এই সব বিহারের সাথে উদ্যান, পুকুর, পানীয় জলের কূপ থাকত। সেই সাথে পুরো বিহার এলাকায় থাকত নানা রকমের গাছপালা। প্রার্থনা কক্ষের সামনে থাকত নানা জাতের ফুলের বাগান। এছাড়া নানা রকম ঔষধি গাছের লতা-পাতা, গুল্ম, ফুল-ফলাদিও থাকত। কারণ তখন প্রকৃতিতে উৎপন্ন গাছ-পালা-লতা-পাতা-মূল ইত্যাদিই বিভিন্ন রোগের ঔষধরূপে ব্যবহৃত হতো।[2]

৪.১. বৌদ্ধমতে শীল

বৌদ্ধধর্মে শ্রমণগণকে যে দশশীল পালন করতে হয়, তার মধ্যে অন্যতম হল প্রাণাতিপাত-বিরতি। এই শীলের অনুসরণ বৌদ্ধভিক্ষু এবং গৃহস্থ উভয়কে করতে বলা হয়েছে। কায়িকভাবে প্রাণাতিপাত থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে এবং অন্যের দ্বারা এই প্রাণাতিপাত করা, অন্যকে তা করতে সাহায্য করা বা প্রাণাতিপাতকে অনুমোদন করা থেকেও বিরত থাকতে কঠোরভাবে বলা হয়েছে। তাই সুত্ত নিপাতে বলা আছে,

"পাণং ন হনে ন চ ঘাতযেয্য, ন চানুজঞঞা হনতং পরেসং;
সব্বেসু ভূতেসু নিধায দন্ডং, যে থাবরা যে চ তসা সন্তি লোকে।"[3]

পঞ্চশীলকে বুদ্ধদেব এভাবে বর্ণনা করেছেন-

(১) পানং ন হানে:- প্রাণীহত্যা করবে না, সব জীবের প্রতি হিংসা ত্যাগ করবে।

---

[2] ভদন্ত করুণা বংশ. (অনু.). (২০০৭). *বিনয় পিটকে পাচিত্তিয়.* বংলাদেশ: অনমদর্শী মহাস্থবির মহোদয়ের শিষ্যবৃন্দ (রাঙামাটি).পৃঃ ৯৭

[3] মহাস্থবির, সাধনানন্দ (সম্পা.). (১৯৮৭). *সুত্তনিপাত* (সূত্র পিটকের অন্তর্গত খুদ্দক নিকায়ের অংশ). বাংলাদেশ: শ্রীমৎ সাধনা মহাস্থবির (বন ভন্তে). পৃ- ১০৪.

(২) ন চাদিন্নমাদিয়ে:- তোমাকে যা দেওয়া হয়নি তা গ্রহণ করবে না। লোভবশত পরধন গ্রহণ (অর্থাৎ চুরি) করবে না- যা তোমার ন্যায্য প্রাপ্য নয় তা তোমার গ্রহণীয় নয়।

(৩) মুসা ন ভাসে:- মিথ্যা কথা বলবে না, কেননা মিথ্যা কথা বলার অর্থ হল অপরকে প্রবঞ্চনা করা।

(৪) ন চ মজ্জপো সিয়া:- চিত্তশুদ্ধি রক্ষার্থে মাদকদ্রব্য বা নেশাদ্রব্য গ্রহণ করবে না।

(৫) ব্রহ্মচারিয়ঞ্চ মঙ্গলমুত্তম্:- কামেচ্ছাকে দমন করতে হবে, কেননা তাতেই মঙ্গল। যেসব সংসারী মানুষ (শ্রাবক) আরও উচ্চ পর্যায়ে উন্নীত হতে চায় তাদের জন্য বুদ্ধদেব আরও তিনটি শীলের উল্লেখ করেছেন।

(৬) আত্মসংযম অভ্যাসের জন্য অসময়ে খাদ্য গ্রহণ করবে না।

(৭) উত্তেজক আনন্দ যথা নাচ, গান ইত্যাদি থেকে এবং বিলাসিতা থেকে, যথা- অঙ্গরাগ, স্বর্ণালঙ্কারসজ্জা ইত্যাদি থেকে বিরত থাকবে, কেননা সেসব মানুষকে স্বার্থপর করে মৈত্রী ও করুণাপথের অন্তরায় তৈরী হয়।

(৮) দুর্জনের সেবা না করে সজ্জনের সেবা করবে এবং পূজ্য ব্যক্তিদের পূজা করবে।

এই অষ্টশীল বুদ্ধমতে সংসারী মানুষমাত্রেরই পালনীয়। মঠবাসী সন্ন্যাসীদের জন্য বুদ্ধদেব অতিরিক্ত আরও দুটি কঠোর শীলের উল্লেখ করেছেন।

(৯) আরামপ্রদ নরম শয্যা পরিহার করে কঠিন কাষ্ঠাসনে শয়ন করতে হবে।

(১০) সাংসারিক ভোগবিলাস বর্জন করে দীন-দরিদ্রদ্রের সঙ্গে নিরাড়ম্বর জীবনযাপন করতে হবে।

বুদ্ধদেব প্রবর্তিত উপরোক্ত দশশীলের মধ্যে পাঁচটি নির্বিশেষ সব মানুষের নিত্য ও অবশ্য পালনীয়, যা 'পঞ্চশীল' নামে পরিচিত। পরবর্তী তিনটি শীল (৬-৮) তিথি বিশেষে উচ্চমার্গীর পালনীয়। আর মাঠবাসী সন্ন্যাসীর কাছে দশটি শীলই অবশ্য পালনীয়।[4]

দশশীল এবং বিশেষ করে পঞ্চশীল আপাতদৃষ্টিতে নেতিবাচক মনে হলেও আসলে সেসবই ইতিবাচক। কেননা সম্যক কর্মসাধনই সেসবের লক্ষ্য এবং সম্যক কর্ম না হলে নির্বাণলাভ সম্ভব হতে পারে না।

বৌদ্ধ-শ্রাবকেরা (গৃহী মুক্তিকামীরা) প্রত্যহ শীলগুলিকে, বিশেষত পঞ্চশীলগুলিকে এভাবে স্মরণ করেন-

অখন্ডানি:- আমার এই শীল অর্থাৎ সচ্চরিত্রসাধনপন্থা সখণ্ড নয় অখণ্ড - আমার এই শীল জ্ঞানত কোথাও খন্ডিত হয়নি।

আচ্ছিদানি:- আমার এই শীল বা সচ্চরিত্রসাধনের পথ নিশ্ছিদ্র, আমি যে শীলটি অনুসরণ করেছি তাতে কোনো ফাঁক বা ছিদ্র হয়নি, তা যথাযথভাবেই অনুসৃত হয়েছে।

অসবলানি:- সচ্চরিত্রসাধনের পথরূপে আমার এই শীল আমার প্রতি বলপূর্বক আরোপিত হয়নি, শীলটিকে রক্ষা করতে আমি কোনোভাবে বাধ্য হইনি। আমি নিজ ইচ্ছাতেই শীলটিকে অনুসরণ করেছি।

---

[4] বিদ্যারণ্য. (১৯৮৪). *বৌদ্ধ দর্শন ও ধর্ম.* কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ. পৃঃ- ৬৪-৬৮.

অকস্মাসানি:- শীলটিকে রক্ষা করতে আমি যে পথ অবলম্বন করেছি সেই পথে কোনো পাপ স্পর্শ করেনি।

ভুজিস্সানি:- আমার কোনো স্বার্থ সাধনের জন্য, ঋণ, মান ইত্যাদি লাভের জন্য- শীলটি আচরিত হয়নি, শুধু মঙ্গলের চিন্তায় শীলটি আচরিত হয়েছে।

বিঞ্ঞূপপসত্থানি:- আমার এই সচ্চরিত্রসাধন মার্গটি অর্থাৎ শীলটি বিজ্ঞজনের অনুমোদিত হওয়ায় মার্গ বা পথটি সৎ, অসৎ পথ নয়।

অপরামট্ঠানি:- আমার আচরিত শীলটি বিদলিত (দলন-মর্দন) হয়নি- অবিদলিত শীলই আচরিত হয়েছে।

সমাধিসংবত্তনিকানি:- আমার এই শীল মুক্তি পথ সমাধির সহায়ক অর্থাৎ মুক্তি প্রবর্তক।

শীল হল সচ্চরিত্র (দুঃশীল = অসচ্চরিত্র) বা সচ্চরিত্র গঠনের পথ বা মার্গ। চিত্ত কলুষমুক্ত না হলে সচ্চরিত্র গঠন সম্ভব হয় না এবং ফলত মুক্তিপথেও অগ্রসর হওয়া যায় না। মানুষের মনে অহরহ কলুষভাবের সঞ্চার হয়- চিত্তকে কলুষমুক্ত করার জন্যই শীল একান্তভাবে অনুসরণীয়। এজন্যই বৌদ্ধ শ্রাবকেরা প্রত্যহ শীলগুলিকে স্মরণপূর্বক রক্ষা করেন। বুদ্ধমতে, মানব জীবনের চরম লক্ষ্য হল, মৈত্রী ভাবনায়, প্রেম ভালবাসাকে প্রসারিত করে, নিজ চিত্তকে বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত করে মুক্তিকে আস্বাদন করা এবং তার জন্য প্রয়োজন শীলগুলিকে বিশেষ করে পঞ্চশীলকে যথাযথভাবে অনুশীলন করা। বুদ্ধদেব একদিকে যেমন (জীবনকে) উদ্দেশ্যকে খর্ব করেননি তেমনি তিনি পথকেও (বিশেষত পঞ্চশীলকেও) খুব নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন।[5]

[5] বিদ্যারণ্য. (১৯৮৪). *বৌদ্ধ দর্শন ও ধর্ম.* কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ. পৃঃ- ৬৪-৬৮.

৪.২. বৌদ্ধমতে অহিংসা

বৌদ্ধধর্ম অহিংসাবাদী। বুদ্ধ বিভিন্নশীলের উল্লেখ করেছেন। এই শীলগুলির মধ্যে শ্রমনগণকে দশটি শীল পালন করার কথা তিনি বলেন। এই দশটি শীল হল- (১) প্রাণাতিপাত-বিরতি, (২) অদত্তাদান-বিরতি, (৩) অব্রহ্মচর্য-বিরতি বা কামসমূহে মিথ্যাচার-বিরতি, (৪) মৃষাবাদ-বিরতি, (৫) সুরামৌরেয় মন্দ-মাদকার্থ-বিরতি, (৬) বিকালভোজন-বিরতি, (৭) নৃত্যগীতবাদিত্ব-বিরতি, (৮) মাল্য গংধ বিলেপন-বিরতি, (৯) উচ্চাসনশয়ন-বিরতি এবং (১০) জাতরূপরজাত পরিগ্রহ-বিরতি। এর মধ্যে গৃহস্থ উপাসক ও উপাসিকাগণ সাধনাগত প্রথম পাঁচটি শীল পালন করে। এগুলি পঞ্চশীল নামে খ্যাত। কিন্তু যারা বেশি শ্রদ্ধাশীল তারা প্রথম আটটি শীল পালন করে। যদি তারা চায় তবে দশটি শীলও পালন করতে পারে। গৃহস্থ ব্যক্তির পালিত পঞ্চশীল ও অষ্টশীলকেই বুদ্ধঘোষ গৃহস্থশীল বলেছেন।[6] পঞ্চশীল কুরুদেশে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। তাই একে 'কুরুধর্ম' বলা হয়ে থাকে। বিভিন্নপ্রকার শীলের 'বিরতি' উল্লেখ করা হয়েছে। 'বিরতি' বলতে বোঝানো হয়েছে নিজে সেই আচরণ করা যাবেনা, অপরের দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সেই আচরণ করানোও যাবেনা। অন্যভাবে বললে বলা যায় করণ, কারণ অনুমোদন- এই তিনটির থেকে বিরতির কথা বলা হয়েছে। তাই বুদ্ধ বলেছেন প্রাণীকে হত্যা কোরো না, অপরের দ্বারা হত্যা করিও না, অপর ব্যক্তি দ্বারা হত্যার অনুমোদন কোরো না। স্থাবর ও জঙ্গম নির্বিশেষে সকল প্রাণীর প্রতি দম্ভ ও হিংসা পরিত্যাগ করার কথা বলা হয়েছে। বৌদ্ধ দর্শনে উল্লিখিত প্রাণাতিপাত বিরতির অপর নাম অহিংসা। অহিংসা, গৃহস্থ, সন্ন্যাসী প্রভৃতি সকলের পালনীয় প্রাণাতিপাত, যা

[6] বিদ্যারণ্য. (১৯৮৪). *বৌদ্ধ দর্শন ও ধর্ম.* কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ. পৃঃ- ৬৪-৬৮.

কেবল নিজে করবে না এমন নয় অন্যকে দিয়েও করানো যাবে না, এই কাজে কাউকে সাহায্য করা যাবে না এবং কোনোভাবে প্রাণাতিপাতকে অনুমোদন করা যাবে না। সবল ও দুর্বল নির্বিশেষে সকল প্রাণীর প্রতি হিংসা থেকে বিরত হতে হবে।

কেবল প্রাণবধ করাই যে হিংসা মনে করা হত তা নয়, দন্ড কিংবা অস্ত্র দ্বারা আঘাত করাও হিংসা বলে মনে করা হত। কোনো ব্যক্তিকে কর্কশ বাক্য বলা, অন্য কারো অনিষ্ট চিন্তা করাও হিংসা। তাই অহিংসা শব্দটা বৌদ্ধ দর্শনে যথার্থ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যে শরীর বাক্য কিংবা মন দ্বারা হিংসা করেনা, যে কোনো প্রাণীকে কিঞ্চিতমাত্র পীড়া দেয় না সেই অহিংস হয়।

৪.৩. উদ্ভিদাদির প্রতি অহিংসা

উদ্ভিদ লতাদি বৃক্ষ এবং তাদের বীজ নাশ করাও হিংসা মনে করা হত। ক্ষুদ্র বৃক্ষ, গুল্ম ইত্যাদির ক্ষতি করলে, ক্ষুদ্র প্রাণীকে বধ করলে কিংবা তাদের পীড়া দিলেও হিংসা হয়। বিনয় পিটকে প্রথমে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা সকল ঋতুতে সমানভাবে বিচলন করত এতে জনগণ বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ হয়েছিল কারণ বর্ষা ঋতুতে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বিচলনের জন্য ক্ষুদ্র বৃক্ষ গুল্ম ইত্যাদি আঘাতপ্রাপ্ত হয় এবং অনেক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রাণী মারা যায়। এই কথা যখন বুদ্ধের সম্মুখে আসে তখন তিনি নিয়ম করেন যে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা অন্য ভিক্ষুদের ন্যায় আচরণ করবে না। পূর্বে বৃক্ষচ্ছেদন সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সচেতনতার অভাব ছিল। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা অনেকসময়ই বৃক্ষচ্ছেদন করতেন এবং সাধারণ মানুষ এর জন্য তাদের নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম করত। তাই বুদ্ধ একদিন সকল ভক্তকে ডেকে বলেন বৃক্ষচ্ছেদন অত্যন্ত গর্হিত কাজ। বহু ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রাণী, একেন্দ্রিয় যুক্ত জীব এই

বৃক্ষকে আশ্রয় করেই বেঁচে থাকে। বৃক্ষচ্ছেদনে অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্ন ব্যক্তিদের প্রসন্নতা বৃদ্ধি ঘটে না। পক্ষান্তরে বৃক্ষচ্ছেদন হলে অধিকতর অপ্রসন্নতা উৎপন্ন হয়, তাই বৌদ্ধভিক্ষুদের বৃক্ষচ্ছেদন না করার কঠোর বিধান গৌতম বুদ্ধ দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, উদ্ভিদ জাতীয় বৃক্ষ-লতাদি ছেদন করলেও পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। তিনি বীজ রক্ষার কথাও বলেছেন। পাঁচ প্রকার বীজের তিনি উল্লেখ করেছেন। যথা- মূল বীজ, স্কন্ধ বীজ, ফুল বীজ, অগ্র বীজ এবং বীজ বীজ। এই পাঁচ প্রকার বীজ নষ্ট না করার কথা বুদ্ধ বলেছেন। তাঁর মতে বীজ নষ্ট করলে বা করালে, ভাঙ্গলে বা ভাঙ্গালে এবং রান্না করলে বা করালে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। যদি কেউ বীজ কিনা এই সন্দেহবশত তা ছেদন করে বা করায়, ভাঙ্গে বা ভাঙ্গায় এবং রান্না করে বা করায় তবে দুক্কট অপরাধ হয়। তাই বৌদ্ধ মতে বৃক্ষ, বৃক্ষের শাখা, বীজ প্রভৃতি নষ্ট করা অত্যন্ত গর্হিত কাজ।[7]

বুদ্ধ অহিংসাকে এই বলে প্রশংসা করেন যে, ব্যক্তি যদি জঙ্গম ও স্থাবর এই উভয় প্রাণীদের প্রতি দন্ড পরিত্যাগ করেন, সেই ব্যক্তি যদি নিজে হত্যা না করেন এবং অপরকে দিয়েও হত্যা না করান তাহলে তাকেই ব্রহ্ম বলা হয়। অন্যভাবে দেখলে একথা স্পষ্ট, যে হিংসা করায় তাকে নিন্দা বলা হয় কারণ হিংসা নিজেকে মলিন ও হীন করে। কোনো ভিক্ষু যদি হিংস্র পশুর ন্যায় হিংসায় ন্যস্ত হয় তাহলে তার জীবনে খুবই দুঃখ কষ্টের সৃষ্টি হয় এবং সেই ব্যক্তি প্রকৃত শ্রমণ হওয়ার যোগ্য থাকে না। সে নিজের বুদ্ধি কলুষিত বা অবিশুদ্ধ করে তোলে।

---

[7] ভদন্ত করুণা বংশ. (অনু.). (২০০৭). *বিনয় পিটকে পাচিত্তিয়.* বংলাদেশ: অনমদর্শী মহাস্থবির মহোদয়ের শিষ্যবৃন্দ (রাঙামাটি). পৃঃ ৯৭-৯৮

এমনকি বুদ্ধ একথাও বলেছেন কেউ যদি ভুলবশত কোনো হিংসা করে ফেলে তবে তাকেও তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। যেমন বিনয়পিটকে বলা আছে ভিক্ষুগণ কখনও কোনো প্রাণবান বস্তুর প্রাণ হরণ করবে না। যদি কেউ এই প্রকারের কাজ করেন তবে তাকে ধর্মানুসারে শাস্তি ভোগ করতে হবে। তাছাড়া গো-চর্ম পরিধান না করার নির্দেশ বৌদ্ধ ধর্মে দেওয়া হয়েছে। যদি কেউ এপ্রকারের কাজ করেন তবে তার দুষ্কৃত দোষ হবে। তাছাড়া অন্য কোনো প্রাণীর চর্মও ব্যবহার না করার কথা বৌদ্ধ ধর্মে বলা আছে। কোনো বৃক্ষের জীবন কেড়ে নিলে, কোনো ব্যক্তি বা প্রাণীকে সামান্য আঘাত করলেও এমনকি আঙ্গুল দ্বারা সামান্য খোঁচা দিলেও প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। কোনো প্রাণবান বস্তুকে ইচ্ছাকৃতভাবে যদি কেউ প্রাণহীন করে বা যে জলে প্রাণী আছে সেই জলকে জ্ঞানত যদি কেউ পান করে, তবে সেই ভিক্ষুকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।[৪]

বুদ্ধের সমকালে ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বর্ণ নির্বিশেষে প্রাণীহিংসা ও মাংসাহারের প্রচলন ছিল । মৃগয়া ছিল তাদের বীরত্বব্যঞ্জক। তৎকালীন সময়ে অতিথি আপ্যায়নের অন্যতম উপাদান ছিল গোবৎসের মাংস, যার কারণে অতিথিদের প্রতিশব্দ হিসেবে 'গোঘ্ন'' শব্দটির উৎপত্তি। সামাজিক অনুষ্ঠানে মদ ও মাংস ব্যবহার ছিল সুপ্রচলিত। ভারতে উল্লিখিত আছে যে ইন্দ্রপ্রস্থে সভাগৃহ নির্মাণের পর যে ব্রাহ্মণ ভোজনে করেছিলেন সেই খাদ্যের মধ্যে ছিল ঘৃত ও মধু মিশ্রিত পায়েস ফল-মূল, বরাহ, হরিণের মাংস ও তিল মিশ্রিত অন্ন প্রভৃতি। রামচন্দ্রকে প্রত্যাবর্তন করানোর উদ্দেশ্যে ভরত সহ পারিষদ ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণকালে উনি তাদেরকে যথেচ্ছ সুরা, পায়স ও মাংস ভোজন করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাছাড়া পারলৌকিক কর্মেও পিতৃপুরুষের

[৪] প্রজ্ঞানন্দ. (অনু.). (১৯৩৭). *বিনয়-পিটক মহাবর্গ.* কলকাতা: যোগেন্দ্র রূপসীবালা ত্রিপিটক ট্রাস্ট বোর্ড. পৃঃ ২৭০- ২৭১

উদ্দেশ্যে মাংস নিবেদনের প্রথা ছিল। শ্রীকৃষ্ণের পিতৃশ্রাদ্ধের ক্ষেত্রেও অনুরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যুধিষ্ঠির ও ভীষ্মের কথোপকথনে পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত মাংসের প্রসঙ্গ পরিলক্ষিত হয়।[9]

বেদ বিধান অনুযায়ী যজ্ঞে পশুবলির প্রচলন ছিল। যজ্ঞের নামকরণের বিভিন্নতার ক্ষেত্রেও মানদণ্ড ছিল নিবেদিত পশু বিশেষ- অজমেধ, গোমেধ, অশ্বমেধ, নরমেধ, বাজপেয় প্রভৃতি। প্রসাদী পশু মাংস সকলে শ্রদ্ধা সহকারে গ্রহণ করতেন। রামায়ণে কৌশল্যার অশ্বমেধ যজ্ঞাশ্বের পরিচর্যা ও তাঁর দ্বারা অস্ত্রাঘাতে তাকে হত্যা করার বিবরণ লক্ষ্য করা যায়।

বিষ্ণুর অবতার শ্রীকৃষ্ণ ও রামচন্দ্রের মাংস ভোজন ও মৃগয়ায় কোনরূপ অনাগ্রহ ছিল না। শ্রী রামচন্দ্র বনবাস কালে বরাহ, হরিণ প্রভৃতি পঞ্চবিন্দ পশুর মৃগয়া করে তা ভোজনে অভ্যস্ত ছিলেন। গো-হত্যার বিরুদ্ধে বুদ্ধের পূর্ণ উচ্চারণ ছিল প্রথম বিদ্রোহ, বুদ্ধকে অনুসরণ করে বলা যায়-

মাতা পিতা ভ্রাতার মত স্বজন মনে করা হত গরুকে। যার থেকে দুগ্ধ, দধি, ছানা, ননী, ঘৃত, প্রভৃতি খাদ্য সামগ্রী পাওয়া যায় অর্থাৎ এরা অন্নদাতা, বরদাতা, সৌন্দর্য ও সুখদাতা। এই প্রয়োজনের কথা স্মরণ করেই প্রাচীনেরা গোহত্যা থেকে বিরত থাকতেন। ফলে গরুকে দেবদেবীর অধিষ্ঠাত্রী রূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

জীবহিংসা ও সুরাপান সম্পর্কে কোন পাপ বোধ তৎকালীন জনমানসে ছিল না। স্বয়ং বুদ্ধ ধর্মীয় প্রথায় নিবেদিত বহু পশুকে যূপকাষ্ঠ থেকে বহুবার উদ্ধার করে মহৎ ঔদার্য প্রকাশ করেছেন। এমনকি বহু প্রত্যাসন্ন যুদ্ধকে তিনি আশ্চর্য সক্রিয়তায় নিবারণ

[9] ধর্মাধার (অনু.). (১৯৫৯). *সূত্র-পিটকে মধ্যম নিকায়* (দ্বিতীয় খন্ড). রেঙ্গুন: শ্রী সুধাংশু বিমল বড়ুয়া (প্রকাশক). পৃঃ- ২৩

করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এই মহৎ মানবপ্রাণ অহিংসার বাণীর মাধ্যমে চিরকালীন মানব মহত্ত্বকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি মনে করতেন, যতক্ষণ পাপ কর্ম ব্যক্তির বেশী না হয় ততক্ষণ পাপী ব্যক্তির অমঙ্গল হয় না। কিন্তু পাপ যখন বাড়ে তখন পাপী অমঙ্গল দর্শন করতে শুরু করে।

“পাপোপি পসসতি ভদ্রং যাব পাপং ন পচ্চতি,

যদা চ পচ্চতি পাপং অথ পাপো পাপানি।"[10]

তাই পাপ করা বা প্রাণীহত্যা কখনোই আর্য পদবাচ্য নয়, অহিংসা পরায়ণতাই আর্যত্বের লক্ষণ।

"সুখকামানি ভূতানি যো দণ্ডেন ন হিংসতি,

অত্তনো সুখমেসনো পেচ্ চ সো লভতে সুখং।। "[11]

অর্থাৎ, ধম্মপদানুসারে অহিংসা পরায়ণ ব্যক্তি নিজের আত্মসুখের জন্য যদি অন্যান্য পশুপাখির প্রতি হিংসা না করে, দণ্ড দ্বারা তাদের প্রতি হিংসা থেকে বিরত থাকে তবে পরোলোকে এরূপ অহিংস ব্যক্তি সুখলাভে অধিকারী হয়।

জনগণের সংযত জীবন যাপনের উপায় হিসাবে বুদ্ধ যে পঞ্চশীলের উল্লেখ করেছেন, সেখানে প্রাণী হিংসা ও মাদক সেবন নিষিদ্ধ। ধর্মীয় উপলক্ষ আশ্রয় করেও এই কার্যাবলীকে তিনি সমর্থনযোগ্য বলে মনে করেন নি। বুদ্ধের বিশ্বময়িত্রী ও অহিংসাবাণীর প্রভাবে ভারতে জীবসেবার বিষয় ও ধারণাটির সম্প্রসারণের কারণ।

---

[10] ধর্মাধার. (১৯৫৪). *ধম্মপদ.* কলকাতা: মডার্ণ ইন্ডিয়া প্রেস. পৃঃ ৪৪.

[11] ধর্মাধার. (১৯৫৪). *ধম্মপদ.* কলকাতা: মডার্ণ ইন্ডিয়া প্রেস. পৃঃ ৫০.

অশোকের রাজত্বকালে মানুষের মত পশুদের সুচিকিৎসার জন্য স্থানে স্থানে দাতব্য পশু চিকিৎসালয় নির্মিত হয়েছিল।

বুদ্ধের রাজগৃহে বসবাসকালে দেবদত্ত পাঁচটি প্রস্তাব নিয়ে বুদ্ধের মতপ্রার্থনা করেছিলেন। যেমন- উত্তম, প্রভু, আমৃত্যু কোনো ভিক্ষুক মৎস্য মাংস গ্রহণ করবে না, যারা তা অমান্য করবে সে অপরাধী প্রতিপন্ন হবে।

বুদ্ধ এই প্রস্তাবে অসম্মত ছিলেন। আমিষ বা নিরামিষ ভোজন বিষয়ে ব্যক্তিগত রুচিকেই তিনি প্রাধান্য দিয়েছিলেন। দিন, কাল, রুচি মানুষের খাদ্যাভ্যাসের মূলে বলে তিনি মনে করেন।

মহাবগ্গের ভৈজষ্যখন্ধক-এ যে যে মাংস ভিক্ষুদের গ্রহণযোগ্য নয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলি হল- হস্তী, অশ্ব, সর্প, সিংহ, ব্যাঘ্র, দীপি, ভল্লুক, তরক্ষু এবং নরমাংস। অন্যদিকে মৎস্য, মাংস, মাখন, ঘৃতকে পুষ্টিকর খাদ্য হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ ত্রিদোষ বর্জিত মৃত মৎস্য মাংস গ্রহনে ভিক্ষুদের উপর কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়নি। লক্ষ্যণীয়, বুদ্ধ প্রাণী হিংসার বিরুদ্ধে ছিলেন, মাংস ভোজন এর সঙ্গে কোনরূপ প্রত্যক্ষ বিরোধিতা তাঁর ক্ষেত্রে দেখা যায় না। এই প্রাণী হিংসা ও মাংস ভোজন এর আলোচনা আছে জীবকসূত্রের একস্থানে- জনশ্রুতি আছে, শ্রমন গৌতম এর উদ্দেশ্যে প্রাণীবধ করা হয় এবং তিনি সজ্ঞানে তা ভোজন করেন এবং নিমিত কর্মের ভাগী হন, যারা এমন বলেন তাদের কথায় কি সত্যতা আছে? বুদ্ধ

প্রত্যুত্তরে বলেন- "তারা আমার সম্পর্কে সত্যবাদী নন। ...জীবক! আমি দৃষ্ট, শ্রুত ও পরিশঙ্কিত মাংস অগ্রহণের কথা বলি, তদ্ব্যতিরেকে তা গ্রহণীয়।"[12]

এই দোষত্রয় ব্যতিরেকে মাংসগ্রহণে কোনরূপ আপত্তি বুদ্ধ করেননি। অহিংসা ও আমিষাহারের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান সহজ সাধ্য নয়। অহিংসা জীবের প্রতি পালনীয়, খাদ্য হিসেবে মাংসের সঙ্গে তার কোনরূপ বিরোধিতা নেই। শাস্ত্র উল্লেখ করে কেউ কেউ জীবহত্যাকারী, মাংসক্রেতা, বাহক ও মাংস ভোজী সকলকে সমান অপরাধী প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেন, কিন্তু তা যুক্তিযুক্ত নয়।

প্রাণীহত্যা কখন করা যাবে তার সপক্ষে বুদ্ধের ব্যাখ্যা নিম্নরূপ-

প্রাণী হত্যা কালে তাকে প্রাণী বলে বোধ করা, বধ করার উদ্দেশ্যকে অন্তরের ধারণ করা, হত্যার প্রচেষ্টা করা, স্বহস্তে বা কারও দ্বারা হত্যা করা -এই পাঁচটি অঙ্গের উপস্থিতিতেই প্রাণী হত্যা সম্ভব। এর একটির অভাবে প্রাণীহত্যাজনিত শীল বিঘ্নিত হয় না।[13]

প্রাণী হত্যায় স্বয়ং উদ্যত হওয়া, অপরকে নিয়োগ, হত্যার সমর্থন ও প্রশংসাই মানুষের পাপের কারণ। ক্রেতা বা বক্তাগণ উপরোক্ত চারটি বিষয়ে জড়িত না থেকে লক্ষ্যপূরণ করতে পারেন। এই চারটি বিষয়ের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ততা ভিন্ন পাপের কোনো কারণ নেই।

---

[12] ধর্মাধার (অনু.). (১৯৫৯). *সূত্র-পিটকে মধ্যম নিকায়* (দ্বিতীয় খন্ড). রেঙ্গুন: শ্রী সুধাংশু বিমল বড়ুয়া (প্রকাশক). পৃঃ ৬৯-৭১.

[13] চৌধুরী, সুকোমল. (সম্পা.). (১৯৯৭). *গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন.* কলকাতা: পরিবেশক প্রেস. পৃঃ- ৬৩-৬৭.

৪.৪. অহিংস হয়েও মাছ-মাংস ভক্ষণ

অহিংসবাদী হলেও বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ বিভিন্ন সময়ে মাছ এবং মাংস ভক্ষণ করতেন। বিনয়পিটকের মহাভাগে কথিত আছে পিচ্ছবিদের সেনাপতি সিংহের বাড়িতে নিমন্ত্রণে বুদ্ধ নিজে তার শিষ্যদের সাথে মাংস খেয়েছিলেন। এইসময় বুদ্ধ নিয়ম করেন ভিক্ষুগণের ভোজনের উদ্দেশ্যে যে মাংস রান্না করা হবে তা ভিক্ষুগণের খাওয়া চলবে না। যদি কেউ তা ভোজন করে তবে তার দুঃখ উৎপন্ন হবে। তাই বুদ্ধ বলেন কেউ যদি না দেখে, না শোনে বা কারুর মধ্যে যদি শঙ্কা না থাকে যে এই খাদ্য বিশেষভাবে তার জন্যই প্রস্তুত করা হয়েছে তবে সেই খাদ্য তারা ভোজন করতে পারবে। বুদ্ধ তাই তিন প্রকার মাংসকে অভোজ্য বলেন- দৃষ্ট, শ্রুত এবং পরিশঙ্কিত। অন্যভাবে বলা যায়, বুদ্ধ তিনপ্রকার মাংসকে ভোজ্য বলেন- অদৃষ্ট, অশ্রুত, অপরিশঙ্কিত। অর্থাৎ এই সকল খাদ্য তাদের জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে এই বিষয়টি যদি তারা না দেখে, না শুনে থাকে বা তাদের শঙ্কা যদি না উৎপন্ন হয় তবে তারা সেই মাছ ও মাংস ভোজন করতে পারবে।[14] এছাড়া বুদ্ধ আরও বলেন যে, কোনো ভিক্ষুকে শ্রদ্ধা সহকারে কোনো গৃহস্থ নিমন্ত্রণ করে যা কিছু ভোজন করতে দেয় তা অবগুণের প্রতি দৃষ্টি না রেখে ভিক্ষু ভোজন করবে। এই সময়ে ভিক্ষু না নিজের কোনো কষ্টের কথা ভাববে আর না অন্যের কষ্টের কথা ভাববে। ভিক্ষুর সেই ভোজন গ্রহণ করা উচিৎ সেই ভোজন নির্দেশ। অন্যদিকে যে ব্যক্তি সেই বুদ্ধ ভিক্ষুকে খাওয়ানোর জন্য জীবের হত্যা করবে সে পাঁচ প্রকার পাপের ভাগী হবে। যথা- (I) সেই জীবকে আনতে আদেশ দিয়ে, (II) সেই জীবের গলায় দড়ি বেঁধে টেনে আনতে দেখে, (III) সেই জীবকে বধ করার আদেশ

[14] প্রজ্ঞানন্দ. (অনু.). (১৯৩৭). *বিনয়-পিটক মহাবর্গ.* কলকাতা: যোগেন্দ্র রূপসীবালা ত্রিপিটক ট্রাস্ট বোর্ড. পৃঃ ৩৩০-৩৩১.

দিয়ে, (IV) সেই জীবকে হত্যা করা হচ্ছে তা দেখে এবং (V) বুদ্ধ ভিক্ষুকে সেই অনুচিত বস্তু ভোজন করিয়ে সেই ব্যক্তি পাপের ভাগী হয়।[15] তবে অসুস্থ ব্যক্তি রোগ নিরাময়ের জন্য প্রয়োজন হলে জেনে-শুনেও ভোজন করতে পারে। একসময় অনেক বৌদ্ধ ভিক্ষু এমন এক রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয় যে, তার থেকে পরিত্রাণ পেতে ঔষধরূপে পশুর মাংস ভক্ষণের প্রয়োজন হয়। তখন বুদ্ধ বলেন ঔষধ হিসাবে প্রয়োজন হলে মাছ-মাংস ভক্ষণ করা যেতে পারে। কিন্তু বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ যদি মাছ-মাংস যাবত-জীবন ভক্ষণ করে তবে তাদের দোষ হবে।[16]

একথা সত্য যে, অহিংসা সম্পর্কে বুদ্ধদেব সাধারণত অতি কঠোর পন্থা অনুসরণ করেছিলেন। তার মানসিক হিংসাকেও তিনি ত্যাগ করার কথা বলেন। সে যুগে জীব হত্যা ও সুরা পান যে পাপ এই সম্পর্কে মানুষের মনে কোনো ধারণা ছিলনা। ভগবান বুদ্ধ নিজে বহু যোগ্য ভূমিতে উপনীত হয়ে বলি থেকে অনেক অসহায় পশুদের জীবন রক্ষা করেছিলেন। যে ব্যক্তি প্রাণী হত্যা করে তাকে প্রকৃত জ্ঞানের পথ তিনি দেখিয়েছেন সেজন্য ভগবান বুদ্ধ পঞ্চশীলের বিধান দিয়েছেন।

যদি কোনো ভিক্ষু সজ্ঞানে মানুষের জীবন কেড়ে নেয় অর্থাৎ স্ত্রী বা পুরুষের মধ্যে কাউকে হত্যা করে, তাছাড়া অসি, পাথর, দড়ি, মুগুর ইত্যাদি অস্ত্র দ্বারা কাউকে মারার উপায় অবলম্বন করে তবে সেই ভিক্ষুর পাপ উৎপন্ন হয়।[17] বুদ্ধ প্রাণী হত্যায় প্রেরণা দিতেও কঠোর ভাবে নিষেধ করেছেন। যদি কোনো ভিক্ষু প্রাণী হত্যায় প্রেরণা

---

[15] ধর্মাধার (অনু.). (১৯৫৯). *সূত্র-পিটকে মধ্যম নিকায়* (দ্বিতীয় খন্ড). রেঙ্গুন: শ্রী সুধাংশু বিমল বড়ুয়া (প্রকাশক). পৃঃ ৬৯-৭১.

[16] প্রজ্ঞানন্দ. (অনু.). (১৯৩৭). *বিনয়-পিটক মহাবর্গ.* কলকাতা: যোগেন্দ্র রূপসীবালা ত্রিপিটক ট্রাস্ট বোর্ড. পৃঃ ৩৩০-৩৩১.

[17] বুদ্ধবংশ (অনু.). (২০০৭). *বিনয় পিটকে পরাজিকা.* চট্টগ্রাম: প্রজ্ঞাবংশ সদ্ধর্ম গ্রন্থ প্রকাশনী. পৃঃ ১০৩.

দেয় তবে ধর্মানুসারে তার প্রতিকার করতে হবে। গোচর্ম ও অন্যান্য প্রাণীর চর্ম ব্যবহারের উপরও বুদ্ধের কঠোর নিষেধাজ্ঞা ছিল। যে ব্যবহার করবে তার দুক্কট অপরাধ হবে।[18] মহাবর্গে গাভী এবং গোবৎস স্পর্শ এবং হত্যা না করার কঠোর বিধান আছে। বুদ্ধ বলেছেন ভিক্ষুগণ গাভীর শৃঙ্গ, কর্ণ, গ্রীবা, পুচ্ছ প্রভৃতি ধারণ করতে পারবে না এবং গাভীর পিঠে আরোহণ করতে পারবে না। যদি করে তবে দুক্কট অপরাধ হবে। যদি কেউ কামচিত্তে গোযোনি স্পর্শ করে তবে থুল্লচ্চয় দোষ হবে।[19]

৪.৫. অহিংসার ফল

বৌদ্ধ ভিক্ষুরা যদি হিংসার পথ অবলম্বন করে তবে তাদের মধ্যে রাগ, দ্বেষ, হিংসা আরও বেশি করে উৎপন্ন হতে থাকে। কিন্তু বুদ্ধদেব মনে করেন যদি আর্য শ্রমণগণ অন্য প্রাণীর প্রাণনাশ থেকে নিজেদের বিরত রাখে তবে তারা ভয়, শত্রুতা প্রভৃতি থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পারবে। কারণ যে ব্যক্তি কোনো প্রাণীকে নিজে হত্যা করেনা, অপরকে দিয়ে হত্যা করায় না, অন্য প্রাণীকে কষ্ট দেয়না, অপরকে দিয়ে কোনো প্রাণীকে কষ্ট দেওয়ায় না এবং যার সর্ব ভূতের প্রতি মৈত্রী সুলভ ভাব আছে তার প্রতি শত্রুতা থাকেনা।

৪.৬. ব্রহ্মবিহার

মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা এই চারটিকে গৌতম বুদ্ধ একত্রে ব্রহ্মবিহার বলে অভিহিত করেছেন। লোভ, দ্বেষ, মোহ, সন্দেহ, ঈর্ষা প্রভৃতি চিত্তবৃত্তি থেকে মুক্তি পেতে তিনি এই চারটি মহান গুণাবলীর উল্লেখ করেছেন। প্রত্যেকটি চিত্তে বিহারকে

---

[18] প্রজ্ঞানন্দ. (অনু.). (১৯৩৭). *বিনয়-পিটক মহাবর্গ.* কলকাতা: যোগেন্দ্র রূপসীবালা ত্রিপিটক ট্রাস্ট বোর্ড. পৃঃ ২৭০-২৭১.

[19] তদেব. পৃঃ ২৬৭-২৬৮.

বুদ্ধ ব্রহ্মবিহার বলেছেন। সূত্ত নিপাতে বলা আছে, মাতা যেমন একমাত্র পুত্রকে নিজের প্রাণ দিয়ে রক্ষা করে, সেইরূপ অন্য প্রাণীকে অপরিমিত প্রীতিযুক্ত হয়ে অবস্থান করতে হবে। ঊর্দ্ধে-নিম্নে-পার্শে সকল লোকের প্রতি দ্বেষহীন ও বৈরিতাভাব মুক্ত হয়ে অবাধে অপরিমিত প্রীতি ও মৈত্রীভাব যুক্ত হতে হবে। যখন দাঁড়িয়ে আছি বা চলছি বা বসে আছি বা শুয়ে আছি, যে পর্যন্ত নিদ্রা না আসে সেই পর্যন্ত এই প্রকার স্মৃতিতে অধিষ্ঠিত হয়ে থাকাকেই ব্রহ্মবিহার বলে। অপরিমিত মানসকে প্রীতিভাবে, মৈত্রীভাবে বিশ্বলোকে ভাবিত করে তোলাই হল ব্রহ্মবিহার।

ক. মৈত্রী : মৈত্রীর প্রকৃত প্রতিশব্দ হলো শুভেচ্ছা, হিতাকাঙ্ক্ষা, সৌহার্দ্য, পরোপকারিতা, হিতচিন্তা ইত্যাদি গুণবাচক শব্দ। মৈত্রীর প্রত্যক্ষ প্রতিশব্দ হলো অশুভ চিন্তা-চেতনা এবং ক্রোধ রোধ। অন্যভাবে বলা যায়, মৈত্রী হলো মিত্রতা বন্ধুত্ব যেখানে প্রেম বা ভালবাসার স্পর্শ থাকে, নির্মল প্রেম থাকে। এ মৈত্রীর মাধ্যমে হিংসা, বিদ্বেষ ও শত্রুতাকে জয় করা যায়। এখানে সর্বপ্রাণীর প্রতি মমতায় চিত্ত জাগ্রত রাখাই হলো মৈত্রী। মৈত্রীর অনুসারী হলে লোভ, দ্বেষ, মোহ, ক্রোধ, সর্বোপরি অহংবোধ সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করতে হবে। সকল প্রকার প্রাণীকে নিজের মতো দেখতে হবে। এখানে সুত্তনিপাতের অন্তর্গত মেত্তাসুত্ত বা মৈত্রী সূত্রে মৈত্রীভাবের প্রায়োগিক ব্যবহার সম্পর্কে উল্লিখিত হয়েছে:[20]

"মাতা যথা নিযং পুত্তং, আযুসা একপুত্তমনুরক্খে
এবম্পি সব্বভূতেসু, মানসং ভাবযে অপরিমাণং।"

[20] মহাস্থবির, সাধনানন্দ (সম্পা.). (১৯৮৭). *সুত্তনিপাত* (সূত্র পিটকের অন্তর্গত খুদ্দক নিকায়ের অংশ). বাংলাদেশ: শ্রীমৎ সাধনা মহাস্থবির (বন ভন্তে). পৃঃ ৩৭.

অর্থাৎ মাতা যেমন তার একমাত্র পুত্রকে নিজের জীবন দিয়ে রক্ষা করেন, তেমনি সকল প্রাণীর প্রতি অপরিমেয় মৈত্রীভাব পোষণ করার কথা বলা হয়েছে। এখানে মাতার সন্তানের প্রতি আচরণের সাথে ভাবনা প্রণোদিত মানুষের আচরণের তুলনা করেছেন। মায়ের নিজের কোন স্বার্থ নেই। সন্তানের মঙ্গল ও কল্যাণ কামনায় তিনি নিবেদিত প্রাণ। এখানে সন্তানের সুখেই তাঁর সুখ। এরূপ সকলের প্রতি সমদৃষ্টি প্রদানের কথা এখানে উল্লিখিত হয়েছে।

নিঃস্বার্থ পরোপকারই হলো মৈত্রীর লক্ষণ। মিত্রতা (দয়ালু মনোভাব) হলো মৈত্রীর স্বভাব। মৈত্রী সবাইকে স্বার্থহীন, ধৈর্যশীল এবং ক্ষমাশীল হবার শিক্ষা দেয়। মনকে সকল সংকীর্ণতার উর্দ্ধে রাখতে সহায়তা করে। যে বা যারা মৈত্রীর অনুশীলন করে তারা এগার প্রকার ফল লাভ করে।

১. সুখে নিদ্রা যায়, ২. সুখে জাগ্রত হয়, ৩. কোনোরূপ পাপময় স্বপ্ন দেখে না, ৪. মানুষের সুপ্রিয় হয়, ৫. অমনুষ্যদেরও প্রিয় হয়, ৬. দেবতারা সবসময় তাকে রক্ষা করে, ৭. শরীরে অগ্নি, বিষ বা অস্ত্র দিয়ে আঘাত করতে পারে না, ৮. চিত্ত সমাধিস্থ হয়, ৯. মুখবর্ণ প্রসন্ন হয়, ১০. সজ্ঞানে মৃত্যু বরণ করে, ১১. মৃত্যুর পর উর্দ্ধলোক লাভ হয়।

পৃথিবীর সকল প্রাণীর প্রতি সীমাহীন ভালাবাসাই হলো মৈত্রী যা দেশ-কাল বা জাতির বাধা অতিক্রম করে এক বন্ধুত্বপূর্ণ বাতাবরণ সৃষ্টি করে। এটা কোনো আসক্তিময় ভালোবাসা বা প্রেম নয়। এ হলো সর্বজীবের প্রতি অপরিসীম দ্বিধাহীন ভালোবাসা। একথা বলা যেমন সহজ কর্মে বাস্তবায়ন খুবই দুঃসাধ্য। সব কিছুর উর্দ্ধে

উঠে সবার মঙ্গল কামনা করাই হলো মৈত্রী। ধর্মপদ নামক গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে; হিংসার দ্বারা হিংসা ধ্বংস হয় না। একমাত্র মৈত্রীর দ্বারাই বিদ্বেষ-এর অবসান হয়।

খ. করুণা : ব্রহ্মবিহারে চিত্তমুক্তির অন্যতম অঙ্গ হিসেবে করুণাকে দেখানা হয়েছে। অন্যের দুঃখ দেখে মনে দুঃখ উৎপন্ন হয় এবং তা দূর করার অভিপ্রায় জাগে তার নাম করুণা। অন্যভাবে বলা যায়, পীড়িত সন্তানের প্রতি মাতার যেরূপ স্নেহ, প্রেম, মায়া-মমতা সেরূপ পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীর প্রতি দয়া, কৃপা ও সহানুভূতিবশত চিরশাশ্বত অনুকম্পা প্রদর্শন করাই হলো করুণা। করুণার প্রত্যক্ষ শত্রু হলো নীতি বিবর্জিত হিংসা এবং পরোক্ষ শত্রু হলো পরশ্রীকাতরতা। করুণার বৈশিষ্ট্য হলো অপরের দুঃখ-দুর্দশা নিবারণ করার ঐকান্তিক ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ।

নিষ্ঠুরতা প্রত্যাখান বা প্রত্যাহার করা হলো করুণার স্বভাব। দুঃখ বিমোচন বা অপসারণ করার ইচ্ছা-ই করুণার মূল লক্ষণ। করুণার দুটি দিক। একটি অনুভূতি প্রবণতা বা আন্তরিকবোধ এবং অন্যটি হলো দুর্গতের দূর্দশা মোচনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা। অর্থাৎ এখানে একটি হল চেতনাভিত্তিক এবং অপরটি হল কর্মভিত্তিক।

গ. মুদিতা: এটি হলো তৃতীয় মহৎ মানবিক গুণ। অপরের সুখ-শান্তি সমৃদ্ধিতে সুখ-প্রশংসায় আনন্দ, যশ-ঐশ্বর্যে মনে প্রীতিবোধ উৎপন্ন করার নামই হলো মুদিতা। এখানে মুদিতার শিক্ষা হলো সবাই যেন সুখে শান্তিতে বসবাস করে। কেউ যেন অসুখী না হয় ।

পরের সুখ সৌভাগ্যের অনুমোদনই হলো মুদিতার লক্ষণ। মুদিতা শুধু সহানুভূতি নয়, এটাকে প্রশংসাসূচক আনন্দও বলা হয়। ঈর্ষাভাব ধ্বংস হলেই মুদিতার জন্ম হয়। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের জয়ে আনন্দ প্রকাশ করা স্বাভাবিক এবং অনেক সহজ।

কিন্তু অপছন্দ ব্যক্তির সাফল্যে আনন্দ প্রকাশ করা কিংবা সেই ব্যক্তিকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করা আরো কঠিন। কিন্তু মুদিতা ভাবনা সম্পন্ন ব্যক্তি এ কঠিন কাজ খুব সহজেই করতে পারেন। মুদিতা অনুশীলনের জন্য দরকার প্রয়াস এবং প্রবল ইচ্ছাশক্তি। মুদিতা দ্বারা শত্রুতাভাব ধ্বংস হয়। মুদিতায় পরের সুখে সুখ এবং দুঃখে দুঃখ হয়।

ঘ. উপেক্ষা : উপেক্ষা হলো চতুর্থ ও শেষ মানবিক গুণ যা কোনো ব্যক্তিকে উচ্চতম স্তরে উন্নীত করে। উপেক্ষা-এর একার্থবোধক শব্দগুলো হলো মধ্যস্তভাব, সাম্য এবং সমচিত্ততা, ন্যায়সঙ্গতভাবে বিচার করা, সঠিক উপায়ে পর্যালোচনা করা, অথবা নিরপেক্ষভাবে দেখা, পক্ষে কিংবা বিপক্ষে মোহগ্রস্থ না হওয়া প্রভৃতি। মৈত্রী, করুণা, মুদিতা এ তিন অবস্থা অতিক্রম করে যখন মানুষ অনুদ্বিগ্নমনা এবং সুখে বিগতস্পৃহা হন এবং সদাশান্তভাবে অবস্থান করে, তখন সেই অবস্থাকে বলা হয় উপেক্ষা। নিরপেক্ষ ভাব বা নিরপেক্ষতা-এর প্রধান লক্ষণ। এ নিরপেক্ষতা হলো আপন সাধনা ও চর্চার কারণে অর্জিত এক স্বভাব বৈশিষ্ট্য যা চিত্তকে পরহিত কর্মে স্থিত রাখে নিন্দা-প্রশংসা, লাভ-ক্ষতি, যশ-অযশ, সুখ-দুঃখ ইত্যাদি কোন বিষয়ে আকর্ষণ ও চঞ্চলতা হেতু চিত্তকে বিচলিত করতে পারে না। উপেক্ষার প্রতিপক্ষ হলো লোভ ও হিংসা। এই লোভ ও হিংসা সম্পূর্ণরূপে বিনাশ সাধন হলেই 'উপেক্ষা' বোধ হৃদয়ে জাগরিত হয়।[21]

ব্রহ্মবিহার-এর প্রায়োগিক ব্যবহার মানুষের জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মৈত্রী, করুণা, মুদিতা এবং উপেক্ষার নিরন্তর অনুশীলন করলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মানসিক অবস্থা

[21] বিদ্যারণ্য. (১৯৮৪). *বৌদ্ধ দর্শন ও ধর্ম.* কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ. পৃঃ ১০৬-১০৯.

উন্নততর নৈতিকতার পর্যায়ে উন্নীত হয়। এ চারটিকে বলা হয় অপ্রমেয়। এগুলোর সীমা এবং পরিসীমা নেই।

সুতরাং মৈত্রী সকল জীব, করুণা সব দুঃখী, মুদিতা সকল উন্নতিশীল ব্যক্তি এবং উপেক্ষা ভালো-মন্দ, প্রিয়-অপ্রিয়, সুখ-দুঃখ সকল জীবের প্রতি বিস্তৃত এবং প্রসারিত। যিনি নিজের স্বার্থ সম্বন্ধে উদাসীন থেকে মহান গুণাবলীর সাধনা করেন, বিশ্ববাসীর প্রতি প্রীতিবহন করেন, তাদের মঙ্গল কামনা করেন, এ চারটি গুণাবলী কোনোভাবে স্থান-কাল-পাত্রভেদে সীমাবদ্ধ নয়। তাই এগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম।[22]

[22] বিদ্যারণ্য. (১৯৮৪). *বৌদ্ধ দর্শন ও ধর্ম.* কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ. পৃঃ ১০৬-১০৯.

পঞ্চম অধ্যায়

উন্নয়ন ও স্থিতিশীল উন্নয়ন

৫.১ মানুষ ও পরিবেশ দূষণ

পরিবেশ তথা মানব সভ্যতা বর্তমান সময়ে এক চরম সংকটের সম্মুখে উপস্থিত। অনেক পরিবেশবিদ এমন আশঙ্কাও করছেন যে পৃথিবীতে জীবনের স্পন্দন নাকি অদূর ভবিষ্যতে একেবারে স্তব্ধ হয়ে যাবে। সাধারণ মানুষকে নিজেদের মধ্যে আলাপচারিতায় এমন স্বগোতক্তি করতে শোনা যায় আবহাওয়া নাকি একদম পাল্টে যাচ্ছে। পৃথিবীতে পরিবেশের অবক্ষয় শুরু হয়েছে আজ থেকে প্রায় আড়াইশো বছর পূর্বে অর্থাৎ শিল্প বিপ্লবের শুরু থেকে। অর্থনৈতিক বৃদ্ধি এবং উন্নয়নের মাধ্যম হিসেবে ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে গ্রেট ব্রিটেনে শিল্প বিপ্লব দেখা দেয়। এই শিল্প বিপ্লবের ফলে আধুনিক যন্ত্র ও কলকারখানা সৃষ্টি হয় এবং প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন হতে শুরু করে। খুবই দ্রুত শিল্প বিপ্লবের প্রভাব সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দেখা যায় শিল্পক্ষেত্রে সদর্থক পরিবর্তন আসলেও উন্নয়নের নামে মানুষ প্রকৃতি তথা পরিবেশের যে ব্যাপক ক্ষতি করে চলেছে তার ব্যাপক প্রভাব পৃথিবীর পরিবেশের তথা জীবকুলের ওপর পড়ছে। শিল্পের প্রয়োজনে প্রাকৃতিক সম্পদের অত্যধিক ব্যবহার এবং শিল্প-কলকারখানা থেকে নির্গত ধোঁয়া, বর্জ্য পদার্থ আজ বিশ্ব পরিবেশ ধ্বংসের মূল কারণ। এর সাথে চলছে সবুজ বনাঞ্চল ধ্বংস, নদী-সমুদ্রের জলকে ক্রমাগত দূষিত করা এবং তথাকথিত উন্নয়নের বাসনায় পরিবেশের উপর শোষণ আজ মানব সভ্যতাকেই ধ্বংসের দোরগোড়ায় উপনীত করেছে। বিজ্ঞানীরা এমন আশঙ্কা প্রকাশ

করেছেন যে এভাবে চলতে থাকলে আগামী ২১০০ সাল নাগাদ পৃথিবী গ্রহটির তাপমাত্রা দুই থেকে তিন ডিগ্রী বৃদ্ধি পাবে। কার্বন-ডাই-অক্সাইড (CO_2) একমাত্র গ্রীন হাউজ গ্যাস নয়, যা নিয়ে আমরা চিন্তিত, এছাড়াও নাইট্রাস অক্সাইড (N_2O) এবং মিথেন গ্যাসের (CH_4) পরিমাণও বাতাসে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে বিশ্ব উষ্ণায়ন বাড়ছে, পরিবেশের এই সংকট আজ সাধারণ মানুষ তথা পরিবেশবিদদের ভাবিয়ে তুলেছে।

এই পরিবেশগত সমস্যার কথা চিন্তা করে ১৯৮৩ সালের ডিসেম্বর মাসে তৎকালীন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের Secretary General Javier Perez de Cuellar তৎকালীন নরওয়ের প্রধানমন্ত্রী Gro Harlem Brundland -কে জাতিসংঘ (UN) থেকে পৃথক একটি সংস্থা গড়ে তুলতে বলেন, যে সংস্থা মূলত পরিবেশের সংকট ও উন্নয়নের সমস্যাগুলির উপর নজর দেবে। এই নতুন সংস্থা Gro Harlem Brundland এর নাম অনুসারে Brundland Commission বা ভালভাবে বললে World Commission on Environment and Development (WCED বা বিশ্ব পরিবেশ ও উন্নয়ন সংস্থা) নামে পরিচিত হয়। এই কমিশনের চেয়ারপার্সন ছিলেন Gro Harlem Brundland। ১৯৮৭ সালে Brundland Commission তাদের প্রথম রিপোর্ট প্রকাশ করে, যার নাম ছিল "Our Common Future"।[1] এই রিপোর্টে বিভিন্ন প্রজাতি ও জিনের রক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। তাছাড়া স্থলজীবী ও জলজ পরিবেশের বিভিন্নতা রক্ষা, পরিবেশের উপাদান গুলির সংরক্ষণের মাধ্যমে কিভাবে বিভিন্ন প্রাণীর উন্নয়ন এ বিকাশ ঘটানো যায়, সে ব্যাপারে রিপোর্টে বলা আছে। এই

[1] Malakar, Bharat (Ed.). (2013). *Sustainable Development: Ethics and Economics*. Purba Medinipur: Readers service in association with Dept of Philosophy, Mahishadal Girls College. Pg- 33.

রিপোর্টে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলিকে সতর্ক করে বলা হয়, যদি এখন থেকে এসব রাষ্ট্রগুলি যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ না করে তবে আগামী শতাব্দীতে অনেক রাষ্ট্রের বেশ কিছু অংশ সমুদ্রে বিলীন হয়ে যাবে। কিন্তু এর জন্য দায়ী কে? অবশ্যই মানুষ ও তার তথাকথিত উন্নয়নের বাসনা। মানুষের এক অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশের তীব্র ভোগ বিলাসিতার তথা উন্নয়নের (Development) মাশুল সমগ্র মানব সভ্যতাকে এবং সেইসঙ্গে সমগ্র জীবজগৎ তথা এই পৃথিবীকে দিতে হবে। মানুষের জন্য যখন এই ভয়াবহ সঙ্কট উপস্থিত, তখন এর থেকে উত্তরণের পথ মানুষকেই খুঁজে বার করতে হবে। অন্যথায় পৃথিবীতে জীবনের স্পন্দনই থেমে যাবে।

৫.২ পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন

পূর্বের আলোচনা থেকে এই বিষয়ে ধারণা করা গেল যে, মানুষের লোভ ও তার তথাকথিত উন্নয়নের বাসনা হলো পরিবেশগত সংকটের মূল কারণ। যেকোনো তথাকথিত উন্নয়ন প্রক্রিয়ার অনিবার্য পরিণতি হলো কম-বেশি পরিবেশ দূষণ। যত বেশি উন্নয়নের নামে কল-কারখানার সংখ্যা বাড়বে, তত বেশি ধোঁয়া, ক্ষতিকারক গ্যাস ও শিল্পজাত বর্জ্য পদার্থে পরিবেশ দূষণ বৃদ্ধি পাবে; পাশাপাশি প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার বাড়ায় ক্রমশ তাদের অপ্রতুলতা সৃষ্টি হবে। তাহলে কি প্রকৃতিকে রক্ষা করতে গেলে উন্নয়ন বন্ধ করে দিতে হবে? কিন্তু মানুষের প্রয়োজনে তথা প্রকৃতির স্বগতমূল্য স্বীকার করে যেমন প্রকৃতির অবক্ষয় রোধ করা কর্তব্য তেমনি মানব সভ্যতার অগ্রগতি বা উন্নয়নের ধারা স্তব্ধ করে দেওয়া প্রকৃতিবিরুদ্ধ এক অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি নয় কি? যেকোনো শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ একথা স্বীকার করবেন পরিবেশ সংরক্ষণ

একান্তভাবে গুরুত্বপূর্ণ, তথাপি উন্নয়নের ধারা স্তব্ধ করে মানুষ পুনরায় প্রাগৈতিহাসিক যুগের অরণ্যে ফিরে যাবে এমন আশা করাটাও চরম নির্বুদ্ধিতা। তাহলে প্রশ্নটা থেকেই গেল পরিবেশ সংরক্ষণ এবং উন্নয়ন- এই দুটি ক্রিয়ার সংগতি একত্রে কিভাবে সম্ভব? এই মূল প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পূর্বে আমি বোঝার চেষ্টা করব 'উন্নয়ন' বলতে আমরা ঠিক কী বুঝি। অন্যভাবে বললে উন্নয়নের ধারণাটিকে বিশ্লেষণ করা ছাড়া আমরা কোনভাবেই উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে পারব না।

৫.৩ উন্নয়নের সাধারণ ধারণা

উন্নয়ন তত্ত্ব নিয়ে এখনো পর্যন্ত বহু লেখালেখি হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও এ নিয়ে বিভিন্ন ধরনের আলোচনা হবেই। কারণ কাকে যে উন্নয়ন বলে এ নিয়ে চিন্তাবিদদের মধ্যে বিবাদ বিতর্কের সীমা নেই। সাধারণভাবে বলা যায় উন্নয়ন (Development) শব্দটি সর্বদা একটি ইতিবাচক শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এই উন্নয়ন শব্দটি মানুষের উন্নতি (Human achivement), ব্যক্তিত্বের বিকাশ, ব্যবসার অগ্রগতি, প্রযুক্তি বা প্রতিষ্ঠানের উন্নতি প্রভৃতি যেকোনো ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। Development (উন্নয়ন) শব্দটি সম্ভবত সর্বপ্রথম ১৭৫৬ সালে শোনা গিয়েছিল, এর অর্থ ছিল 'Unfolding', যার আভিধানিক অর্থ কোন কিছুকে খুলে দেওয়া বা উন্মুক্ত করা। কিন্তু উন্নয়নের প্রেক্ষিতে এই 'Unfolding' শব্দটির অর্থ করা যেতে পারে এমন একটি প্রক্রিয়া যা কোনো কিছুকে একটি ভিন্ন পর্যায়ে বা আরো ভালো পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে।[2] পরবর্তীকালে এই শব্দটি সারা পৃথিবীতে এত ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতে

[2] Silm, Hugo. (1995). What is Development?. *Development.* Taylor & Francis Ltd. Vol- 5. Pg- 143-148.

থাকে যে আলবার্ট আইনস্টাইনের মতো বিজ্ঞানী হোক, কিংবা মহাত্মা গান্ধীর মত রাজনীতিবিদ তথা দার্শনিক হোক অথবা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বা অমর্ত্য সেনের মতো নোবেলজয়ী বিখ্যাত ব্যক্তিত্বগণও এই 'Development' বা 'উন্নয়ন' শব্দটি নিয়ে বিস্তর আলাপ আলোচনা করেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিক থেকে উন্নয়ন (Development) শব্দটি প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে, সমাজবিজ্ঞানে পদার্থবিদ্যায় প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হচ্ছে। যাইহোক সমাজ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই উন্নয়ন (Development) শব্দটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৫০ থেকে ১৯৬০ এর দশকে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। তারপর থেকে এই উন্নয়নের ধারণাটি অনেক বিষয়ের সঙ্গে যেমন অর্থনীতির সঙ্গে, সামাজিক উন্নতির সঙ্গে যুক্ত হতে শুরু করে।

৫.৪ উন্নয়নের অর্থনৈতিক ধারণা

এইভাবে উন্নয়নের ধারণাটি ক্রমশ নতুন নতুন বিষয় ও ভাবনার সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় উন্নয়নের (Development) ধারণাটি এত ব্যাপকতা লাভ করলো যে চিন্তাবিদদের উন্নয়ন প্রসঙ্গে মতভেদ আরও কয়েকগুণ বেড়ে গেল। কিন্তু এর মধ্যেই সারা পৃথিবীতে একটি চলমান উন্নয়নের ধারণা বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করল। সাধারণ মানুষরা উন্নয়নকে এভাবে বুঝলেও এই চিন্তার তাত্ত্বিক রূপায়ন তেমনভাবে ঘটেনি; তার কারণ এই উন্নয়নের ধারণা বহুলাংশে শহরভিত্তিক, আয়ভিত্তিক এবং ভোগভিত্তিক। উন্নয়নের বাহ্যিক উদাহরণ হিসেবে সাধারণ মানুষ যা বোঝে তা হল; যেকোনো দেশে লন্ডন, নিউইয়র্ক-এর মত কয়েকটি শহর নির্মাণ, অনেক শপিং মল,

ভালো সুদৃশ রেস্তোরাঁ থাকা, ঝাঁ-চকচকে নতুন বাড়ি বা ফ্ল্যাট, নতুন গাড়ি থাকা প্রভৃতি।[3] অর্থাৎ সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে উন্নয়নের ধারণা মূলত অর্থনীতির সঙ্গে সম্পর্কিত। অর্থনৈতিক উন্নয়ন (Economic Development) জাতীয় উৎপাদন ও সম্পদ বৃদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুন্নত দেশে আর্থিক উন্নয়নকে অনেকাংশে দেখা হয় জাতীয় আয় বৃদ্ধির মাপকাঠিতে। বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনও মনে করেন উন্নয়নের অর্থনৈতিক তত্ত্ব নিয়ে অনুসন্ধান ও চর্চা খুব বেশিদিন শুরু হয়নি। কিছু বছর পূর্বে অর্থনীতির একটি উপধারা হিসেবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্ম হয়। উন্নয়নের অর্থনৈতিক তত্ত্ব নিয়ে অনেক চিন্তাবিদ সংশয় প্রকাশ করেছেন। বাস্তবিকপক্ষে অর্থনৈতিক উন্নয়নতত্ত্ব অনগ্রসরতা দূরীকরণে (যা অর্থনীতির আলোচনার মূল) তেমন কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করেনি।[4]

যাই হোক, অর্থনৈতিক উন্নয়নের তাত্ত্বিক আলোচনা এই গবেষণার বিষয় নয়। তাই এই বিষয়ে আলোচনা থেকে আপাতত বিরত থাকা হল। শুধু এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হলো যে 'অর্থনৈতিক উন্নয়ন' বলতে আমরা সাধারণত কি বুঝি। অর্থনৈতিক উন্নয়ন বা সাধারণভাবে উন্নয়ন বলতে আমাদের মাথায় যা আসে সেটি আমদানি করা হয়েছে পশ্চিমী সংস্কৃতি থেকে। অনেকে মনে করেন, কোন দেশের জনগণের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি হল উন্নয়নের মাপকাঠি। কেউ বলতে পারেন উন্নয়ন হলো মাথাপিছু কটা গাড়ি বা সেলফোন আছে তা দেখা, অনেকের কাছে আবার সুদৃশ ব্র্যান্ডের জামাকাপড় পরিধান, কিংবা খাবারের হোম ডেলিভারি সার্ভিস বা ক্রেডিট কার্ডের বহুল প্রসার

---

[3] মারজিৎ, সুগত. (২০০৮). *উন্নয়নের যুক্তি তক্কো.* কলকাতাঃ অনুষ্টুপ.পৃঃ ১৪

[4] সেন,অমর্ত্য. (১৪২৪ বং). *অর্থনীতি গ্রন্থমালা ৭* . "জীবনযাত্রা ও অর্থনীতি". কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স. পৃঃ ৮৩-৮৬.

উন্নয়নের সূচক। আবার কোন খেটেখাওয়া গ্রামের মানুষের কাছে উন্নয়ন হলো দুবেলা পেট ভরে খাওয়া, আর সপ্তাহে একটা পরিবার নিয়ে সিনেমা দেখার পয়সা থাকা। যে সাইকেল নিয়ে স্কুলে যায় তার কাছে মোরাম রাস্তাই উন্নয়নের দিশারী। অনেক শিক্ষিত সহনশীল ব্যক্তি মনে করেন কোন অঞ্চলে আয়ের হিসাবে নিম্নতম ৩০% লোক কেমন আছে সেটাই উন্নয়ন। এরকম উন্নয়ন সম্পর্কে হাজার চিন্তা বিভিন্ন সময় আমাদের মনের মধ্যে উঁকি দেয়। নিজেদের অজান্তেই কোনো-না-কোনোভাবে অর্থনীতির পরিসরে উন্নয়নের ধারণা আমাদের মনের মধ্যে গড়ে ওঠে।

৫.৫ প্রকৃত উন্নয়ন

যাই হোক, আর্থিক উন্নয়ন বলতে আমরা সচরাচর যা বুঝি সে দিক দিয়ে ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশ অনেক পিছিয়ে। শুধু আর্থিক দিক থেকে ভারত পিছিয়ে নয়, মানসিকতার দিক থেকেও এখনো ভারতবর্ষ অনেক পিছিয়ে। কারণ ভারতে অনেক উন্নত জায়গায় আজও পণের জন্য, সতীর নামে মেয়েদের পোড়ানো হয়; ভারতে এখনো অনেক জায়গায় নিচু জাতের (সমাজপতিরা নিজেদের স্বার্থে যাদের এই আখ্যা দিয়ে রেখেছেন) ছায়া স্পর্শ করলে তথাকথিত উন্নত উচ্চবর্ণ স্নান করতে উদ্যত হন।[5] আর দুর্নীতি, স্বজনপোষণের কথা নয় নাই বা আলোচনা করলাম; যে দেশে প্রায় ৩০ শতাংশ লোক দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করেন, যে দেশে অনেকেই পানীয় জলের অভাবে দুর্দশাগ্রস্ত, যেখানে জাতপাতের ভেদাভেদ, সাম্প্রদায়িক হত্যা, ধর্ষণ ইত্যাদি প্রাত্যহিক ঘটনা সেখানে কোন পথে উন্নয়ন হবে তা আলোচনার পূর্বে

[5] মারজিৎ, সুগত. (২০০৮). *উন্নয়নের যুক্তি তক্কো.* কলকাতাঃ অনুষ্টুপ. পৃঃ ৪২.

'উন্নয়নবোধ' চাই।[6] মানুষের কত বেশি আয় বাড়ছে, সে কতবার মাসে প্লেনে যাতায়াত করছে বা কত শীঘ্র মানুষ আর্থিক সচ্ছলতা অর্জন করছে তা সবই উন্নয়নের অঙ্গ হলেও শুধু এমন উন্নয়ন কোন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন প্রকৃত শিক্ষিত ব্যক্তির কাম্য হতে পারে না। আর এরকম উন্নয়নের ধারণা ও পরিবেশ সংরক্ষণের ধারণার একত্রে সংগতি (যা এক্ষেত্রে মূল আলোচ্য বিষয়) কখনোই ঘটানো সম্ভব নয়। তাহলে উন্নয়নের এমন কোন ধারণা আছে কি যা পরিবেশগত সংকট দূরীকরণে উপযোগী? তাছাড়া উন্নয়ন বলতে আমরা যা বুঝি তা যদি উন্নয়নের যথার্থ দিশা আমাদের দিতে না পারে তাহলে উন্নয়নের যথার্থতা কিসের দ্বারা প্রাপ্ত হবো? এ প্রসঙ্গে বলা যায়, উন্নয়নের সবচেয়ে বড় অঙ্গ হওয়া উচিত Social mobility বা সামাজিক সচলতা। আজকের সমাজে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গ যেমন কোম্পানির বড় ম্যানেজার, ডাক্তার, উকিল, শিক্ষক, কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ প্রভৃতি সফল পেশাদারদের কজন অশিক্ষিত বা নিম্নশিক্ষিত বা নিম্নবিত্ত ঘরের ছেলে-মেয়ে তা দেখে অনেকে উন্নয়নকে বিচার করে থাকেন। কিন্তু তার মানে এমন ভাবার কোন কারণ নেই যে চাষী, জেলে, কুমোর প্রভৃতি অন্যান্য পেশার জীবিকাকে ছোট করে দেখা হয়েছে বা এরা উন্নয়নের আওতার বাইরে। প্রকৃতপক্ষে, সমাজের সকল মানুষের সমান সুযোগ পাওয়াকে এখানে উন্নয়নের একটি পর্যায় হিসাবে দেখাতে চাওয়া হয়েছে। অনেকে আবার বলেন, প্রকৃত উন্নয়ন এমন ধারণা নয় যে আমার বাবা বাইক চেপে অফিসে যেত আর এখন আমি গাড়ি নিয়ে স্কুলে যাই। বরং উন্নয়ন বলতে বোঝায় যার বাবা সমাজে উপেক্ষিত ছিলেন, তার ছেলে আজ সমাজে মাথা উঁচু করে চলে এবং সামাজিক ক্ষেত্রে মতামত প্রদান করে। উন্নয়ন সকলের ন্যূনতম শিক্ষা, স্বাস্থ্য

[6] মারজিৎ, সুগত. (২০০৮). *উন্নয়নের যুক্তি তক্কো.* কলকাতাঃ অনুষ্টুপ. পৃঃ ৪৩.

রক্ষার অধিকার ইত্যাদি থাকাকে বোঝায়। এইরকম প্রকৃত উন্নয়নের পটভূমি সৃষ্টি হলে তবেই পরিবেশের প্রতি বা অন্যান্য মনুষ্যেতর প্রাণীর প্রতি আমরা মানুষের সহমর্মিতা আশা করতে পারি। অতএব প্রকৃত উন্নয়ন কি তার একটি ধারণা পাওয়া গেল। যদিও এই ধারণা কোথাও কোথাও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারণাকেই আবার নির্দেশ করে। তাহলে কোন পথে অগ্রসর হলে প্রকৃত উন্নয়নের দিশা আমরা পেতে পারি? পরবর্তী অংশে এই বিষয়ে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনার চেষ্টা করবো।

৫.৬ উন্নয়ন ও কল্যাণমূলক অর্থনীতি

আধুনিক উন্নয়নতত্ত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক অমর্ত্য সেনের অবদান অনস্বীকার্য । মানবিক ও সামাজিক উন্নয়ন নিয়ে তার দৃষ্টিভঙ্গি বারংবার বিশ্বের দরবারে সমাদৃত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো 'কল্যাণমূলক অর্থনীতিতে অবদানের জন্য' (for the contributions to walfare economics) তিনি ১৯৯৮ সালে অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। এই পুরস্কার তাকে দেওয়ার সময় জানানো হয় অধ্যাপক সেনের বিশেষ অবদান রয়েছে কল্যাণমূলক অর্থনীতির মৌলিক সমস্যা গুলি নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে।[7] এছাড়াও তাঁর অবদান রয়েছে মানুষের সামাজিক পছন্দের নির্বাচন, মানুষের কল্যাণের পরিমাপের নির্ধারণ এবং দারিদ্র্যের অধ্যয়নের ক্ষেত্রে। এসব প্রত্যক্ষভাবে তাঁর উন্নয়নতত্ত্বের সঙ্গে যুক্ত, যদিও এ বিষয়ে আমরা পরবর্তীকালে আলোচনা করব। নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের চিন্তা নানা দিকে প্রসারিত হলেও আমার মনে হয়, তাঁর ভাবনার কেন্দ্রে ছিল সমাজের

[7] সেন, রাজকুমার (সম্পাঃ). (১৯৯৯). *অমর্ত্য ভাবনা ২.* কলকাতাঃ রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়. পৃঃ- ৭-১০.

বিভিন্ন স্তরে অসাম্য, তার থেকে উদ্ভূত বৈষম্য এবং তা দূর করে কিভাবে মানবিক উন্নয়ন ঘটানো যায় প্রভৃতি বিষয়। এসবের উপর ভিত্তি করেই তিনি তার কল্যাণমূলক অর্থনীতির তত্ত্বকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন বলা যায়। আমরা সকলেই জানি, অমর্ত্য সেন বিশ্বের একজন শ্রেষ্ঠ অর্থনীতিবীদ হিসেবে পরিচিত। কিন্তু আমরা হয়তো অনেকেই জানিনা দার্শনিক হিসেবেও তার যথেষ্ট খ্যাতি আছে। তাই অর্থনীতির সীমারেখা অতিক্রম করে অন্যান্য সমাজ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, বিশেষভাবে উন্নয়ন বিষয়ক দার্শনিক আলোচনার সূত্রপাত তাঁর লেখার মধ্যে দেখা যায়।[৪] এবার আসা যাক, উন্নয়ন সম্পর্কিত আলোচনায়। প্রথমেই অমর্ত্য সেনকে অনুসরণ করে বলা যায়, আর্থিক বৃদ্ধি বা প্রসার (Economic growth) ও উন্নয়ন (Development) সম্পূর্ণ এক বিষয় নয়।[৯] কিন্তু একথা অবশ্যই মানতে হবে যে, আর্থিক প্রসার (Economic growth) হলো অর্থনৈতিক উন্নয়ন (Economic development) প্রক্রিয়ারই একটি দিক। সাবেকি উন্নয়নতত্ত্বে এই আর্থিক প্রসারের ওপরই অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কেবলমাত্র আয় বা সম্পদের বৃদ্ধিকেই মূল উদ্দেশ্য হিসেবে বিবেচনা করা যথার্থ হবেনা। বিখ্যাত দার্শনিক অ্যারিস্টটলের মতে, সম্পদ কেবলমাত্র অন্য কোনো উদ্দেশ্যের জন্য উপযোগী। এই প্রসঙ্গে অ্যারিস্টটল তাঁর বিখ্যাত বই *The Nicomachean Ethics*-এর শুরুতেই আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন মানুষের প্রতিটি শিল্পকলা (Art) এবং প্রতিটি অনুসন্ধান তথা প্রতিটি কাজ ও তৎপরতা কোনো না কোনো ভালো উদ্দেশ্য নিয়ে করা হয়ে থাকে বলে মনে করা হয়। আমাদের প্রতিটি কাজই কোন না

[৪] মারজিৎ, সুগত. (২০০৮). *উন্নয়নের যুক্তি তক্কো.* কলকাতাঃ অনুষ্টুপ. পৃঃ ২১১.

[৯] Sen, Amartya. (1983). "Development: Which why now?". *Economic Journal.* Vol- 93. Pg- 748.

কোন উদ্দেশ্য নিয়ে করা হয়ে থাকে। কিন্তু এই উদ্দেশ্য সমূহের মধ্যেও এক ধরনের পার্থক্য দেখা যায়। কিছু হল আমাদের কার্যকলাপ এবং কিছু হল কার্যকলাপের মাধ্যমে সৃষ্ট কিছু, যা কিনা উদ্দেশ্য হয়ে পড়ে। যেমন- চিকিৎসাবিদ্যার উদ্দেশ্য হল স্বাস্থ্যরক্ষা, জয়লাভ করা হল যুদ্ধবিদ্যার উদ্দেশ্য প্রভৃতি। অন্যভাবে দেখলে; ঔষধ দেওয়া, শল্য চিকিৎসা করা, রোগীর সেবা প্রভৃতি সবই চিকিৎসাবিদ্যার অন্তর্গত। একইভাবে আমাদের প্রতিটি ক্রিয়া-কলাপ সর্বদাই কোন না কোন উচ্চতম ক্রিয়াকলাপকে উদ্দেশ্য রূপে স্বীকার করে নেয়। যদি এমন হয় যে আমরা যা কিছুই করি তার যেকোনো একটি উদ্দেশ্য আছে, যে উদ্দেশ্যকে আমরা শুধুমাত্র সেটা অর্জনের জন্যই কামনা করে থাকি- তবে আমরা বলতে পারি যে, অন্য সকল কিছুই কামনা করা হয় শুধুমাত্র এই উচ্চতম উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করার জন্য। কিন্তু বিষয়বস্তু সম্পর্কে যতটুকু জানা সম্ভব তার চেয়ে অধিক স্পষ্টতা আশা করা উচিত নয়। আর 'ভালো' বলতে কী বোঝায়?- এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করে ক্রম পরিবর্তিত মতের উদ্ভব বিভিন্ন সময়ে ঘটেছে। অ্যারিস্টটল এখানে আরো দেখিয়েছেন যে, সম্পদকে আরো ভালো মনে করাতে বহু ব্যক্তির বিভিন্ন সময়ে ক্ষতি হয়েছে এবং সম্পদের কারণে বহু মানুষের চরম সর্বনাশ ঘটেছে। তবে একথা সাধারণভাবে গৃহীত হয় যে 'সুখী অবস্থা' ভালো; কিন্তু 'সুখ' বলতে কী বোঝায় তা নিয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি আছে। বেশিরভাগ মানুষ যে ধরনের জীবনযাপন করে তার থেকে মনে হয় যেন তারা ভালোকে এবং সুখকে আনন্দের (Pleasure) সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে করে, সেটিই হল তাদের জন্য উপভোগের এবং জীবনের প্রতি আকর্ষণের মূল কারণ। তাই অ্যারিস্টটল এই পুস্তকে দেখিয়েছেন তিন ধরনের জীবন আছে। এগুলি হল; উপভোগের জীবন (the life of enjoyment), রাজনৈতিক জীবন (the

political life) এবং তৃতীয়টি হল বিচার-বিবেচনার জীবন (the contemplative life)।[10] যদিও এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা খুবই চিত্তাকর্ষক, তথাপি আমার গবেষণার বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় বলে এখানে অ্যারিস্টটলকে অনুসরণ করে এই তিন প্রকার জীবনের আলোচনা থেকে বিরত থাকলাম। যদিও বর্তমান অধ্যায়ের আলোচনা প্রসঙ্গে যা সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক অর্থাৎ সম্পদ কেবলমাত্র অন্য কোনও উদ্দেশ্যের জন্য উপযোগী- যে বিষয়টি প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে। এসম্পর্কে অ্যারিস্টটল তাঁর *The Nicomachean Ethics*-এ এভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, অর্থোপার্জনের জীবনের (the life of money making) বিষয়টি কেউ বাধ্য হয়ে মেনে নিতে পারে, কিন্তু স্বেচ্ছায় এই বিষয়টি কেউ নির্বাচন করেনা। তাছাড়া আমরা যে 'ভালোর' অনুসন্ধান করছি সম্পদ কখনোই সেটির পক্ষে মঙ্গলজনক নয়, কারণ সম্পদ কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় অন্য কোন কিছুর জন্য উপযোগী। কেউ এই সম্পদ বা অর্থকে লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য বলে মনে করতে পারে, কারণ সেগুলো তাদের কাছে ভালো বলে মনে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই সম্পদ বা অর্থ কখনোই লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য হতে পারেনা বলে অ্যারিস্টোটল দাবি করেছেন।[11] তাই আমরা অ্যারিস্টটলকে অনুসরণ করে বলতে পারি ঐশ্বর্যলাভ মানুষের লক্ষ্যবস্তু নয়, এটি কেবলমাত্র প্রয়োজনে এবং আরও অন্য কোন কাজে কেবল লাগতে পারে মাত্র।

---

[10] Aristotle. (2004). *The Nicomachean Ethics*. Tredennick, Hugh (Ed.). U.S: Penguin Publishing Group. Pg- 2-6.

[11] Aristotle. (2004). The Nicomachean Ethics. Tredennick, Hugh (Ed.). U.S: Penguin Publishing Group. Page- 6.

জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট তাঁর Groundwork of the Metaphysics of Morals গ্রন্থে তাঁর নৈতিক দর্শন এর আলোচনার সময় মানুষকে অন্য কোন লক্ষ্যবস্তুকে প্রাপ্তির উপায় হিসেবে নির্বাচন করার পরিবর্তে মানুষকেই লক্ষ্য হিসাবে দেখতে বলেছেন। কান্টের মতে, কোন মানুষকে নিজের উদ্দেশ্য সাধনের উপায় হিসেবে ব্যবহার করা উচিত নয়। প্রত্যেক মানুষই স্বাধীন এবং প্রত্যেকের সমান মূল্য আছে; তাই প্রত্যেককেই তাঁর প্রাপ্য মর্যাদা দিতে হবে। অপরের স্বাধীন ব্যক্তিত্বে হস্তক্ষেপ করার অধিকার কারও নেই। সুতরাং কান্টের মতে, প্রত্যেক মানুষকে উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যরূপে গণ্য করতে হবে।[12]

অমর্ত্য সেন মনে করেন দারিদ্র, উন্নয়ন, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা গঠন- এই সকল ক্ষেত্রেই কান্টের চিন্তাধারাটি গুরুত্বপূর্ণ। মানুষ একদিকে যেমন অগ্রগতির ধারক ও বাহক তেমনি অগ্রগতির একমাত্র সুফলভোগী প্রজাতি। একইসঙ্গে অগ্রগতিকে মূল্যায়নের বা বিচারের দায়ভারও মানুষের উপরেই ন্যস্ত। কিন্তু অন্য দিক থেকে দেখতে গেলে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মানুষই সমস্ত উৎপাদনের প্রাথমিক মাধ্যম বা উপায়। অর্থাৎ মানুষ হল চিরাচরিত উন্নয়নতত্ত্বে একদিক থেকে লক্ষ্য এবং অন্যদিক থেকে উপায়। মানুষের এই দ্বৈত ভূমিকা যেখানে মানুষকে কখনো লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যরূপে এবং কখনো লক্ষ্য পূরণের উপায় হিসেবে দেখা হয়েছে- সেখানেই যে কোন নীতি নির্ধারণ করতে বা উন্নয়নমূলক কোন পরিকল্পনা তৈরি করার ক্ষেত্রে মূল বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। এটি নিঃসন্দেহে স্বীকার্য যে উন্নয়নের জন্য উৎপাদন বৃদ্ধি এবং আর্থিক সমৃদ্ধি একান্তভাবেই জরুরি; তাই চিরাচরিত উন্নয়ন তত্ত্বের ধারণাকে বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে

[12] সরকার, প্রহ্লাদ কুমার (সম্পা.). (১৯৯৭). *কান্টের দর্শন.* কলকাতা: পরিবেশক প্রেস.পৃঃ ১৪৬.

মানুষকে উন্নয়নের মাধ্যম (means) হিসেবে দেখাটা রীতি হয়ে গেছে। এক্ষেত্রে মানুষের জীবনকে লক্ষ্য রূপে দেখা হয়নি। কিন্তু অমর্ত্য সেন মনে করেন; মানুষের আয়ের বৃদ্ধি এবং আর্থিক প্রসার (economic growth) উন্নয়নের একটি বৈশিষ্ট্য মাত্র। আর্থিক প্রসার বা মানুষের আয় বৃদ্ধিকে যে কোনো উন্নয়নমূলক পরিকল্পনায় প্রধান গুরুত্ব দেয়া হয়। কিন্তু একথা আমরা ভুলে যাই আর্থিক সমৃদ্ধির কোন নিজস্ব মূল্য নেই, অন্য কোনো লক্ষ্য পূরণের উপায় হিসাবে আর্থিক সমৃদ্ধি মূল্যবান। আর্থিক সমৃদ্ধিকে (Economic prosperity) অবশ্যই উন্নয়ন পরিকল্পনার একটি লক্ষ্য হিসেবে নির্বাচন করা উচিত বললেও তা কেবলমাত্র একটি মধ্যবর্তী লক্ষ্য বা প্রধান লক্ষ্যকে অর্জন করার উপায় বলা যেতে পারে।

মানবিক উন্নয়ন ও আর্থিক সমৃদ্ধির মধ্যে যদি সাযুজ্যতার (one to one correspondence) সম্বন্ধ থাকে তবে আমাদের ব্যবহারিক দৃষ্টিতে মানুষের জীবনকে সর্বাঙ্গীনভাবে সমৃদ্ধ করা (যাকে মানবিক উন্নয়ন বলে থাকি) ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিকে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত হতে নিশ্চয়ই দেখতাম; কিন্তু যেহেতু তা আমরা দেখি না তাই আর্থিক সমৃদ্ধি কখনোই জীবনের লক্ষ্য হতে পারে না। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি কেবল মানবিক উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি উপায় হতে পারে। সেই কারণেই অনেক দেশের স্থূল জাতীয় উৎপাদন (Gross National Product/GNP) যা আর্থিক সমৃদ্ধির সূচক, বেশি হওয়া সত্ত্বেও সেই দেশের জনগণের অকাল মৃত্যু রোধ, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, স্বাস্থ্যপরিষেবা উন্নতি করে মানুষের অসুস্থতার হ্রাস প্রভৃতি যা মানবিক উন্নয়নের মূল সোপান- তা করতে আজও ব্যর্থ হচ্ছে। নিজের বক্তব্যের সমর্থনে অমর্ত্য সেন যুক্তিও প্রদান করেছেন। তিনি সাতটি দেশের মাথাপিছু GNP (per capita) এবং সেই সকল দেশের

নাগরিকদের জন্মের সময় প্রত্যাশিত আয়ুর পরিসংখ্যান দিয়েছেন। ১৯৯৪ সালে বিশ্বব্যাঙ্কের World Development Report- অনুসারে, ডক্টর সেন বোঝাতে চেয়েছেন একটি দেশ অর্থনৈতিক দিক থেকে চিরাচরিত দৃষ্টিভঙ্গিতে (মাথাপিছু GNP হিসাবে) খুবই ধনী হলেও মানবিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে (মানবিক উন্নয়নের অন্যতম একটি দিক বা বৈশিষ্ট্য হলো জন্মের সময় প্রত্যাশিত আয়ু) সেই দেশ অনেক পিছিয়ে আছে। সাউথ আফ্রিকা মাথাপিছু GNP-এর দিক থেকে চীন বা শ্রীলঙ্কা থেকে অনেকগুণ এগিয়ে থাকলেও জন্মের সময় প্রত্যাশিত আয়ু সাউথ আফ্রিকার চেয়ে চীন বা শ্রীলঙ্কার অনেক বেশি। পরিসংখ্যানে প্রদত্ত বাকি দেশগুলির ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। এর থেকে প্রমাণিত হয় অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ঘটলেই মানুষের উন্নয়ন ঘটানো যায় না। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি মানুষের জীবনের সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের একটি মাধ্যম মাত্র।[13]

উন্নয়ন তত্ত্বের আলোচনায় অর্থনৈতিক উন্নয়ন তত্ত্বের অনুসন্ধান খুব বেশিদিন শুরু হয়নি। অর্থনীতির একটি উপবিষয় হিসাবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন তত্ত্বের সূচনা মাত্র কিছু বছর পূর্বেই হয়েছে।[14] অন্যদিকে উন্নয়ন তত্ত্বের ইতিহাস মানুষের সভ্যতা যতদিনের প্রায় ততটাই প্রাচীন। পশ্চিমের সভ্যতাগুলির মধ্যে গ্রিক-রোমান সভ্যতাতে এই উন্নয়নতত্ত্বের ধারণা লাভ করতে দেখা গিয়েছিল। যদিও আমি পরবর্তীকালে আমার বক্তব্যে উন্নয়নতত্ত্বের ইতিহাস আলোচনার সময় এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। যাইহোক সাবেকি উন্নয়নতত্ত্বে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে জাতীয় উৎপাদন, গড় আয় ও বিশেষ পণ্যের মোট যোগানের উপর এবং সম্ভবত এই বিষয়গুলোতে অত্যধিক

---

[13] সেন, অমর্ত্য. (২০১১). *উন্নয়ন ও স্বক্ষমতা.* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স. পৃঃ ৫৫.

[14] Sen, Amartya. (1983). Development: Which Way Now?. *The Economic Journal.* Vol-93. Issue-372. December. Page- 745-762.

গুরুত্ব দেওয়াই সাবেকি উন্নয়নতত্ত্বের প্রধান ত্রুটি।[15] ডক্টর সেন মনে করেন, সাবেকি অর্থনৈতিক উন্নয়নতত্ত্বের মূল সমস্যা কখনোই আর্থিক প্রসারের লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার পথের অনুসন্ধান নয়; মূল সমস্যা ছিল একথা ভুলে যাওয়া আর্থিক প্রসার অন্য কোন লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার উপায় মাত্র। আয় বৃদ্ধি অবশ্যই প্রয়োজন, কারণ আয় বৃদ্ধির সঙ্গে অন্যান্য অর্থনৈতিক সুবিধা এসে পড়ে। কিন্তু এই বিষয়টি মনে রাখতে হবে আর্থিক প্রসার ও উন্নয়ন এক বিষয় নয়।[16] সাবেকি অর্থনৈতিক উন্নয়নতত্ত্বে জাতীয় উৎপাদন, গড় ও মোট আয়- এইসব বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হলেও মানুষের 'স্বত্বাধিকার' ও স্বত্বাধিকার থেকে প্রাপ্ত 'সক্ষমতার' উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। উন্নয়নতত্ত্বের প্রক্রিয়ার লক্ষ্য হওয়া উচিত মানুষ কি করতে পারছে এবং কি করতে পারছেনা সেই দিকে গুরুত্ব দেওয়া। যেমন- মানুষের দীর্ঘ জীবন প্রাপ্তি, অকাল মৃত্যু রোধ, যথেষ্ট পুষ্টিকর খাদ্যের প্রাপ্তি, শিক্ষার অধিকার পাওয়া বা লিখতে-পড়তে পারা, সমাজে মেলামেশা ও ভাব বিনিময়ের সুযোগ পাওয়া, সাক্ষরতায় ও বৈজ্ঞানিক গবেষণায় মানুষের অংশগ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ে উন্নয়ন তাত্ত্বিকদের প্রধান বিবেচ্য হওয়া উচিত।[17] সমাজের মানুষের কিছু অধিকার যেমন থাকে তেমনি কিছু সুযোগ মানুষের কাছে থাকে। এইসব অধিকার ও সুযোগ কাজে লাগিয়ে মানুষ বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রী থেকে

[15] Ibid.

[16] Ibid.

[17] Sen, Amartya. (1983). Development: Which Way Now?. *The Economic Journal.* Vol-93. Issue-372. December. Page- 745-762.

নিজের পছন্দ অনুসারে দ্রব্য নির্বাচন করতে পারে এবং তাকে উপভোগ করতে পারে। একেই স্বত্বাধিকার[18] হিসাবে ডক্টর সেন বোঝাতে চেয়েছেন।

তাঁর মতে, উপরে আলোচিত সমস্ত ধারণার সঙ্গে অর্থাৎ উন্নয়ন প্রক্রিয়া সঙ্গে স্বাধীনতার গভীর সম্পর্ক রয়েছে। সমাজে বসবাসকারী মানুষের স্বাধীনতা বৃদ্ধির জন্য জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি বা মাথাপিছু ব্যক্তিগত উপার্জন বৃদ্ধি যে প্রয়োজন- তা ডক্টর সেন কখনই অস্বীকার করেননি। কিন্তু শুধুমাত্র জাতীয় উৎপাদনের প্রসার, ব্যক্তিগত উপার্জন বৃদ্ধি, শিল্পের বিকাশ, প্রযুক্তিবিদ্যার আধুনিকীকরণ, সামাজিক আধুনিকীকরণ প্রভৃতি ক্ষেত্রগুলিতে যদি মানুষের স্বাধীনতাকে গুরুত্ব দেয়া হয় তবে উন্নয়নকে সংকীর্ণ দৃষ্টিতে বোঝানো হবে। স্বাধীনতা আরো অনেক কিছুর ওপরে নির্ধারিত হয়। যেমন সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অন্তর্গত অনেক উদাহরন দেওয়া যেতে পারে। শিক্ষার সুযোগ, স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা প্রভৃতি; রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার (যথা- প্রকাশ্যে জনসাধারণের আলোচনার অধিকার, যেকোনো বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করার অধিকার)। এছাড়া উন্নয়নের জন্য স্বাধীনতাহীনতার প্রধান উৎসগুলো নির্মূল করা দরকার। যেমন- দারিদ্র্য ও অত্যাচার, অর্থনৈতিক সুযোগের অভাব এবং এর ফলে প্রতিনিয়ত সামাজিক বঞ্চনা, জনসাধারণের সুযোগ-সুবিধাকে গুরুত্ব না দেওয়া, অসহিষ্ণুতা বা রাষ্ট্রের উদ্ধত কার্যকলাপ প্রভৃতি সবই স্বাধীনতাহীনতার অন্তর্গত। সেকারণেই সম্পদের প্রভূত বৃদ্ধির পরেও জগতের অধিকাংশ মানুষ আজও মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। কখনো মানুষ অর্থনৈতিক দারিদ্র্যের জন্য দু-বেলা খাদ্যটুকু

[18] সেন, অমর্ত্য. (১৪২৪ বং). *অর্থনীতি গ্রন্থমালা ৭.* "জীবনযাত্রা ও অর্থনীতি". কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স. পৃঃ ২৩.

পায়না বা প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর খাদ্য থেকে বঞ্চিত থাকে, আবার কখনো দুরারোগ্য ব্যাধি হলে চিকিৎসার সুযোগ পায় না বা বিশুদ্ধ পানীয় জল কখনো তারা পায়না প্রভৃতি। অন্যদিকে স্বাধীনতাহীনতার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত জনসাধারণের সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হওয়া বা মানুষের সমাজ সেবা থেকে বঞ্চিত হওয়া। যেমন- মহামারী দূরীকরণ কার্যকলাপ বা স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা না করা, শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি না করা, আঞ্চলিক শান্তি শৃঙ্খলার অভাব প্রভৃতি।[19] এই সমস্ত কিছু একদিকে যেমন মানুষের স্বাধীনতা হরণ করে, তেমনভাবেই উন্নয়নের প্রক্রিয়াকেও স্তব্ধ করে দেয়। তাই ডক্টর সেন যথার্থই বলেছেন, উন্নয়নের লক্ষ্যই হল স্বাধীনতাহীনতার প্রধান উৎসগুলিকে নির্মূল করা।[20]

পৃথিবীর বহু মানুষ বিভিন্নভাবে আজও স্বাধীনতাহীনতার শিকার। আজও পুষ্টিকর খাদ্য পাওয়ার স্বাধীনতা, নূন্যতম শিক্ষার স্বাধীনতা, শিক্ষান্তে কাজ পাওয়ার স্বাধীনতা থেকে পৃথিবীর বেশিরভাগ মানুষ আজও বঞ্চিত। আর দূরারোগ্য ব্যাধি বা মহামারীর সময়ে নিম্নতম স্বাস্থ্য পরিষেবা পাওয়া ভারত বা ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশের জনগণের কাছে স্বপ্ন সমতুল্য তা সাম্প্রতিক মহামারীর সময়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ, স্বাস্থ্যপরিষেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রেও পৃথিবীর বেশিরভাগ মানুষ যে স্বাস্থ্যহীনতার শিকার তা মানতে বর্তমানে কোন বাধা নেই। তাই অমর্ত্য সেন যথার্থই বলেছেন, "Freedoms are not only the primary ends of development, they are also among its principal means"।[21] অর্থাৎ উন্নয়নের মূল উদ্দেশ্য

[19] Sen, Amartya. (2001). *Development as freedom*. Oxford: OUP Oxford. Pg- 3-4.

[20] Ibid.

[21] Sen, Amartya. (2001). *Development as freedom*. Oxford: OUP Oxford. Pg- 10.

কেবল স্বাধীনতা নয়, স্বাধীনতা উন্নয়নের প্রধান মাধ্যমও বটে। স্বাধীনতার উপাদানগুলি ব্যক্তিভেদে বিভিন্ন প্রকার এবং উন্নয়নকে যদি স্বাধীনতার পরিপ্রেক্ষিতে বুঝতে হয় তবে উন্নয়নের বিভিন্ন প্রক্রিয়াকেও বুঝতে হবে। আমি এখানে অমর্ত্য সেন প্রদত্ত উন্নয়নের প্রক্রিয়া সম্বন্ধে দুটি মত উল্লেখ করব। প্রথম দৃষ্টিভঙ্গি উন্নয়নকে একটি "ভয়াবহ" প্রক্রিয়া হিসেবে দেখায়, যেখানে অনেক "রক্ত, ঘর্ম ও অশ্রু সমন্বিত এমন একটি পৃথিবীর কথা বলা হয়েছে যেখানে জ্ঞানের সঙ্গে কঠোরতা প্রয়োজন"। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করলে বিভিন্ন তথাকথিত দুর্বল দাবিগুলোকে সুচিন্তিতভাবে উপেক্ষা করা প্রয়োজন। যেমন- অতি দরিদ্রদের সুরক্ষার জন্য সামাজিক ব্যবস্থা, জনসাধারণের কল্যাণের জন্য সামাজিক পরিষেবা, দ্রুত রাজনৈতিক বা নাগরিক অধিকার প্রদান প্রভৃতি উন্নয়ন ফলপ্রসূ হলে তবে সমর্থনযোগ্য বলে এই উন্নয়নের সমর্থকরা মনে করতেন। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে উন্নয়নের জন্য কঠোর নিয়ম শৃঙ্খলা প্রয়োজন।

উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীতে উন্নয়নের এমন একটি দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গি আছে যা উন্নয়নকে মূলত 'বন্ধুত্বপূর্ণ' প্রক্রিয়া হিসেবে দেখায়। এই উন্নয়নের প্রক্রিয়ায় সামাজিক নিরাপত্তা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা, সামাজিক অগ্রগতি প্রভৃতিকে গুরুত্ব সহকারে দেখা হয়। অমর্ত্য সেন মূলত দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গির উপর অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন।[22] মানুষের জীবনযাত্রাকে আরো সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে স্বাধীনতাকে প্রাধান্য দেওয়াই এই উন্নয়নের মূল উদ্দেশ্য। খাদ্যাভাব, পুষ্টির অভাব, পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য পরিষেবার অভাব, অকালমৃত্যু প্রভৃতি দূরীকরণ যেমন স্বাধীনতার অংশ; তেমনি সাক্ষরতা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং অন্যান্য মৌলিক স্বাধীনতার প্রসার উন্নয়নের

[22] Ibid. Pg- 35.

সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে উন্নয়ন বলতে মানুষের স্বাধীনতার সর্বাঙ্গীণ প্রসারকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। উন্নয়নের এই প্রক্রিয়ায় ব্যক্তি স্বাধীনতাও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ব্যক্তির স্বাধীনতা পেতে ও তার বিকাশ ঘটাতে যেমন স্বাধীনতা, সহিষ্ণুতা, সামাজিক নিরাপত্তা প্রয়োজন; তেমনি সকল সুযোগ-সুবিধা প্রয়োজনীয় ভাবে থাকার ক্ষেত্রে জনগণের সমর্থনও দরকার। যেমন- প্রাথমিক স্বাস্থ্যব্যবস্থা, নূন্যতম শিক্ষার সুযোগ প্রভৃতিকে কার্যে পরিণত করার ক্ষেত্রে মানুষের সমর্থন বিশেষভাবে দরকার।

পূর্বের আলোচনায় আমরা দেখলাম উন্নয়নের জন্য স্বাধীনতাকে প্রাধান্য দিতে হয়। স্বাধীনতার ক্ষেত্রে অন্যতম হল ব্যক্তি স্বাধীনতা বা ব্যক্তির প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা। মানুষের সুযোগ-সুবিধার বিচার করা হয় তার সক্ষমতার ওপর নির্ভর করে, অর্থাৎ উন্নয়নের সঙ্গে সক্ষমতার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক আছে বলে অধ্যাপক সেন মনে করেন। সক্ষমতা (capability) বলতে কোন ব্যক্তির এক ধরনের ক্রিয়াকর্মের সমষ্টির মধ্যে থেকে যে কোনো বিকল্পকে বেছে নেওয়ার ক্ষমতাকে বোঝায়। উন্নয়নের কল্যাণমূলক আলোচনার ক্ষেত্রে কেবল স্বাধীনতা অর্জনই মানুষের লক্ষ্য নয়, মানুষের প্রকৃত লক্ষ্য হল এমন সক্ষমতা অর্জন করা যার দ্বারা মানুষ যে কোনো বিকল্পকে কার্যকরীভাবে বেছে নিতে পারে। মানুষ জীবনে কতোটা সুযোগ-সুবিধার স্বাধীনতা ভোগ করছে তার মূল্যায়ন করতে হলে পরীক্ষা করতে হবে মানুষ কি ধরনের ক্রিয়াকলাপ (functioning) করতে সমর্থ; অর্থাৎ মানুষের ক্রিয়াকলাপের দ্বারাই তার সক্ষমতার (capability) প্রকাশ ঘটে যদিও এ দু'টির মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। মানুষের ক্রিয়াকলাপ-এর দ্বারা একটি সুফল প্রাপ্তি ঘটে এবং সেই সুফল প্রাপ্তির ফলে যে ক্ষমতা অর্জিত হয় তাই হল সক্ষমতা। সক্ষমতার ধারণা হল স্বাধীনতার বিভিন্ন

প্রকার ধারণা অর্থাৎ ব্যক্তির জীবনে প্রকৃত যে সুযোগ আছে তাকেই সক্ষমতা বলে। একটি উদাহরণ দিয়ে সক্ষমতাকে বোঝানো যেতে পারে; ধরা যাক, কোন ব্যক্তি S সেটের মধ্যে থাকা সদস্যদের থেকে a,b,c,d কে বেছে নিতে পারে। কিন্তু সেই ব্যক্তি বেছে নিল 'a'। অন্যদিকে এমন হতে পারে অন্য কোনো ব্যক্তির b,c,d সদস্যদের বাছাই করার কোন সুযোগ নেই। সেক্ষেত্রে দ্বিতীয় ব্যাক্তিটিও 'a'- কেই বেছে নিল। এখন দ্বিতীয় ব্যাক্তিটি ভাবতে পারে সে তো 'a' কেই বেছে নিত, তাই তার জীবনযাত্রার মান বদলে যায়নি। কিন্তু এক্ষেত্রে দ্বিতীয় ব্যাক্তিটির b,c,d কে বেছে নেওয়ার কোনো সুযোগ ছিল না, অতএব তার স্বাধীনতার সংকোচন ঘটেছে। প্রকৃত জীবনযাপন বা স্বাধীনতার নিরিখে উন্নয়নকে বিচার করতে গেলে অন্যান্য পথের সুযোগ কতটা আছে তার মূল্য অস্বীকার করলে চলবে না; অর্থাৎ বাঞ্ছনীয় নানা বিষয়ের মধ্যে থেকে যে কোনো কিছুকে করতে পারার সামর্থ্যকেই সক্ষমতা (capability) বলা হয়।[23] আরো একটি বাস্তব উদাহরণ ডক্টর অমর্ত্য সেনকে অনুসরণ করে দেওয়া যেতে পারে, মনে করা যাক কোন ব্যক্তি উপবাস করছে। এরফলে সে স্পষ্টতই অনাহারে আছে। কিন্তু এক্ষেত্রে আহার না করার পছন্দ তার সক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত থাকে। অন্যদিকে ধরে নেওয়া যাক অপর এক ব্যক্তিও অনাহারে আছে, কারণ সে খুব দরিদ্র এবং অনাহার ছাড়া তার কাছে আর কোন বিকল্প নেই। এক্ষেত্রে প্রথম ব্যক্তির কাছে খাদ্য গ্রহণের বিকল্প ছিল, সেখান থেকে সে স্বেচ্ছায় অনাহারে থাকার বিকল্পকে বেছে নিয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তিটির খাদ্য গ্রহণের বিকল্প নির্বাচনের সুযোগ ছিল না, কারণ সে দরিদ্র। তাই প্রথম ব্যক্তির এক্ষেত্রে সক্ষমতা থাকলেও দ্বিতীয় ব্যক্তির সক্ষমতা

[23] সেন, অমর্ত্য. (১৪২৪ বং). *অর্থনীতি গ্রন্থমালা ৭.* "জীবনযাত্রা ও অর্থনীতি". কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স. পৃঃ ৭৯-৮০।

আছে বলা যায় না। মানুষের যে কাজকর্ম করার সম্ভাবনা রয়েছে, তা সেই মানুষের সক্ষমতা।[24]

প্রকৃতপক্ষে ডঃ অমর্ত্য সেন স্বত্বাধিকার (Entitlement) এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির দৃষ্টিভঙ্গিতে বিকাশের সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছিলেন। কোন সমাজে একটি মানুষের কিছু অধিকার আছে, তার সামনে কিছু সুযোগ আছে। এসব অধিকার ও সুযোগ দ্বারা মানুষ কিছু দ্রব্য উপভোগ করতে পারে এবং বিভিন্ন দ্রব্যসমূহ থেকে নিজের পছন্দ অনুসারে কিছু দ্রব্যসমূহ বেছে নিতে পারে। এই পছন্দ অনুসারে বেছে নিতে পারা দ্রব্যগুলিকেই স্বত্বাধিকার বলা যায়। যেমন- ধরা যাক কোন ব্যক্তি তার শ্রম ও অন্যান্য বিক্রয়যোগ্য দ্রব্য বিক্রি করে ৫০০০ টাকা অর্জন করতে পারে। সুতরাং ৫০০০ টাকা বা তার চেয়ে কম মূল্যের যে কোনো দ্রব্যসমূহ সেই ব্যক্তির স্বত্বাধিকারের অন্তর্ভুক্ত। এই স্বত্বাধিকারের ভিত্তিতে ব্যক্তি কিছু করার সক্ষমতা অর্জন করে এবং কিছু সক্ষমতা অর্জনে অসফল হয়। সক্ষমতার দ্বারা কোনো ব্যক্তি কি করতে পারে এবং কি করতে পারে না তা নির্ধারিত হয়। স্বাধীনতার ওপরও সক্ষমতা অনেকাংশে নির্ভরশীল। ক্ষুধা থেকে মুক্তি পাওয়ার স্বাধীনতা, রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার স্বাধীনতা, স্বাস্থ্য পরিষেবা ও শিক্ষা পাওয়ার স্বাধীনতা প্রভৃতিও এক-এক ধরনের সক্ষমতার প্রকাশ। এই প্রসঙ্গে এটি মনে রাখা আবশ্যক যে সক্ষমতা কোন ব্যক্তির স্বত্বাধিকারের (Entitlement) দ্বারা একটি সমাজের অভ্যন্তরে উৎপন্ন হয়। তাই ব্যক্তির সক্ষমতা (capability) কেবল আয়ের উপরই নির্ভরশীল নয়, বরং সেই ব্যক্তি কত পরিমাণ

[24] সেন, অমর্ত্য. (১৪২৪ বং). *অর্থনীতি গ্রন্থমালা ৭.* "জীবনযাত্রা ও অর্থনীতি". কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স. পৃঃ ৮০.

অধিকার ও সুযোগ পাচ্ছে তার ওপরই নির্ভর করে। একটি সমাজে মানুষের সক্ষমতা ও স্বত্বাধিকার যত বেশি হবে, সেই সমাজে উন্নয়ন তত বেশি ত্বরান্বিত হবে।

ডক্টর সেনের মতে, উন্নয়ন হলো সক্ষমতা বৃদ্ধির দ্বারা জীবনের গুণগত মানের বিশ্লেষণ। মানুষের কাজের মাধ্যমেই তার সক্ষমতা বৃদ্ধি ঘটে। একটি ভালো জীবন যাপনের জন্য ব্যক্তির কাজকর্ম (functioning) করা প্রয়োজনীয়। সক্ষমতা কোন ব্যক্তির দ্বারা অর্জনযোগ্য ক্রিয়াকলাপের সংমিশ্রণকে বোঝায়।[25] মানুষের উন্নয়ন বলতে সামাজিক সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির দ্বারা মানুষের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জনগণের জীবনযাত্রার গুণগত মানের উন্নয়নকে বোঝায়। স্বাস্থ্য পরিষেবা পাওয়ার সুযোগ, শিক্ষা, সামাজিক নিরাপত্তা ও অধিকার প্রভৃতি ক্ষেত্রে উন্নতি করলে মানুষের জীবনের গুণগত মানের উন্নতি ঘটে। এমন অনেক নিদর্শন আছে যেখানে অপেক্ষাকৃত নিম্ন আয়ের অর্জনকারী দেশ যদি স্বাস্থ্যের ও শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেয় তাহলে সমগ্র দেশের মানুষের জীবনের গুণগত মানের বৃদ্ধি ঘটে। মানুষের উন্নয়নের যাত্রায় প্রত্যক্ষভাবে যেমন মানুষের জীবনযাত্রার গুণগত মানের উন্নতি ঘটে, তেমনি মানুষ তার উৎপাদন ক্ষমতাকে বাড়িয়ে অর্থনৈতিক উন্নতিকেও ত্বরান্বিত করে। শিক্ষার বিস্তার ও সংখ্যার জ্ঞান মানুষকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত করতে সহায়ক হয়। শিক্ষিত শ্রমিকের (skilled labour) দ্বারা উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মান আরো ভালো হয়। এছাড়া এমন উদাহরন আছে যেখানে শিক্ষা, উন্নত স্বাস্থ্যব্যবস্থা পাওয়ার সুযোগ, পর্যাপ্ত পুষ্টি

[25] Navarro, Vicente. (2000). Development and Quality of Life a Critique of Amartya Sen's "Development as Freedom. *International Journal of Health Services.* Vol-30. No-4. Page- 661-674.

প্রভৃতি শ্রমিককে আরো উৎপাদনশীল ও কর্মক্ষম করে তুলতে সাহায্য করে।[26] উন্নয়নের ক্ষেত্রে নারী জাতির উন্নয়নের প্রসঙ্গটি খুবই প্রাসঙ্গিক। নারীশিক্ষা মেয়েদের অধিক প্রজনন হারের কুফলগুলি বোঝাতে বিশেষভাবে কার্যকরী। কম বয়সী মেয়েদের ক্ষেত্রে বারংবার প্রসব ও সারাক্ষণ সন্তান পালন তাদের স্বাধীনতা ও সক্ষমতাকে সীমিত করে। তাই নারীজাতির শিক্ষা, বাইরে কর্মসংস্থান ইত্যাদি ঘটলে তাদের সক্ষমতার বৃদ্ধি ঘটে। মেয়েদের সক্ষমতার বৃদ্ধি ঘটলেই তারা নিজের শিক্ষার দ্বারা ও সক্ষমতার সম্প্রসারণ করে প্রজনন হার কমাবে এবং পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তেও অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে বলে ডক্টর সেন মনে করেন।[27] নারীজাতির রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ ও নেতৃত্ব প্রদান উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে আরো সাফল্যমন্ডিত ও সুদূরপ্রসারী করবে। এইভাবে নারী জাতির স্বাধীনতার প্রেক্ষিতেও ডক্টর সেন উন্নয়নকে ব্যাখ্যা করেছিলেন।

পরিশেষে ডক্টর সেনের উন্নয়ন সম্পর্কিত ধারণা প্রসঙ্গে বলা যায়, জনগণের সক্ষমতার বিকাশকেই তিনি উন্নয়ন বলেছেন। মানুষের সক্ষমতা নির্ভর করে তার স্বত্বাধিকারের উপর অর্থাৎ কি পরিমাণ পণ্য সামগ্রী বা সেবা সামগ্রীর ওপর তার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার উপর। মোট জাতীয় উৎপাদন, আয় বৃদ্ধি প্রভৃতি দ্বারা দেশের উন্নয়নকে বিচার করলে মানুষের অনাহার, ক্ষুধা ও বঞ্চনার চিত্রটা পরিষ্কার হয়না। কারণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন উন্নয়নের একমাত্র সোপান নয়। স্বত্বাধিকার নির্ধারণ ব্যবস্থা, সেই ব্যবস্থায় বিভিন্ন পেশায় যুক্ত মানুষের অবস্থা বিচার, সক্ষমতা বৃদ্ধি ও

---

[26] সেন, অমর্ত্য. (২০১১). *উন্নয়ন ও স্বক্ষমতা.* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স. পৃঃ ১৪৫.

[27] তদেব.

সক্ষমতার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত স্বাধীনতার বৃদ্ধির দ্বারাই প্রকৃত উন্নয়ন ফলপ্রসূ হয়। কোন দেশে দ্রব্য এবং সেবা সামগ্রী বেশি পাওয়া যায় মানেই তাকে উন্নয়ন বলা যায় না। দ্রব্য ও সেবা-সামগ্রী অবশ্যই মূল্যবান, কিন্তু মানুষের জন্য তারা কি করতে পারে অথবা মানুষ তাদের দ্বারা কি করতে পারে তাই হল সেই দ্রব্য বা সেবার সামগ্রী মূল্যায়নের সঠিক উপায় অর্থাৎ এগুলির মূল্য স্বনির্ভর নয়, অন্য কিছুর জন্য এসব দ্রব্য বা সেবার সামগ্রী মূল্যবান। তাহলে উন্নয়নের পথে অগ্রগতির অর্থ কেবল দেশে দ্রব্য এবং সেবা সামগ্রির যোগান বৃদ্ধি নয়। দেশের প্রকৃত উন্নয়নমূলক অগ্রগতি বলতে দেশের মানুষের সক্ষমতার বৃদ্ধিকে বোঝায়। সক্ষমতা যখন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু তখন স্বত্বাধিকার সৃষ্টি করা ও তার সংরক্ষণ- এই দুটির ওপরই আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে।[28] স্বত্বাধিকারের সক্ষমতায় রূপান্তরের প্রণালীও জানা দরকার। এসবের মাধ্যমেই প্রকৃত মানব উন্নয়ন সম্ভব হবে। তাই ডক্টর সেন-এর কাছে মানুষের দীর্ঘ জীবন লাভ, অকাল মৃত্যু রোধ, পর্যাপ্ত পুষ্টি যুক্ত খাদ্য প্রাপ্তি, শিক্ষায় অধিকার, স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ, লিঙ্গ বৈষম্য দূর করা, স্ত্রী শিক্ষার প্রসার, সাহিত্যচর্চায় ও বৈজ্ঞানিক গবেষণায় আরো পারদর্শিতা প্রভৃতি ছিল মানুষের উন্নয়নের প্রকৃত আধার।[29] যদিও অনেকে বিভিন্ন দিক থেকে ডঃ অমর্ত্য সেনের চিন্তাধারাকে বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে খন্ডনের চেষ্টা করেছেন। আমি সেই বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোকপাত পরবর্তী অধ্যায়ে করেছি, তথাপি আমার মনে হয় ডক্টর সেন এর উন্নয়ন বিষয়ক পরিকল্পনা ভারত ও ভারতের মতো উন্নয়নশীল অন্যান্য দেশের প্রেক্ষিতে অনেক ক্ষেত্রেই যথেষ্ট কার্যকরী। তিনি উন্নয়নের

---

[28] সেন, অমর্ত্য. (১৪২৪ বং). *অর্থনীতি গ্রন্থমালা ৭.* "জীবনযাত্রা ও অর্থনীতি". কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স. পৃঃ ১২১-১২২.

[29] তদেব. পৃঃ ৯৪.

ধারণাকে অর্থনীতির ধারণাগত বিশ্লেষণের গণ্ডির বাইরে এনে দর্শনের সাথে একাত্ম করে সাধারণ মানুষের উপযোগী ও বোধগম্য উন্নয়নের একটি রূপরেখা আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন।

৫.৭ স্থিতিশীল উন্নয়ন ও পরিবেশ

'স্থিতিশীল উন্নয়ন' শব্দটির আমাদের প্রায়শই প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিবেশের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা তথা কর্মের দিকে পরিচালিত করে। 'স্থিতিশীল উন্নয়ন' শব্দটির সঙ্গে অনেকক্ষেত্রে প্রাকৃতিক সম্পদের বিকাশের জন্য বিভিন্ন নীতি, পরিকল্পনা, কৌশল ও কর্মপ্রণালী গঠনের দিকে আমাদের পরিচালিত করে, যা সর্বদা জৈব-ভৌতিক প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষিতে স্থিতিশীল বলে আখ্যায়িত হয় না।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে উন্নয়ন বলতে বেশিরভাগ সময় আমরা অর্থনৈতিক উন্নয়ন বুঝে থাকি। খুব কম সংখ্যক মানুষ স্থিতিশীল উন্নয়নের প্রতি যথার্থ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। বেশিরভাগ উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলি পুঁজিপতিদের লাভের জন্য গড়ে তোলা হয়। যদিও কল্যাণকামী জনহিতৈষী সরকারের কাছে জনগণের আশা থাকে উন্নয়ন এমনভাবে পরিকল্পনা করা হবে যাতে উন্নয়নের দীর্ঘমেয়াদী উদ্দেশ্য এবং জনগণের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা বিবেচিত হতে পারে। এই উন্নয়ন সামাজিক বা অন্যান্য ধরণের স্থায়িত্বের ক্ষেত্রে আরও গ্রহণযোগ্য হতে পারে, তবে এটি কখনও জৈব ভৌতিক স্থায়িত্বের (bio geophysical sustainability) প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে পারে না।

উন্নয়নের এই বিভিন্ন লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যগুলি প্রায়শই আমাদের 'স্থিতিশীল উন্নয়ন' শব্দটির উপলব্ধি এবং বোঝার ক্ষেত্রে যে বিভিন্ন মতপার্থক্য রয়েছে তার দিকে পরিচালিত করে।একজন ব্যক্তির সংস্কৃতি, বিশ্বাস, পটভূমি এবং প্রশিক্ষণ প্রভৃতি তার চারপাশে যে বস্তুগুলি রয়েছে তার উপলব্ধিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে; যেমন- প্রতিটি ব্যক্তি তার পারিপার্শিক অবস্থা বা আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে তারচারপাশের পরিবেশকে দেখে থাকে। অনেক উন্নয়নশীল দেশে পরিবেশ নিয়ে বা আরও ভালোভাবে বললে পরিবেশ সংরক্ষণ নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত দেখতে পাওয়া যায়। এর মূল কারণ হলো- দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে স্থিতিশীল উন্নয়ন সম্পর্কে ভিন্ন মত দেখা যায়, কারণ এখানকার মানুষের জীবনযাত্রা পৃথিবীর উত্তরে বসবাসকারী মানুষের জীবনযাত্রার থেকে অনেকাংশে আলাদা।[30]

৫.৮ স্থিতিশীল উন্নয়নের নীতিসমূহ

সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমে ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রসংঘ আয়োজিত 'মানব পরিবেশ' শীর্ষক সম্মেলনে পরিবেশ উন্নয়নের মধ্য দিয়ে পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আহ্বান জানানো হয়। এরপর ১৯৮০ সালে International Union for Conservation Nature and Natural Resources (IUCN) তাদের World Conservation Strategy নামক প্রতিবেদনে স্থিতিশীল উন্নয়নের তত্ত্ব প্রকাশ করেন, যার মধ্যে এই ভাবনার প্রতিফলন দেখা গিয়েছে যে, পূর্ব থেকে প্রাপ্ত এই পৃথিবীকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য রক্ষণাবেক্ষণ মানুষদের নৈতিক কর্তব্যের অঙ্গীভূত। প্রকৃতি তথা

[30] Smith, Fraser (Ed.). (1997). *Environmental sustainability* (Practical Global Implications). Florida: St Lucie press. Pg- 68.

প্রাকৃতিক সম্পদের সুরক্ষা নিয়ে ভাবিত আন্তর্জাতিক এই গোষ্ঠীর উদ্দেশ্য হলো পরিবেশ এবং উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয় যথেষ্ট সমাধানের অন্বেষণ এবং প্রকৃতির স্বীয় মূল্য স্বীকার করে তার যথার্থ সংরক্ষণ। জাতিপুঞ্জের পরিবেশমূলক কর্মসূচির মধ্যে 'World Commission on Environment and Dvelopment' নামক একটি স্বতন্ত্র সংস্থা নির্মিত হয়েছিল নরওয়ের তদানীন্তন রাজনীতিবিদ্ Grottarle Brundtland এর সভাপতিত্বে ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে। এই সংস্থার দায়িত্ব ছিল মনুষ্য কর্তৃক পরিবেশের শোষণ ও মানুষের স্বার্থভিত্তিক কার্যকলাপের ফলশ্রুতি হিসেবে পরিবেশের উপর ক্ষতিকর প্রভাব, উন্নয়নমূলক প্রকল্পকে নিয়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীন বিবাদ সমাধান সম্পর্কিত প্রস্তাব নির্ধারণ। উক্ত সংস্থা তাদের 'Our Common Future' শীর্ষক রিপোর্টে স্থিতিশীল উন্নয়নকে যেভাবে সংজ্ঞায়িত করে তা হলো- "Development that meets the needs of the present without compromising the ability of the future generations to meet its own needs." অর্থাৎ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রয়োজনের ক্ষেত্রে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করে বর্তমান প্রজন্মের প্রয়োজন পূরণই হলো স্থিতিশীল উন্নয়ন।[31] জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক ব্রুন্ডল্যান্ড কমিশনকে যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তা ছিল পরিবর্তনের জন্য একটি বৈশ্বিক নীতি প্রণয়ন করা। এই নীতিগুলি হল নিম্নরুপ;[32]

---

[31] Malakar, Bharat (Ed.). (2013). *Sustainable Development: Ethics and Economics*. Purba Medinipur: Readers service in association with Dept of Philosophy, Mahishadal Girls College. Pg-38-39.

[32] Langhelle, Oluf. (1999). Sustainable Development: Exploring the Ethics of "Our Common Future". *International Political Science Review / Revue internationale de science politique*. Vol-20. No-2. April. Page- 129-149.

১. স্থিতিশীল উন্নয়ন অর্জনের জন্য দীর্ঘমেয়াদী পরিবেশগত নীতি প্রস্তাব করা।

২. উন্নয়নশীল দেশ এবং যে দেশগুলি সামাজিক বা অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে আছে, তাদের মধ্যে পরিবেশের জন্য উদ্বেগকে বৃহত্তর সহযোগিতায় অনুবাদ করা যেতে পারে এমন উপায়গুলির সুপারিশ করা।

৩. আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থা যাতে পরিবেশগত সঙ্কটের সাথে আরও কার্যকরভাবে মোকাবেলা করতে পারে তার বিভিন্ন উপায় বিবেচনা করা।

৪. দীর্ঘমেয়াদী পরিবেশগত সমস্যাগুলি উপলব্ধি করা এবং পরিবেশগত সমস্যাগুলি সফলভাবে মোকাবিলা করার জন্য যথাযথ দীর্ঘমেয়াদী নীতি ও প্রচেষ্টা প্রয়োজন।

৫.৯ স্থিতিশীল উন্নয়নের বিভিন্ন প্রকার অর্থ

'স্থিতিশীল উন্নয়ন' শব্দটির বিভিন্ন ধরনের অর্থ পরিলক্ষিত হয়। অভিধানে এই 'স্থিতিশীল উন্নয়ন' শব্দটির সংজ্ঞা নিয়ে বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছে। New world dictionary of the American language (Guralnik, 1978) অনুসারে sustainable development শব্দবন্ধটির অন্তর্গত ‘sustainable’ শব্দটি sustain ক্রিয়াপদের বিশেষণ, যাকে নিম্নলিখিত ভাবে আমরা সংজ্ঞায়িত করতে পারি-[33]

১) অস্তিত্বশীলতা বজায় রাখা বা দীর্ঘায়িত করা।

[33] 1. To keep in existence, keep up, maintain and prolong; 2. to provide for the support of, to provide sustaince and nourishment for; 3. To support from or as from below, carry the wait and burden of; 4. To strengthen the spirits, courage of, comfort, buoy up, encourage; 5. To bear up against, endure, withstand; 6. To undergo of suffer (injury or loss); 7. To uphold the validity or justice of; 8. To confirm and collaborate.

২) সহায়তা প্রদানের জন্য, জীবিকা নির্বাহের জন্য বা পুষ্টি প্রদানের জন্য।

৩) কোনো কিছুকে ধরে রাখার জন্য, ভিত থেকে তাকে আশ্রয় দেবার জন্য, ওজন বা বোঝা-বহনের জন্য।

৪) নিজের আত্মাকে আরও দৃঢ়তা ও সাহস, উত্থানও উৎসাহের পথে চালিত করা।

৫) কোনো কিছু বিরুদ্ধে গেলেও তাকে সহ্য করা।

৬) আঘাত বা ক্ষতিও তার জন্য ভোগ করা।

৭) সর্বদা বৈধতা ও ন্যায়বিচার বজায় রাখা।

৮) কোনোকিছুকে নিশ্চিত করা ও সমর্থন করা।

উপরের সংজ্ঞাটি আমাদের দেখায় sustain ক্রিয়াপদটি বিভিন্ন প্রসঙ্গ ও উদ্দেশ্য অনুসারে আটপ্রকার অর্থ বহন করে। 'Sustainable' পদটি সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে বলা হয়, যা স্থিতিশীল হতে পারে। একইভাবে 'sustainable' শব্দটিরও আটটি অনুরূপ অর্থ আমরা দেখতে পাই। এটি উন্নয়নের সঙ্গে সম্পর্কিত হলে তা আরও দ্বন্দ্ব এবং বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে পারে। তাই 'উন্নয়ন' শব্দটি New World Dictionary of the American Language অনুসারে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে বলা হয় -[34]

১) উন্নয়ন হলো বিকাশ বা বিকাশের একটি প্রক্রিয়া;

২) বৃদ্ধির একটি ধাপ বা পর্যায়;একে অগ্রগতিও বলা যায়;

৩) একটি ঘটনা অথবা এমন ঘটনা যা ঘটছে;

---

[34] Smith, Fraser (Ed.). (1997). *Environmental sustainability* (Practical Global Implications). Florida: St Lucie press. Pg- 69.

৪) একটি বস্তু যা ইতিমধ্যে বিকশিত হয়েছ; যেমন আমরা বলে থাকি, কোনো বৃহৎ জমিতে অনেকগুলি অবকাঠামো নির্মিত হয়েছে।[35]

উন্নয়ন বলতে এমন একটি ধারণা, যা বিমূর্ত থেকে একটি প্রক্রিয়া বা গৃহীত পদক্ষেপ, উপলব্ধিযোগ্য বাস্তবতার কঠিনরূপ পর্যন্ত পরিবর্তিত হয়। উন্নয়ন প্রায়ই আকার, সংখ্যা বা পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কিত বলে ধারণা করা হয়, যদিও সমস্ত ক্ষেত্রে উন্নয়নকে পরিমাণের দিক থেকে বিচার করলে তা উচিত কাজ হবে না। উন্নয়ন নিছক গুণগতভাবেও পূর্ণ হতে পারে। এইভাবে বিচার করলে বিকাশ (to devolop) শব্দটিকে নিম্নলিখিতভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে-[36]

১) কোনোভাবে ধীরেধীরে বৃদ্ধি ঘটানো, ক্রমান্বয়ে পূর্ণাঙ্গ, আরও বড়ো, আরও ভালোভাবে কোনোকিছুকে প্রসারিত করা।

২) কোনোকিছুকে আরও কার্যকর ও শক্তিশালী করে তোলা।

৩) সুপ্তভাবে রয়েছে বা অনুমানের পর্যায়ে রয়েছে এমনকিছুকে কার্যকরী বা বাস্তবায়িত করা।

৪) ধীরে ধীরে উদ্ভাসিত ও বিকশিত হওয়ার কারণ সৃষ্টি করা।

৫) কোনোকিছুকে আরও উপলব্ধিযোগ্য বা ব্যাপকভাবে প্রসার করতে পারা।[37]

---

[35] 1. A process of developing and being devoloped; 2. A step or stage in growth, advancement; 3. An event and happening; 4. A thing that is developed, a number of structures on a large tract of land built by a real estate developer.

[36] Smith, Fraser (Ed.). (1997). *Environmental sustainability* (Practical Global Implications). Florida: St Lucie press. Pg- 69-70.

[37] 1. to cause to grow gradually in some way, cause to become gradually fuller, larger, better, to build up and expand; 2. to make stronger are more effective, strengthen; 3. to bring (something

বিকাশের এই ক্রিয়াটি ক্রমান্বয়ে তার আকার, পরিমাণ, গুণ এবং অস্তিত্বের অবস্থাকে পরিবর্তন করে চলেছে। স্থিতিশীল উন্নয়নে পরিবেশ এবং পরিবেশের সম্পদের ক্রমান্বয়ে পরিবর্তন বা রক্ষণাবেক্ষণ করার কথা বলা হলেও তা বাস্তবে কতটা সম্ভব হয়েছে বা বর্তমানে হচ্ছে, সে প্রশ্ন থেকেই যায়। স্থিতিশীল উন্নয়নের পরিবর্তনশীল অর্থ সম্পর্কে আমাদের সম্যক ধারণা থাকলে এই বিষয়ে প্রকৃত অর্থ নিয়ে যে বিভ্রান্তি, তা অনেকাংশে দূর করা সম্ভব। মানুষ চাইলে তার শুভবুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে স্থিতিশীল উন্নয়নকে পরিবেশ তথা সকল জীবকুলের বিকাশের স্বার্থে ব্যবহার করতে পারে। এই প্রসঙ্গে উন্নয়ন এবং মানুষের সম্পর্ক আমাদের জানা প্রয়োজন।

৫.১০ উন্নয়ন ও মানুষ

উন্নয়ন শব্দটির অর্থ পরিবর্তন, যে সদর্থক পরিবর্তন আর্থ সামাজিক ব্যবস্থার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীকভাবে জড়িত। অন্যভাবে বলতে গেলে কোনো সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে যদি জনকল্যানকর পরিবর্তন পরিদৃশ্যমান হয়ে ওঠে, তবে সেই সমাজ যে ক্রমশ অগ্রগতির দিকে এগোচ্ছে, তা নিশ্চিত করে বলা যায়। এই উন্নয়নের মূলে আছে মানুষ, ব্যক্তিগত স্তর থেকে সমষ্টিগত স্তরে সর্বত্র মানুষ ও তার কর্ম, জীবনশৈলী, প্রকল্প এই উন্নয়নের কেন্দ্রে অবস্থান করছে। কিন্তু সেখানে প্রকৃতিকে কেবল মানুষের প্রয়োজনের সাপেক্ষ ব্যতীত গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকেই মানুষ কৌশলে প্রকৃতিকে ব্যবহার করে সামগ্রিকভাবে নিজেদের প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছে, এর ফলে

---

latent or hypothetical) into activity or reality; 4. to cause to unfold or evolve gradually; 5. to make more available or extensive.

উন্নয়নের বৃদ্ধি ঘটেছে ও তাতে গতি এসেছে। কিন্তু কেবল প্রকৃতিকে যথেচ্ছ ব্যবহার পরিবেশের ক্ষেত্রে যে ব্যাপক ক্ষতির সৃষ্টি করেছে, সে বিষয়ে সচেতন হওয়া মানুষের কর্তব্য। উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলি অর্থনৈতিক উন্নয়নের লালসায় প্রকৃতিকে শোষণ করে পরিবেশ দূষণ, আবহাওয়ার পরিবর্তন,বিশ্ব উষ্ণায়নের মতো সমস্যাগুলি সৃষ্টি করছে। এরই পরিণাম হল পরিবেশগত ঝুঁকি (Ecological risk) সৃষ্টি করা। বিংশ শতকের মধ্যভাগ থেকেই উন্নয়ন ধারণাটি বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে, উন্নয়ন বিষয়টি কেবল সদর্থক ধারণার সঙ্গে সম্পৃক্ত না থেকে যুক্ত হচ্ছে নৈতিকতার সঙ্গে। অর্থনীতির প্রসঙ্গটি স্মরণে রেখেও উন্নয়ন প্রয়োজন, যা পৃথিবীর সামগ্রিক ভারসাম্যের ক্ষেত্রে কোনোরূপ বিঘ্নের সৃষ্টি করবে না, বরং তা হবে প্রকৃতির অনুকূল। এই উন্নয়নের ফলশ্রুতি হিসেবে বর্তমান ও ভবিষ্যতে পৃথিবীর মধ্যে সামগ্রিক ভারসাম্য বজায় থাকবে,এই হলো স্থিতিশীল উন্নয়নের মূল বক্তব্য।

ব্রুটলেট কমিশনের রিপোর্ট অনুসারে স্থিতিশীল উন্নয়নের ধারণা পরিবেশগত দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যদিও সে গুরুত্ব অর্থনৈতিক দিক থেকেই অনেকে মনে করেন। কারণ অনেকের কাছে স্থিতিশীল উন্নয়ন মূলত অর্থনৈতিক স্থিতিশীল উন্নয়নের সঙ্গে সমার্থক। পরিবেশের আলোচনা প্রসঙ্গে বিভিন্ন সরকারি দপ্তর অনেক নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে স্থিতিশীল উন্নয়নের ধারণাকে গুরুত্ব দিয়ে পরিবেশ সংরক্ষণের কথা স্মরণ করেন। জনকল্যাণমুখী অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিক থেকে স্থিতিশীল উন্নয়নকে একটি বিশেষ অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন হিসাবে ধরা হয়, যা মানবকল্যাণের ন্যূনতম স্তর বজায় রাখতে সাহায্য করে। এইভাবে স্থিতিশীল উন্নয়ন কিছু প্রয়োজনীয়তার সমতুল্য হয়ে ওঠে এবং এই ভালো-হওয়া (well being) অর্থাৎ

আমাদের প্রয়োজনীয়তার সমতুল্য হয়ে ওঠা বিষয়টি সময়ের সাথে কখনও আমরা হ্রাস পেতে দেখি না। স্থিতিশীল উন্নয়নের এই বৈশিষ্ট্যটি মানব-কল্যাণের একটি নির্দিষ্ট ধারণা এবং সময়ের সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট স্তরের মানব-কল্যাণ বজায় রাখার জন্য আমাদের কী করা প্রয়োজন তা সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে। কল্যাণমূলক অর্থনীতি অনুমান করে যে আমাদের পছন্দের সন্তুষ্টির মধ্যে ভালো থাকা নিহিত রয়েছে। তাছাড়া মানবকল্যাণের একটি নির্দিষ্ট স্তরের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আমাদের কী প্রয়োজন তা নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করে থাকে। এটি বলে,প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে মানব-কল্যাণের একটি সুনির্দিষ্ট স্তরের সংরক্ষণের জন্য প্রতিটি প্রজন্মকে তার প্রাপ্তির সমতুল্য একটি সঞ্চয় রাখতে হবে। অর্থাৎ মূলধন সম্পদ ও উৎপাদনের সম্ভাবনা সময়ের সঙ্গে বৃদ্ধি পাওয়া উচিত, হ্রাস পাওয়া কোনোমতেই কাম্য নয়। এটি মোট মূলধনের স্থায়িত্বের মানদন্ড। যাই হোক, স্থিতিশীল উন্নয়নের ধারণার সমালোচক উইলফ্রেড বেকারম্যান বলেন, যদি স্থায়িত্বকে নির্দিষ্ট সময়ে ও সময়ের সাথে ন্যায়সঙ্গত বন্টনের পরিপ্রেক্ষিতে সংজ্ঞায়িত করা যায়, এই ধারণাটি বন্টনগত বিবেচনায় কোনো নতুন মাত্রা যোগ করতে অক্ষম। প্রশ্ন হলো, এই ধারণাটিকে পরিবেশ ও পরিবেশগত ধারণার সঙ্গে কীভাবে সম্পৃক্ত করা যায়? এই ধরণের সমস্যার প্রত্যুত্তরে স্থিতিশীল উন্নয়নের রক্ষকরা মনে করেন, অর্থনীতির ক্ষেত্রে এই ধারণাটি প্রয়োজনীয়, কারণ তা ভবিষ্যত প্রজন্মের কল্যানে প্রাকৃতিক বিশ্বের বিশেষ রাষ্ট্রগুলির ভূমিকার উপর জোর দেয়, কিন্তু এটি সম্পূর্ণ পুঁজিভিত্তিক। তাই স্থিতিশীল উন্নয়নের কিছু লক্ষ্য নির্ণয় আবশ্যিক হয়ে পড়ে।

৫. ১১ স্থিতিশীল উন্নয়নের সতেরোটি লক্ষ্য

জাতিসংঘ ঘোষিত স্থিতিশীল উন্নয়নের সাতেরটি অভীষ্ট লক্ষ্যের কথা বলা হয়েছে যা ২০৩০ সালের মধ্যে অর্জন করার লক্ষ্য আমাদের দেওয়া হয়েছে। এই লক্ষ্য গুলি নিম্নরূপ:-[38]

১) দরিদ্রতার বিলোপ:-

সব স্থানে সব ধরনের দরিদ্রতার অবসানের কথা বলা হয়েছে। পৃথিবীর জনসংখ্যার ৫৫ শতাংশ সামাজিক সুরক্ষার আওতার বাইরে রয়েছে। এমনকি ৭৩৬ মিলিয়ন মানুষ ২০১৫ সাল পর্যন্ত খুবই দরিদ্রতার মধ্যে জীবন ধারণ করত; এর মধ্যে আফ্রিকার সাহারা মরুভূমির দক্ষিণাংশের (Sub-Saharan-Africa) ৪১৩ মিলিয়ন মানুষ অন্তর্গত। গ্রামীণ অঞ্চলে দরিদ্রতার পরিমাণ শহর অঞ্চলের দরিদ্রতার পরিমাণ এর চেয়ে অনেকাংশে বেশি। এমনকি ২০১৮ সালের তথ্য অনুসারে এদের মধ্যে ৮% মানুষ শ্রমিক হিসেবে নিযুক্ত হওয়ার পরও তাদের পরিবারে খুবই দরিদ্রতার সঙ্গে জীবনধারণ করছে, তার কারণ তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা এতটাই খারাপ। ফলে কম এবং মধ্য আয়ের দেশগুলিতে বিভিন্ন বিপর্যয়ে বহু মানুষ প্রতিবছর প্রাণ হারান।

২) ক্ষুধা থেকে মুক্তি:-

মানুষের ক্ষুধার অবসান ঘটানো, খাদ্য নিরাপত্তা সৃষ্টি ও খাদ্যে উন্নত পুষ্টিমান অর্জন আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। এর সাথে লক্ষ্য হওয়া উচিত স্থিতিশীল কৃষি ব্যবস্থার প্রসার, ২০৩০ সালের মধ্যে সকল মানুষ বিশেষত অপুষ্টিতে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী, দরিদ্র জনগণ ও শিশুদের জন্য বিশেষভাবে পুষ্টিকর ও পর্যাপ্ত খাদ্যপ্রাপ্তির

[38] Ahlawat, Ajay. (2019). *Sustainable Development Goals.* Chennai: Notion Press. pg 23-28.

ব্যবস্থা করা। ২০১৭ সালের তথ্য অনুসারে ৮২১ মিলিয়ন মানুষ অপুষ্টির শিকার, ২০১৫ সালে এই সংখ্যাটি ছিল ৭৮৪ মিলিয়ন, যার থেকে অপুষ্টির শিকার মানুষের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮২১ মিলিয়ন। এই মানুষদের দুই তৃতীয়াংশ পৃথিবীর কেবল দুটি অংশেই পাওয়া যায়, এই দুটি অংশ হলো -আফ্রিকার সাহারা মরুভূমির দক্ষিণাংশ এবং দক্ষিণ এশিয়া। এই অঞ্চল গুলির ৫.৯ শতাংশ পাঁচ বছর বয়সের কম শিশু, যার সংখ্যা প্রায় ৪০ মিলিয়ন অতিরিক্ত ওজন সম্পন্ন হচ্ছে এবং এই অঞ্চলগুলির 7.9 শতাংশ ৫ বছর বয়সের কম শিশু, যার সংখ্যা প্রায় ৪৯ মিলিয়ন অবচয়ের কারণে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত হচ্ছে অর্থাৎ তাদের জনগণের মধ্যে অপুষ্টির ব্যাপকতা পরিলক্ষিত হয়।[39]

৩) সুস্বাস্থ্য ও কল্যান অর্জন:-

সকল বয়সের মানুষের মধ্যে সুস্বাস্থ্য কল্যাণকে নিশ্চিত করতে হবে। ২০১৭ সালের তথ্য অনুসারে পাঁচ বছর বয়সে পৌঁছানোর পূর্বেই ৫.৪ মিলিয়ন মানুষ পৃথিবীতে মারা যাচ্ছে। এর মধ্যে আফ্রিকার সাহারা মরুভূমির দক্ষিণাংশের উপর অর্ধেক মানুষ পাঁচ বছর বয়সের পূর্বে মারা যায় এবং দক্ষিণ এশিয়ার প্রায় 30% মানুষের ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য। স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অভাবে ১০ মিলিয়ন মানুষ যক্ষ্মা নিয়ে বেঁচে থাকেন। ১৫ থেকে ৪৯ বছর বয়সীদের মধ্যে আফ্রিকায় সাহারা মরুভূমির দক্ষিণ আংটির মানুষের এইডস আক্রান্তের সংখ্যা খুব বেশি করে দেখা যাচ্ছিল ২০১৭ সালের তথ্য অনুসারে। আফ্রিকার ১০ টি দেশের মধ্যে ৩.৫ মিলিয়ন মানুষের প্রতি বছর ম্যালেরিয়া আক্রান্ত হওয়ার তথ্য আমরা ২০১৭ সালের রিপোর্ট থেকে পাই। তাই ২০৩০ সালের মধ্যে এইডস যক্ষা ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য রোগ সমূহ তথা মহামারীর অবসান ঘটান আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। এর পাশাপাশি হেপাটাইটিস, জলবাহিত রোগ ও অন্যান্য

[39] Ahlawat, Ajay. (2019). *Sustainable Development Goals.* Chennai: Notion Press. pg 23.

সংক্রামক ব্যাধির মোকাবিলা আমাদের করতে হবে। তাই সুস্বাস্থ্য ও মানব কল্যাণকে পৃথিবীর সকল দেশের মানুষের মধ্যে গ্রাম শহর নির্বিশেষে আমাদের পৌঁছে দিতে হবে। প্রসূতির মৃত্যু এবং নবজাতকের মৃত্যুর হার কমানোর জন্য প্রসবের সময়ে প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্যকর্মীর ব্যবস্থা করতে হবে।

৪) গুণগত শিক্ষার প্রসার:-

সকলের জন্য অন্তর্ভুক্তি মূলক ও সমতাভিত্তিক গুণগত শিক্ষার ব্যবস্থা করা এবং সকলের সারা জীবনব্যাপী শিক্ষা লাভের প্রকৃত সুযোগ সৃষ্টি করে আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। ২০৩০ সালের মধ্যে সকল পুরুষ ও নারীর যাতে প্রাসঙ্গিক, কার্যকর, অবৈতনিক ও গুণগত শিক্ষা সম্পন্ন করতে পারে তার ব্যবস্থা আমাদের করতে হবে। একটি তথ্য অনুসারে পৃথিবীর প্রায় ৭১৫ মিলিয়ন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি অশিক্ষিত। এর মধ্যে দুই তৃতীয়াংশ হল মহিলা। কিশোর বয়সী মানুষদের মধ্যে ৬৯৭ মিলিয়ন মানুষ দক্ষতার সঙ্গে কোন কিছু পড়তে পর্যন্ত পারে না। এর মধ্যে বহু শিশু পর্যাপ্ত শিক্ষার অর্জনের পূর্বেই বিদ্যালয়ে ছেড়ে দেয়। মধ্য এশিয়ার ক্ষেত্রে এমনও দেখা গেছে যে কজন শিশু প্রাথমিক শিক্ষা পর্যন্ত গ্রহণ করছে না তার মধ্যে ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের সংখ্যা ২৭ শতাংশ বেশি। ২০৩০ সালের মধ্যে সকল ছেলে এবং মেয়ে যাতে শৈশবের প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে মানসিক বিকাশ ও প্রকৃত গুণগত শিক্ষা পায় তার ব্যবস্থা আমাদের করতে হবে।[40]

৫) লিঙ্গ সমতা সৃষ্টি করা:-

লিঙ্গ বৈষম্য দূর করে লিঙ্গ সমতা অর্জন এবং সকল নারী এবং মেয়েদের ক্ষমতায়ন আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। এর জন্য সর্বত্র সকল নারীর বিরুদ্ধে

[40] Ahlawat, Ajay. (2019). *Sustainable Development Goals.* Chennai: Notion Press. pg 23.

সর্বপ্রকার বৈষম্যের অবসান ঘটাতে হবে। ২০১৮ সালের তথ্য অনুসারে ৩০ শতাংশ ২০ থেকে ২৪ বছর বয়সী মহিলাদের ১৮ বছরের পূর্বে বিবাহ হয়। ফলে যৌন-হয়রানি, নারী পাচার এবং বিভিন্ন ধরনের অত্যাচার সহ্য করতে হয়। ১৫ থেকে ৪৯ বছর বয়সী বিবাহিত মহিলা এবং মেয়েদের যথাক্রমে স্বামী এবং পুরুষদের থেকে শারীরিক এবং যৌন হিংসা সহ্য করতে হয়।

৬) নিরাপদ পরিশ্রুত জল এবং উপযুক্ত পয়ঃ নিষ্কাশনের (sanitation) ব্যবস্থা করা:-

সকলের জন্য পরিশ্রুত জল ও পয়ঃ নিষ্কাশনের স্থিতিশীল ব্যবস্থাপনা ও প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা আমাদের লক্ষ্য। পৃথিবীর জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক ইতিমধ্যেই বছরে অন্তত এক মাস জলের কষ্টে ভুগছে। এবং বিভিন্ন দেশের প্রায় দুই মিলিয়ন মানুষ জলসংকটের মধ্যে বেঁচে আছে। পৃথিবীর ৫ জন মানুষের মধ্যে অন্তত দুজনের উপযুক্ত হবে হাত ধোয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সাবান এবং জল সরবরাহ বাড়িতে নেই ২০১৭ সালের তথ্য অনুসারে। তাছাড়া ২৮৫ মিলিয়ন মানুষের ২০১৭ সালের তথ্য অনুসারে নূন্যতম পানীয় জলের সংস্থানটুকু নেই। তাই ২০৩০ সালের মধ্যে নিরাপদ ও পরিশ্রুত জলের ব্যবস্থা ও স্থিতিশীল পদ্ধতিতে সারা বছর তার প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

৭) সাশ্রয়ী ও দূষণমুক্ত জ্বালানির ব্যবস্থা করা:-

সকলের জন্য সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য, স্থিতিশীল আধুনিক জ্বালানি কম খরচে পাওয়ার ব্যবস্থা করা আমাদের লক্ষ্য। দশজনের মধ্যে একজন মানুষ আজ ইলেকট্রিকের অভাবে জীবনধারণ করে, এদের মধ্যে ৮৭ শতাংশ গ্রামীণ অঞ্চলে বসবাস করে। পৃথিবীর জ্বালানির মাত্র ১৭.৫ শতাংশ পুনর্ব্যবহারযোগ্য জ্বালানির উৎস

থেকে প্রাপ্ত হয়। তাছাড়া রান্নার জন্য পরিষ্কার জ্বালানি এবং আধুনিক ব্যবস্থা খুব কম মানুষেরা ব্যবহার করে থাকে। তাই ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বে পুনর্ব্যবহারযোগ্য জ্বালানির পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়াতে হবে।

৮) উপযুক্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন:-

সকলের জন্য পূর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। উপযুক্ত কাজের ব্যবস্থা করতে হবে এবং স্থিতিশীল অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন আমাদের লক্ষ্য। ২০১৮ সালের তথ্য অনুসারে বেকারত্বের পরিমাণ যেমন বেড়েছে তেমনি মহিলাদের তুলনায় পুরুষরা আজও ঘন্টা পিছু ১২% অত্যধিক মজুরি পায়। জাতীয় পরিস্থিতি অনুযায়ী মাথাপিছু অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বজায় রাখা এবং বিশেষত স্বল্প উন্নত দেশ গুলিতে জিডিপির পরিমাণ বৃদ্ধি, আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত ২০৩০ সালের মধ্যে সকল নারী ও পুরুষের মধ্যে স্থায়ী উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান উপযুক্ত কর্মসূচক সৃষ্টি করা, যেখানে নারী ও পুরুষ মর্যাদা ও সমপরিমাণ মজুরি বেতন পাবে তার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত।[41]

৯) শিল্প নতুন উদ্ভাবন এবং উন্নত অবকাঠামো সৃষ্টি করা:-

অভিঘাত সহনশীল অবকাঠামো নির্মাণ অন্তর্ভুক্তিমূলক ও স্থিতিশীল শিল্পায়নের প্রবর্তন এবং উদ্ভাবনার প্রসারন ঘটানো আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। সকলের জন্য অর্থনৈতিকভাবে সাশ্রয়ী ও নেই সংগত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও মানবিক কল্যাণে সহযোগিতার জন্য নির্ভরযোগ্য স্থিতিশীল অভিঘাত সহনশীল অবকাঠামো নির্মাণ করতে হবে। ৩.৮ বিলিয়ন মানুষ আজও নূন্যতম ইন্টারনেট সুবিধা থেকে বঞ্চিত। অনুন্নত দেশগুলি শিল্পায়ন অত্যন্ত শীরগতি সম্পন্ন এর ফলে তাদের গড় আয় উন্নত দেশগুলির

[41] Ahlawat, Ajay. (2019). *Sustainable Development Goals.* Chennai: Notion Press. pg 25.

মানুষের তুলনায় অনেক কম তাই ২০৩০ সালের মধ্যে উদ্ভাবনাকে উৎসাহিত করা এবং মানুষের কল্যাণের উপর গবেষণা উন্নতকর্মীর সংখ্যা বৃদ্ধি আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বৈজ্ঞানিক গবেষণার তাৎপরতা বৃদ্ধি করতে হবে এবং শিল্পায়নে তথা প্রযুক্তিগত সক্ষমতার দ্রুত উন্নতি সাধন করতে হবে।

১০) অসমতার হ্রাস ঘটানো:-

দেশের অভ্যন্তরে এবং আন্তর্দেশীয় অসমতা হ্রাস করতে হবে। আমাদের আয়, লিঙ্গ, বয়স, অক্ষমতা, জাতি, বর্ণ, ধর্ম এবং সুযোগ এর উপর অসমতা বা অসাম্য নির্ভরশীল। প্রতিদিন প্রায় ১৬ হাজার শিশু হাম, যক্ষ্মা প্রভৃতির কারণে মারা যায়। গ্রামীণ অঞ্চলে বসবাসকারী মহিলারা শহর অঞ্চলের মহিলাদের থেকে প্রসবের সময় প্রায় তিনগুণ অধিক মারা যায়, তাই বয়স, লিঙ্গ, অসামর্থ্য, জাতি, বর্ণ অথবা অর্থনৈতিক অবস্থা নির্বিশেষে ২০৩০ সালের মধ্যে সকলের ক্ষমতা নিশ্চিত করা আমাদের লক্ষ্য।[42]

১১) স্থিতিশীল নগর ও জনপদ সৃষ্টি:-

অন্তর্ভূক্তিমূলক নিরাপদ স্থিতিশীল ও অভিঘাত-সহনশীল শহর ও জনবসতি গড়ে তুলতে হবে। ২০৩০ সালের মধ্যে সকলের জন্য পর্যাপ্ত নিরাপদ ও অর্থনৈতিকভাবে সাশ্রয়ী ঘরবাড়ি এবং মৌলিক সুবিধা পাওয়া সকলের নিশ্চিত করতে হবে। তাছাড়া বস্তির উন্নয়নসাধন, অরক্ষিত পরিস্থিতির মধ্যে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী নারী-শিশু-প্রতিবন্ধী-বয়স্ক মানুষের চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রেখে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত, যানবাহন সম্প্রসারণ, সড়ক নিরাপত্তা ব্যবস্থা, স্থিতিশীল পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। সকল দেশে

[42] Ahlawat, Ajay. (2019). *Sustainable Development Goals*. Chennai: Notion Press. Pg- 25.

অন্তর্ভূক্তিমূলক ও স্থিতিশীল নগরায়ণ ব্যবস্থার প্রসার এবং অংশগ্রহণমূলক, স্থিতিশীল ও সংযুক্ত জনবসতির পরিকল্পনা সৃষ্টি ও তার বাস্তবায়ন আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। বিশ্বের সাংস্কৃতিক ও প্রাকৃতিক ঐতিহ্যের নিরাপত্তা সবল করতে হবে। দরিদ্র ও অরক্ষিত পরিবেশে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীকে রক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ও মৃতের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস করতে হবে। তাছাড়া স্থানীয় উপকরণ ব্যবহার করে স্থিতিশীল ও অভিঘাত সহনশীল ঘরবাড়ি নির্মাণ করে স্বল্প উন্নত দেশগুলিকে আর্থিক, কারিগরি সহায়তা ও সমর্থন আমাদের দিতে হবে।

১২) পরিমিত ভোগ ও স্থিতিশীল উৎপাদন নিশ্চিতকরণ:-

উন্নয়নশীল দেশগুলির উন্নয়ন ও সক্ষমতার কথা স্মরণে রেখে স্থিতিশীল উৎপাদন ও ভোগ বিষয়ক দশ বছরের কর্মসূচির নির্ধারণে উন্নত দেশগুলিকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। ২০৩০ সালের মধ্যে প্রাকৃতিক সম্পদের যথার্থ ব্যবহার ও স্থিতিশীল ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। খুচরা বিক্রেতা ও ভোক্তা পর্যায়ে প্রত্যেকটি মানুষের খাদ্য অপচয়ের পরিমাণ ২০৩০ সালের মধ্যে হ্রাস করা। ২০২০ সালের মধ্যে সর্বসম্মত আন্তর্জাতিক পরিকাঠামো অনুযায়ী রাসায়নিক পদার্থ ও বিবিধ বর্জ্যের পরিবেশবান্ধব ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। প্রতিরোধ, হ্রাসকরণ ও পুনর্ব্যবহারের মাধ্যমে বর্জ্য নির্মাণ হ্রাস করতে হবে। সকল কোম্পানিকে, বিশেষত বহুজাতিক সংস্থাগুলিকে টেকসই কর্মপদ্ধতি গ্রহণে এবং তাদের প্রতিবেদনচক্রে স্থিতিশীলতা সম্পর্কে উল্লেখ করে উৎসাহিত করা। জাতীয় নীতিমালা ও অগ্রাধিকার অনুযায়ী সরকারি ক্রয় বিক্রয়ের টেকসই পদ্ধতির প্রবর্ধন। সর্বত্র সকল মানুষের যেন প্রকৃতির

সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ জীবনরীতি সম্পর্কে ২০৩০ সালের মধ্যে জনসচেতনতা প্রয়োজন। ভোগ ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে অধিকতর স্থিতিশীল পন্থার ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তা দান করতে হবে। স্থানীয় সংস্কৃতি ও স্থানীয়ভাবে উৎপন্ন পণ্যসামগ্রীর প্রচার ও প্রসার সহ নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী স্থিতিশীল পর্যটনশিল্পে স্থিতিশীল উন্নয়নের প্রভাব নিরীক্ষণ করতে হবে। জাতীয় পরিস্থিতি অনুযায়ী বাজার বিচ্যুতির অবসান ঘটিয়ে জীবাশ্ম জ্বালানিতে প্রদত্ত অপচয় উদ্বুদ্ধকারী অদক্ষ ভর্তুকিসমূহের যুক্তিযুক্ত পুনর্নির্ধারণ করতে হবে।

১৩) জলবায়ু কার্যক্রম:-

সকল দেশে জলবায়ু সংক্রান্ত সমস্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিরুদ্ধে অভিঘাত সহনশীলতা ও অভিযোজন ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। জাতীয় নীতিমালা, কৌশল ও পরিকল্পনায় জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত কর্মব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। অর্থবহ প্রশমন তৎপরতা ও বাস্তবায়ন স্বচ্ছতার পরিপ্রেক্ষিতে উন্নয়নশীল দেশগুলোর চাহিদা মেটাতে জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন এর উন্নত দেশভুক্ত পক্ষ কর্তৃক প্রতিশ্রুত ২০২০ সাল নাগাদ যৌথভাবে বার্ষিক ১০০ বিলিয়ন ডলার সংগ্রহের লক্ষ্য বাস্তবায়ন এবং সম্ভব স্বল্পতম সময়ে মূলধনী অর্থায়নের মাধ্যমে 'সবুজ জলবায়ু তহবিল' সক্রিয় করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। নারী যুবসমাজ স্থানীয় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ওপর রাধিকার সহ স্বল্পোন্নত দেশ উন্নয়নশীল দ্বীপ রাষ্ট্রগুলোতে জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত কার্যকর পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য সক্ষমতা কর্মপদ্ধতির প্রবর্ধন প্রয়োজন।

১৪) জলজ জীবন:-

২০২৫ সালের মধ্যে সকল প্রকার সামুদ্রিক দূষণ ,বিশেষ করে স্থলভিত্তিক কর্মকাণ্ড নৌ আবর্জনা ও পুষ্টিরাই পদার্থের আধিক্য জনিত দূষণ হ্রাস করতে হবে। সাগর এবং মহাসাগরে সুস্থ পরিবেশ ও উৎপাদনশীলতা বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। সকল পর্যায়ে বৈজ্ঞানিক সহযোগিতা ও অপরাপার উদ্যোগের মাধ্যমে সামুদ্রিক অম্লায়নের ক্ষতিকর প্রভাবের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। ২০২০ সালের মধ্যে মদ শহরের কার্যকর নিয়ন্ত্রণ ও মাছের অতি আহরণ অবৈধ গোপন অনিয়ন্ত্রিত সকল ধরনের ক্ষতিকর আহরণ পদ্ধতির অবসান ঘটানো প্রয়োজন এবং বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করা প্রয়োজন। যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক তথ্য পাওয়া যায় তার ভিত্তিতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইনের সাথে সামঞ্জস্য বজায় রেখে ২০২০ সালের মধ্যে উপকূলীয় ও সামুদ্রিক এলাকা অন্ততপক্ষে দশ শতাংশের সংরক্ষণ করতে হবে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার মৎস্য ভর্তুকি সংক্রান্ত চুক্তির অবিচ্ছেদ্য অংশ হবে উন্নয়নশীল স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য যথোপ যুক্ত কার্যকর বিশেষ ও প্রাধিকার মূলক ব্যবস্থা। এ বিষয়টি অনুস্বীকার্য বিবেচনায় রেখে ২০২০ সালের মধ্যে অতিসক্ষমতা বা ধারণক্ষমতার জন্য অতি আহরণে সহায়ক এমন সকল প্রকার মৎস্য ভর্তুকি নিষিদ্ধ করতে হবে। মৎস্য আহরণ মৎস্য চাষ ও পর্যটন শিল্পের স্থিতিশীল ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সামুদ্রিক সম্পদের স্থিতিশীল ব্যবহার নিশ্চিত করে ২০৩০ সালের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করতে হবে। ক্ষুদ্র পরিসরে মৎসাহরণকারী জেলেদের সামুদ্রিক সম্পদ ও বাজারে প্রবেশাধিকার দিতে হবে।

১৫) স্থলজ জীবন:-

২০২০ সালের মধ্যে বৈশ্বিকভাবে সকল প্রকার বনভূমির স্থিতিশীল ব্যবস্থাপনার বাস্তবায়ন, বনভূমি উজাড়রোধ, ক্ষতিগ্রস্ত বনভূমি পুনরুদ্ধার ও সবুজায়নের প্রয়োজন। ২০৩০ সালের মধ্যে পার্বত্য অঞ্চলের বাস্তুতন্ত্র সংশ্লিষ্ট জীববৈচিত্র সংরক্ষণ করতে হবে। সংরক্ষিত উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতির চোরাশিকার ও পাচারের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ২০২০ সালের মধ্যে জাতীয় স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা উন্নয়ন প্রক্রিয়া দারিদ্র নিদর্শন কৌশল ও কর্মসূচি গুলিতে বাস্তুতন্ত্র জীববৈচিত্রের মূল্যবান অঙ্গীভূত করতে হবে। স্থিতিশীল জীবিকার সুযোগ গ্রহণে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সামর্থ্য বাড়ানো সহ অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে সংরক্ষিত প্রজাতির পাচার রোধের উদ্যোগ প্রচেষ্টায় বৈশ্বিক সমর্থন বৃদ্ধি করতে হবে।

১৬) শান্তি,ন্যায়বিচার ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান:-

সর্বস্থানে সহিংসতা ও সহিংসতা জনিত মৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্য হারে কমিয়ে আনতে হবে। শিশু নির্যাতন ও শিশুশ্রমের মত বিষয়গুলির অবসান ঘটাতে হবে। জাতীয় আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আইনের শাসন বাড়াতে হবে এবং ন্যায়বিচার প্রাপ্তিতে সকলে যাতে সমান থাকে সেই দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সকল প্রকার দুর্নীতি ও ঘুষ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস করতে হবে। ২০৩০ সালের মধ্যে প্রত্যেককে জন্ম নিবন্ধন সহ বৈধ পরিচয় পত্র প্রদান করা উচিত। স্থিতিশীল উন্নয়নের জন্য আইন ও নীতিমালার ক্ষেত্রে বৈষম্য না থাকা উচিত।

১৭) অভীষ্ট অর্জনে অংশীদারিত্ব:-

আন্তর্জাতিক সহায়তার মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে কর অন্যান্য রাজস্ব সংগ্রহের অভ্যন্তরীণ সক্ষমতা বৃদ্ধি সহ অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ জোরদার করতে

হবে। অনেক উন্নত দেশ কর্তৃক প্রতিশ্রুত উন্নয়নশীল দেশের জন্য স্থূল ও জাতীয় আয়ের একটি বড় অংশ সরকারি উন্নয়নে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্য রাখা উচিত। বিভিন্ন উৎস থেকে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য অতিরিক্ত আর্থিক সম্পদ হরণ করা উচিত।

জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত স্থিতিশীল উন্নয়নের এই অভীষ্ট লক্ষ্যগুলি যদি বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয়, তাহলে নিঃসন্দেহে পৃথিবীর জীবকুল আরো অনেক বছর শান্তিতে থাকবে। গত বেশ কিছু বছরে মানুষের 'ভ্রান্ত উন্নয়নের ধারণায়' বিশ্বের জীবতন্ত্রের অস্তিত্ব সঙ্কটের সম্মুখে উপস্থিত। মানুষ উন্নয়নের নামে পরমাণু বোমা তৈরি করছে, তার পরীক্ষা করছে, বিশ্বের বহু স্থানে পরমাণু চুল্লি স্থাপিত হয়েছে- এসব করেই মানুষ থেমে থাকেনি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকি শহরে পরমাণু বোমা ফেলা এবং তার ফলে ঘটিত পরিবেশ তথা মানুষের ধ্বংসের কাহিনী আমরা সকলে জানি। সাম্প্রতিককালে রাশিয়া ও ইউক্রেনের যুদ্ধে ব্যাপক পরিমাণে মারণাস্ত্রের ব্যবহারের ফলে যে ধ্বংসলীলা চলছে, তা মানুষের ক্ষতি করেই থেমে যায়নি, পরিবেশকেও শ্মশানভূমিতে পরিণত করেছে। উন্নয়নের নামে যদি এসবকিছু চলতে থাকে, তাহলে জীবনধারার প্রবাহ স্তব্ধ হতে বাধ্য। মানবজাতির উন্নয়নের নামে এমন অনেক কাজকর্ম করে যা ভবিষ্যতে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে তাদের অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে তোলে। স্থিতিশীল উন্নয়নের যে লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ সালের মধ্যে অর্জন করার কথা বলা হয়েছে বলে পূর্বে আলোচিত হল, ২০২৩ সালে উপনীত হয়েও আমরা দেখতে পাই তার বেশিরভাগই এখনও অধরা। এর মূল কারণ স্থিতিশীল উন্নয়নের পশ্চাতে অবস্থিত মানবকেন্দ্রিক চিন্তাধারা। তাই আমাদের উচিত নিজেদের মানসিকতাকে পরিবর্তন করা। আমরা এমন এক ঝুঁকিপূর্ণ জগতে বাস করছি, যেখানে মানুষ এক এমন 'উন্নয়নের ধারণাকে' বিশ্বাস

করে যা প্রকৃতপক্ষে তার নিজের বিপদ ডেকে আনবে। এমনভাবে চললে পরিবেশের সংরক্ষণ ও মানুষের উন্নয়নের একত্রে সহাবস্থান (যা আমার অভিসন্দর্ভের মূল আলোচ্য) কোনোদিনই সম্ভব হবে না। তাই পরবর্তী 'মূল্যায়ণ ও সিদ্ধান্ত অংশে' আমি মনুষ্য কর্তৃক গৃহীত স্থিতিশীল উন্নয়নের ধারণাকে বিশ্লেষণ করে দেখানোর চেষ্টা করেছি যে, মানব উন্নয়নে ও পরিবেশ সংরক্ষণে তা কতটা কার্যকরী। তাছাড়া বৈদিক চিন্তাধারা এবং বৌদ্ধ দর্শনের প্রেক্ষিতে পরিবেশের অবক্ষয় রোধ এবং মানুষের প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব কিনা তাও আমি পরবর্তী 'মূল্যায়ণ ও সিদ্ধান্ত অংশে' আলোচনার চেষ্টা করেছি।

মূল্যায়ন ও সিদ্ধান্ত

সমবেত প্রচেষ্টা প্রয়োজন

পরিবেশগত সমস্যাগুলির স্থায়ী সমাধান করতে গেলে একে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের সমস্যা বলে ভাবতে হবে। অনেকসময় সমস্যার কেন্দ্রে যারা বসবাস করেন কেবল তাদেরই যে ক্ষতি হয় এমন নয়, সমগ্র সমাজ এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের উপরেও এর সুবিস্তৃত প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। বিশ্বের প্রতিটি দেশেরই আর্থিক এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা আছে তাদের নিজস্ব পরিবেশকে সংরক্ষণ করার। সে কারণেই বহু দেশ পরিবেশ তথা প্রাণী সংরক্ষণে একাধিক প্রকল্প গ্রহণ করে থাকে, কিন্তু সরকারের উদাসীনতা ও মানুষের সচেতনতার অভাবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অনেক প্রকল্প যথার্থভাবে বাস্তবায়িত হয়না। এর মূল কারণ হলো, পরিবেশগত সমস্যা বহুক্ষেত্রেই আন্তর্জাতিক, কোনো একটি দেশের একক প্রচেষ্টায় পৃথিবীর উপর নেমে আসা সঙ্কটকে রোধ করা সম্ভব নয়। তাই সকল দেশ মিলে এই পরিবেশ সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করতে হবে। পরিবেশ সমস্যাকে অনেকেই "বিশ্বের সাধারণ সমস্যা" (Common global problems) বলে অভিহিত করেন।[1] বিভিন্ন দেশের যৌথ প্রচেষ্টা ছাড়া এই পরিবেশ সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়।

শিল্পোন্নত দেশগুলি বিশ্বের পরিবেশগত সমস্যাকে অনেকাংশে ত্বরান্বিত করে বলে অনেকে মত প্রকাশ করেন।[2] তাঁদের অভিমত অনুসারে, পরিবেশগত সমস্যাকে প্রতিহত করার জন্য অর্থভার এসব দেশেরই বহন করা উচিত। এসব নিয়ে বিরোধের

---

[1] বসু, রথীন্দ্রনারায়ণ (সম্পা.). (২০০১). *পরিবেশ.* কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়. পৃঃ ২৩২.

[2] তদেব. পৃঃ ২৩৩.

ফলে অনেকক্ষেত্রেই বিশ্বের সমস্ত দেশের মিলিত হয়ে পরিবেশগত সমস্যাকে মোকাবিলা করার প্রচেষ্টা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এক্ষেত্রে যদিও উন্নয়নশীল দেশগুলির পরিবেশগত সমস্যাকে মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে গুরুত্ব ও দায়িত্বকে কোনভাবেই অস্বীকার করা যায় না।

ভারতে পরিবেশ সংক্রান্ত আইন

ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশে পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য বহু আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। পরিবেশের সংরক্ষণের বিষয়টি অধিকার হিসাবে দেখার কথা বলা হয়েছে। ভারতের সর্বোচ্চ আদালতে মত প্রকাশিত হয়েছে যে, প্রতিটি ব্যক্তিরই দূষণমুক্ত পরিবেশে বসবাসের অধিকার আছে।[3] মানবাধিকারের দৃষ্টিতে পরিবেশের বিষয়টি দেখাই এখানে মূল উদ্দেশ্য। এই প্রসঙ্গে ভারতে পরিবেশ সংরক্ষণ সংক্রান্ত অনেক আইন প্রচলিত আছে, এর মধ্যে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ আইন নিম্নে বর্ণনা করা হল[4] -

১৮৭৮ সালে ভারতীয় বনভূমি আইন (Indian Forest Act) প্রচলিত হয়।

১৮৮৭ সালে বন্যপক্ষী রক্ষণ আইন (Wild Bird Protection Act) প্রচলিত হয়।

১৯৭৪ সালে জল (দূষণ নিবারণ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ) আইন [Water (Prevention and Control of Pollution) Act] প্রচলিত হয়।

[3] বসু, রথীন্দ্রনারায়ণ (সম্পা.). (২০০১). *পরিবেশ.* কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়. পৃঃ ২২২.

[4] বসু, রথীন্দ্রনারায়ণ (সম্পা.). (২০০১). *পরিবেশ.* কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়. পৃঃ ২২৩-২২৪.

১৯৮১ সালে বায়ু (দূষণ নিবারণ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ) আইন [Air (Prevention and Control of Pollution) Act] প্রচলিত হয়।

১৯৮৬ সালে পরিবেশ রক্ষণ আইন (Environment Protection Act) প্রচলিত হয়।

১৯৮৯ সালে বিপজ্জনক বর্জ্য (ব্যবস্থাপন ও পরিচালন) নিয়মাবলী [Hazardous Wastes (Management and Handling) Rules] প্রচলিত হয়।

১৯৮৯ সালে বিপজ্জনক আণুবীক্ষণিক প্রাণী/জীব-প্রযুক্তিজাত প্রাণী অথবা কোষ ইত্যাদির উৎপাদন, ব্যবহার, আমদানী-রপ্তানি ও মজুত সংক্রান্ত নিয়মাবলী (Manufacture, Use, Import, Export and Storage of Hazardous Microorganism/ Genetically Engineered Organism or Cells Rules) প্রচলিত হয়।

১৯৯৫ সালে জাতীয় পরিবেশ ট্রাইবুনাল আইন (National Environment Tribunal Act under E.P Act 1986)

১৯৯৬ রাসায়নিক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে আপৎকালীন পরিকল্পনা, প্রস্তুতি এবং ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত নিয়মাবলী (Rules of Emergency Planning, Preparedness and Response for Chemical Accidents) প্রচলিত হয়।

উপরোক্ত আইনগুলি ব্যতীত আরও বহু আইন পরিবেশ সংরক্ষণ তথা বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য ভারতে প্রচলিত আছে। কিন্তু ভারতে পরিবেশের অবক্ষয় রোধ করা বা প্রকৃত উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখা- এর কোণটি যথার্থ অর্থে সম্ভব হচ্ছে না। ভারতে ঘটে যাওয়া সাম্প্রতিক জোশীমঠের ঘটনা এর জ্বলন্ত উদাহরণ।

হিন্দুধর্মের অন্যতম আচার্য শঙ্করাচার্য দেশের চারপ্রান্তে যে চারটি জ্যোতির্মঠ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তার অন্যতম হলো জোশীমঠ। এটি একদিকে যেমন বদ্রীনাথের প্রবেশদ্বার তেমনি শীতে তুষারপাতের কারণে বদ্রীনাথ যাওয়া সম্ভব হয়না বলে, বদ্রীনাথের মূর্তি জোশীমঠের নরসিংহ মন্দিরে নামিয়ে আনা হয়।[5] কিন্তু সনাতন হিন্দু ধর্মের তথা ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্য এই জোশীমঠ আজ মানুষের লোভের কারণে তলিয়ে যাওয়ার পথে। আনন্দবাজার পত্রিকার অভিমত অনুসারে, ২০২২ সালের ২৭ শে ডিসেম্বর থেকে ২০২৩ সালের ৮ ই জানুয়ারির মধ্যে ১২ দিনের ভূমিধ্বসে জোশীমঠের মাটি ৫.৪ সেন্টিমিটার বসে গিয়েছে।[6] পরিবেশবিদদের মতে জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য সুড়ঙ্গ নির্মাণ ও তার জন্য প্রয়োজনীয় বিস্ফোরণ, বহুতল নির্মাণ প্রভৃতি উন্নয়ণের জয়যাত্রা অব্যাহত রাখতে গিয়ে প্রাচীন এই জনপদটি আজ ধ্বংস হতে চলেছে। বহু পূর্বেই আশঙ্কা করে পরিবেশবিদরা এখানে গাছ লাগানো, পাহাড়ের ক্ষতি না করা প্রভৃতি একাধিক নিয়ম করলেও সমস্ত নিয়মকে না মেনে মানুষ তার লোভের বশবর্তী হয়ে আইনের তোয়াক্কা না করে এখানকার পরিবেশের ক্ষতি করেছে। এর মূল কারণ হল, মানুষের উন্নয়ন সংক্রান্ত ধারণাই সঠিক নয়। যা সম্পর্কে ইতিমধ্যে পঞ্চম অধ্যায়ে আমি আলোচনা করেছি। তাই স্থিতিশীল উন্নয়নের চিন্তাধারার জন্ম হয়। কিন্তু এই চিন্তাধারা পরিবেশ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে বাস্তবিকপক্ষে কতটা কার্যকরী তা আমি নিম্নে আলোচনার চেষ্টা করবো।

---

[5] জোশীমঠে জোড়া বিপাকে কেন্দ্র. (২০২৩, জানুয়ারি ১০). *আনন্দবাজার পত্রিকা*, পৃ. ১.

[6] তলিয়ে যাচ্ছে জোশীমঠ, জানাল উপগ্রহচিত্র. (২০২৩, জানুয়ারি ১৪). *আনন্দবাজার পত্রিকা*, পৃ. ১.

স্থিতিশীল উন্নয়নের প্রেক্ষিতে পরিবেশ রক্ষার বিষয়ে মূল্যায়ন

স্থিতিশীল উন্নয়নে একদিকে যেমন আছে মানুষের উন্নয়নের পরিকল্পনা, তেমনি অন্য দিকে আছে দীর্ঘমেয়াদী সামগ্রিক উন্নয়নের মধ্যে দিয়ে পরিবেশের সঙ্গে মানুষের সামঞ্জস্য রক্ষা করা। স্থিতিশীল উন্নয়নের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে হলে পরিবেশের গুণগত মানকেও বজায় রাখতে হবে। কারণ, এ বিষয়ে আমাদের কারোর মনে কোন সন্দেহ নেই যে, প্রকৃতির প্রতি আমাদের দায়িত্ব বা দায়বদ্ধতা আছে। আমরা সাধারণত অনেকে মনে করে থাকি আমাদের দায়িত্ব-কর্তব্য কেবল অন্যান্য মানুষের প্রতি বা খুব বেশি হলে মনুষ্যেত্বর প্রাণীদের প্রতি। কিন্তু প্রকৃতি তথা বিশ্ব পরিবেশের প্রতিও আমাদের দায়িত্বকে অস্বীকার করলে চলবে না। মানুষের চাহিদা পূরণের জন্য সমগ্র বিশ্ব প্রকৃতিকে আজ সংকটের সম্মুখে উপনীত হতে হয়েছে। আমাদের সীমাহীন লোভ প্রকৃতির অপরিসীম সম্ভারকে প্রয়োজনের দোহাই দিয়ে প্রতিনিয়ত হ্রাস করছে। তাই যে বিশ্বপ্রকৃতি থেকে মানুষ সকল সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করছে, তাকে রক্ষার দায়িত্ব মানুষকেই নিতে হবে। কিন্তু স্বার্থপরতা, আধিপত্য বিস্তারের মানসিকতা, প্রয়োজন সিদ্ধ হয়ে গেলে উপকারীর প্রতি দায়হীন মনোভাব মানুষের মধ্যে দেখা যায়। আধিপত্যের চিরাচরিত সংস্কার বশতঃ মানুষ প্রকৃতিকে নির্মমভাবে শোষণ করে চলেছে। কিন্তু তার পরিণতিস্বরূপ প্রকৃতি বিভিন্ন প্রাকৃতিক সংকট রূপে আমাদের থেকে প্রতিশোধ নিয়ে চলেছে। তাই নিজের জীবনকে সুরক্ষিত করার তাগিদেই হোক বা পরিবেশের প্রতি শ্রদ্ধাবশতই হোক মানুষ আজ পরিবেশ রক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছে। পরিবেশ বা ভবিষ্যৎ প্রজন্ম উভয়ের প্রতি আমাদের নৈতিক দায়িত্ব আছে। তাই বিশ্বপরিবেশকে রক্ষা করার মাধ্যমে স্থিতিশীল উন্নয়নের লক্ষ্যকে আমাদের বাস্তবায়িত করতে হবে।

যেকোন অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রকৃতির ধ্বংসের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান মানুষকেই করতে হবে। প্রকৃতির প্রতিটি উপাদানের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধার মনোভাব জাগ্রত করতে হবে। তবেই স্থিতিশীল উন্নয়ন বাস্তবায়িত হবে। এই উন্নয়ন মানুষের আগ্রাসী মনোভাবকে প্রশমিত করে প্রকৃতির ধ্বংসকে যেমন রক্ষা করবে তেমনি উন্নত জীবনযাত্রা প্রদানকারী স্থিতিশীল পথের সন্ধান মানুষকে দিতে সক্ষম হবে। এখানে পরিবেশের ধ্বংস না করেও মানুষ তার উন্নয়নের ধারা বজায় রাখতে পারবে। এ প্রসঙ্গে আগেই উল্লেখ করেছি যে, আমরা উন্নয়ন বলতে কি বুঝি এবং প্রকৃত উন্নয়ন বলতে কি বুঝবো। তাই আমাদের প্রকৃত উন্নয়নের দিশা নির্দেশ করতে হবে স্থিতিশীল উন্নয়নকে হাতিয়ার করে। যেখানে স্বাস্থ্যের উন্নয়ন, শিক্ষার উন্নয়ন, মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি প্রভৃতিকে উন্নয়নের প্রকৃত সূচক হিসাবে দেখা হবে। সর্বোপরি এর মাধ্যমে মানুষ যে গুণগত জীবনের সন্ধান পাবে তা অবশ্যই পরিবেশ রক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

মানুষের কল্যাণ শুধুমাত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নকে কেন্দ্র করেই হতে পারে- এমন ধারণা যে ভুল তা বহু দার্শনিক তথা বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বহুবার বলেছেন। পূর্বে উন্নয়ন বিষয়ক অধ্যায়ে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এখন এটুকুই বলার চেষ্টা করা হচ্ছে যে, বিলাসবহুল বৈভবময় জীবন শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের একমাত্র লক্ষ্য হতে পারে না। কারণ মানুষের মধ্যে নৈতিকতা, নান্দনিকতা, শিল্পবোধ এবং সহযোগিতার মনোভাব বর্তমান। উন্নয়নের রথের চাকায় অবশ্যই প্রকৃতির ক্ষতি হবে, কিন্তু মানুষকে তার অদম্য ইচ্ছাশক্তিকে কাজে লাগিয়ে সেই ক্ষতিপূরণ করে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য সচেষ্ট হতে হবে। শুধুমাত্র নিজের প্রয়োজন মেটানোর কথা

মানুষ যদি ভাবে তবে মানুষের নৈতিকতার যেমন স্খলন ঘটে, তেমনি অন্তিমে মানুষের নিজের অস্তিত্ব চরম সংকটের সম্মুখীন হয়।

মানুষ প্রকৃতির প্রভু নয় বা তাদের সম্পর্ক ভোগ্য বা ভোক্তার নয়- একথা মানুষকে প্রথমে উপলব্ধি করতে হবে। প্রাকৃতিক সম্পদের কার্যকরী ও যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে সমাজ ও সরকারের মধ্যে পরিবেশকে অর্থনৈতিক মূলধন হিসেবে দেখার যে দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে, তা যত শীঘ্র সম্ভব বদলাতে হবে। বহু পরিবেশবিদ মনে করেন পরিবেশের ক্ষেত্রে আমাদের আচরণে প্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধা এবং জীবনের প্রতি সম্ভ্রম থাকা প্রয়োজন। প্রত্যেকটি প্রাণযুক্ত বস্তুর এবং নিষ্প্রাণ উপাদানের তদনুসারে স্বতন্ত্র নৈতিক মর্যাদা থাকা উচিত এবং তারা সকলেই স্বতঃমূল্যবান। সুতরাং প্রকৃতিকে শুধুমাত্র উপাদান রূপে গ্রহণ করে স্থিতিশীল উন্নয়নকে ব্যাখ্যা করা উচিত নয়। প্রকৃতিকে যদি তার প্রাপ্য স্বীকৃতি দিতে হয় তাহলে স্থিতিশীল উন্নয়নের এমন একটি আঙ্গিক অনুসন্ধান করে বের করতে হবে যেখানে অর্থনৈতিক উন্নতি লাভের প্রসঙ্গ জড়িত নয়। তাই স্থিতিশীল উন্নয়নকে শুধুমাত্র মূলধনের প্রেক্ষিত থেকে বিচার না করে মানুষের প্রকৃত কল্যাণ তথা সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতির কল্যাণের প্রেক্ষিতে বিচার করতে হবে। এর অন্যতম পদক্ষেপ হল প্রকৃতির প্রত্যেকটি উপাদানে স্বতঃমূল্যকে স্বীকার করা। প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল না হয়ে বা প্রকৃতিকে ব্যবহার না করে কোন জীবের পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। মানুষের ক্ষেত্রেও একথা আবশ্যিকভাবে প্রযোজ্য। তাই যারা মনে করেন যে, এই প্রাণিজগৎ, উদ্ভিদ জগৎ, জড়জগৎ প্রভৃতি পরিবেশের সমস্ত কিছুই মানুষ তার নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারে, তারা নিজেদের স্বার্থে সাময়িক তথাকথিত উন্নয়নের দোহাই দিয়ে পরিবেশকে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করে চলেছে। এর

দ্বারা অন্যান্য প্রাকৃতিক উপাদানের সঙ্গে মানুষও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। গ্রীন হাউস এফেক্টের কথা আমরা সবাই শুনেছি, অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্রে শিল্পের ব্যাপকতা থেকে এর উদ্ভব। এর ফলে ওজোন স্তরে ক্ষতি, বায়ুমন্ডলের উষ্ণতা বৃদ্ধি, মেরু প্রদেশের বরফ গলে যাওয়া প্রভৃতি প্রত্যক্ষ সমস্যা আমরা প্রতিনিয়ত দেখছি। এছাড়া এগুলির ফলে সৃষ্ট পরিবেশগত অন্যান্য সমস্যা তো আছেই; যা শুধুমাত্র উদ্ভিদ ও অন্যান্য প্রাণী জগতকেই নয়, মানুষের জীবনকেও অনিশ্চিত করে তুলেছে। নিম্নে কয়েকটি যুক্তির মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করবো যে স্থিতিশীল উন্নয়নের মূল ভাবধারাকে বজায় রাখতে হলে পরিবেশ সংরক্ষণ কতটা জরুরি।

প্রথমতঃ ব্যবসায়িক লাভের আশায় বা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের কথা চিন্তা করে বহু দেশের সরকার অরণ্য ধ্বংস করে সেখানে জনবসতি গড়ে তুলেছে বা বৃহৎ নদীতে বাঁধ সৃষ্টি করে বিদ্যুৎ এবং অন্যান্য প্রয়োজন নিবারণ করছে। এর জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হল আমাজনের জঙ্গল প্রতিনিয়ত হ্রাস পাওয়া। প্রকৃতির স্বতঃমূল্য বা তার অধিকারের চিন্তা এই সময় শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের অন্তরে জাগ্রত হয় না। কিন্তু এই প্রকার প্রকৃতি বিনাশী উন্নয়নের মেয়াদ স্বল্প। এর পরিণতি হিসাবে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম একটি দূষিত, রুক্ষ, সবুজ বিহীন পৃথিবীর সদস্যরূপে নিজেদের খুঁজে পাবে। এই যে জীবনের সংকটের সম্মুখে আমরা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে উপনীত করছি, সেই বিষয়ে দায়িত্বশীল, কর্তব্যপরায়ণ পূর্বপুরুষ হিসাবে আমাদের কর্ম প্রণালী এখন থেকেই নির্ধারণ করা উচিত। অর্থাৎ আজ প্রকৃতির ক্ষতির মাধ্যমে পক্ষান্তরে মানুষ তার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থকে বিঘ্নিত করছে- যা কখনোই স্থিতিশীল উন্নয়নের মূল ভাবধারার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

দ্বিতীয়তঃ উন্নয়নের জন্য মানুষ যদি ভাবে পরিবেশের স্বল্প পরিমাণে ক্ষতি সাধন করবে এবং এমনটা করলে স্থিতিশীল উন্নয়নের লক্ষ্য বাস্তবায়িত হবে- তবে সেই কথাও আমার যথার্থ বলে মনে হয় না। কারণ কত পরিমান প্রকৃতির ক্ষতি করলে তা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রয়োজন পূরণের জন্য ক্ষতিকারক হবে না এবং কতটা প্রকৃতির ক্ষতি করলে তা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উপর প্রভাব ফেলবে- এর কোন যথার্থ মানদণ্ড এখনো পর্যন্ত আবিষ্কার করা সম্ভব হয় নি। তাই একজন ব্যক্তি 'X' বা একটি রাষ্ট্র 'Y' নিজের বা রাষ্ট্রের স্বার্থে প্রকৃতির কত পরিমান ক্ষতি সাধন করছে তা তাদের আপেক্ষিক প্রয়োজনীয়তার উপর নির্ভর করে। চাহিদা, ভোগ ও প্রকৃতিকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন। তাই প্রত্যেকে তাঁর সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং নৈতিকতার প্রেক্ষিত থেকে প্রকৃতির কতটা ক্ষতি করে নিজের প্রয়োজন পূরণ করবে- সেই বিষয়ে নিশ্চিতভাবে আমরা কিছু বলতে পারি না। এর থেকে প্রমাণিত হয়, একথার কোন অর্থ নেই মানুষ স্থিতিশীল উন্নয়নের মূল ভাবধারা বজায় রাখবে; অর্থাৎ মানুষ কেবল তার আবশ্যিক প্রয়োজন পূরণ করবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রয়োজনের ক্ষতি সাধন না করে। তাই মানুষ যদি নিজের প্রকৃতির প্রতি নিজের দৃষ্টিভঙ্গিকে পরিবর্তন করে শ্রদ্ধাশীল দৃষ্টিতে প্রকৃতিকে নিজের বা নিজের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ভোগের সামগ্রী হিসাবে না দেখে- তবেই একমাত্র পরিবেশের ধ্বংস কিছুটা হলেও রোধ করা সম্ভব হবে।

তৃতীয়তঃ আজকের গতিময় জীবনে আমাদের কাছে অবসরের সময় কম। তাই গল্প সাহিত্যের বিষয় নিঃসর্গ প্রেম, প্রাকৃতিক শোভা প্রভৃতি প্রকৃতির মূল আকর্ষণগুলির বদলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম হয়তো প্রযুক্তির প্রতি অধিক আকৃষ্ট হয়ে উঠবে। সেখানে হৃদয়-বৃত্তির কোন জায়গা হয়তো থাকবে না। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম হয়তো প্রকৃতির সেই নিস্তব্ধ

সৌন্দর্যের আবেদন যন্ত্রের বেড়াজালে বড় হয়ে উপলব্ধি করতেই পারবে না। কিন্তু একথা মানতেই হবে আজও যন্ত্রময় জগতে প্রচন্ড পরিশ্রমের পর আমাদের বেশিরভাগেরই খোলা প্রকৃতির বুকে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে ভালো লাগে। তাই ভবিষ্যৎ প্রজন্মেরও তেমনটা লাগবে -এমন আশা করা যায়। কিন্তু আমার যুক্তি হল, ভালো লাগা বা মন্দলাগা বিষয়টির উপর পরিবেশের কোন উপাদানের সংরক্ষণ বা ধ্বংস হওয়া উচিত নয়। কারণ মানুষ হিসাবে আমাদের যেমন নিজের মূল্য আছে, প্রকৃতির প্রত্যেকটি উপাদানেরও নিজস্ব মূল্যকে বা স্বতঃমূল্যকে স্বীকার করতে হবে। তাই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ভালো লাগুক বা না লাগুক, প্রয়োজন হোক বা না হোক পরিবেশের স্বার্থেই পরিবেশকে রক্ষা করা আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। তবেই একমাত্র পরিবেশের প্রকৃত সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে এবং স্থিতিশীল উন্নয়নের যে সাতেরটি লক্ষ্যের কথা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে, তার কিছুটা হলেও বাস্তবায়িত হবে।

কিন্তু এক্ষেত্রে সমস্যা হলো, মানুষ স্বার্থপর জীব। তত্ত্বগতভাবে মানুষ যতই পরিবেশ সংরক্ষণ নিয়ে আলোচনা করুক না কেন, নিজের অর্থনৈতিক সুবিধার জন্য পরিবেশের ক্ষতি করতে বিন্দুমাত্র পিছুপা হয় না। তখন মানুষের সাময়িক লাভের কথাই মনে থাকে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ করতে হবে বা পরিবেশের প্রতি শ্রদ্ধাশীল দৃষ্টিভঙ্গিতে তাদের স্বকীয় মূল্য স্বীকার করতে হবে- এসব কার্যক্ষেত্রে বেশীরভাগ মানুষের মনে থাকে না। তাই পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন দেশে অনেক আইন করা হয়েছে, যা লঙ্ঘন করলে মানুষকে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু পরিবেশ সংরক্ষণের এই ধারণা বহু যুগ পূর্বে বৈদিক চিন্তায় আমরা

দেখতে পাই। যা নিয়ে ইতিমধ্যে দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। এখন আমরা দেখার চেষ্টা করবো বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে প্রাচীন বৈদিক চিন্তা কতটা প্রাসঙ্গিক।

বৈদিক চিন্তাধারার প্রেক্ষিতে পরিবেশ রক্ষার বিষয়ে মূল্যায়ন

বেদে প্রকৃতিকে বাঁচানোর তাগিদে ও প্রাকৃতিক সম্পদের সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের প্রয়োজন উপলব্ধি করতে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বৈদিক ঋষিদের দেখতে পাওয়া যায়, যা একাধারে পরিবেশের অপব্যবহার রোধ করে প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করে, অন্যদিকে প্রাকৃতিক সম্পদের সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের প্রয়োজন বর্তমানের স্থিতিশীল উন্নয়নের মূল ভাবধারা যে সে যুগেও ছিলো, তা বুঝতে সাহায্য করে। বৈদিক ঋষিগণ প্রকৃতির সবকিছুর উপরে পবিত্র সত্তা আরোপ করেছেন। ঋগ্বেদের ‘নদীস্তুতিসুক্তে’ একদিকে যেমন নদী নিয়ে গোটা স্তব রচিত হয়েছে, তেমনি অথর্ববেদের ‘পৃথিবীসুক্তে’ পৃথিবী বা মাটি সংরক্ষণের ভাবনা দেখতে পাওয়া যায়। অথর্ববেদ জুড়ে রয়েছে প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যের বিপুল বর্ণনা। এখানে বলা হয়েছে যা কিছু স্বর্গীয় তার পার্থিব রূপ প্রকৃতি। বেদে প্রকৃতিকে যেভাবে দেখা হয়েছে বা পরিবেশ তথা প্রাণীকে সংরক্ষণের জন্য যে দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা হয়েছে, সেগুলির কয়েকটি নিম্নে বর্ণনা করা হল;

অলৌকিক শক্তির আধার প্রকৃতি

বেদে যেমন দেবদেবীর উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, তেমনি প্রকৃতির সমস্ত উপাদানকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ও অলৌকিক শক্তির আধার হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এটি আসলে পরিবেশকে বাঁচানোর একটি কৌশল বলে মনে

হয়। অর্থাৎ অলৌকিকতার মোড়কে যদি প্রকৃতিকে উপস্থাপন করা হয় তবে সে যুগের ধর্মভীরু মানুষ অলৌকিক শক্তির আধার হিসাবে প্রকৃতির ক্ষতি করবে না- এমন চিন্তা বৈদিক ঋষিদের মধ্যে ছিল বলে মনে হয়। তাই ঋগ্বেদের ধর্ম পরিবেশ সম্পৃক্ত, যদিও তা ভিন্ন প্রকৃতির। দেবতারা সেখানে অতিমানব হলেও পশু আকৃতির নন। প্রকৃতির বিচিত্র শক্তি নিয়ন্ত্রণকারী এই দেবতাগণ, তারা দিন-রাত্রির আবর্তনের নিয়ন্তা এবং তার রক্ষার দায়িত্বে আছেন বিভিন্ন দেবতা, যেমন– উষস (ভোরের দেবী), সূর্য এবং অশ্বিনগণ (রথে চড়ে প্রভাতরশ্মি বিকিরণ কারী)। বৃষ্টি, বন্যা, বজ্র এবং যুদ্ধের অধিষ্ঠাতা হলেন ইন্দ্র, তিনি পুরোহিতদের পৃষ্ঠপোষক, শত্রুহন্তা। ইন্দ্রের পরেই দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ দেবতা হলেন অগ্নি। বৈদিক মন্ত্রে অগ্নির উপস্থিতি সর্বাধিক। তিনি ধূম সদৃশ ধ্বজের সাহায্যে আলো বিকিরণ করেন। বরুণ ও মিত্র সূর্য ও স্বর্গের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণকারী। আবার দেবী সরস্বতীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় নদীসমূহ।

প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের বন্ধুত্বপূর্ণ সহাবস্থান

বেদে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সংযোগ স্থাপন করতে বলা হয়েছে, যা মানুষের পরিপূর্ণ চেতনার উন্মেষ ঘটাতে সাহায্য করে। প্রায়শই দেবতাদের আচরণের উপমা হিসাবে প্রাণীদের প্রসঙ্গ টানা হয়ে থাকে, যেমন- ইন্দ্র বৃষের ন্যায়, মরুৎগণ সিংহের মতো গর্জন করেন ইত্যাদি। প্রকৃতি চেতনার মধ্য দিয়েই সকলের সুখের কথা বলা হয়েছে। তাই বেদে সকলের মঙ্গলের কথা শুনতে পাওয়া যায়, অর্থাৎ মানুষ ও প্রকৃতির মধ্য বন্ধুত্বপূর্ণ সহাবস্থান স্থাপিত হলে তবেই সকলে এই পৃথিবীতে একে অপরের পরিপূরক হয়ে শান্তিতে বিরাজমান হতে পারবে।

প্রকৃতিকে শ্রদ্ধা ও সংরক্ষণ

বৈদিক ঋষিগণ বারংবার প্রকৃতিকে শ্রদ্ধা করার কথা বলেছেন। তাঁদের এই শ্রদ্ধার মধ্যেই প্রকৃতিকে সংরক্ষণের বীজ বপন করা আছে। ঋক,সাম,যজু ও অথর্ববেদে প্রকৃতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে তাকে রক্ষণাবেক্ষণ, মানুষ ও প্রকৃতিকে সামগ্রিকভাবে দেখা, পরিবেশের প্রত্যেকটি উপাদানকে যত্ন সহকারে সংরক্ষণ তথা শ্রদ্ধার বাণী বেদের ছত্রে-ছত্রে নিহিত আছে। বৈদিক সাহিত্যে পরিবেশকে একটি বন্ধুত্বপূর্ণ বাসস্থান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তাই অথর্ববেদের পৃথিবীসুক্তে বলা হয়েছে- আমরা যেন পৃথিবীর প্রাণ বা হৃদয়কে আঘাত না করি। এমনকি ঋগ্বেদে জল সংরক্ষণ, পরিবেশের ক্ষেত্রে জলের তাৎপর্য ইত্যাদি বৈদিক ঋষিদের আলোচনায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।[7] সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে প্রাচীন সেই বৈদিক জ্ঞানের অভাব আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। বর্তমানে পরিবেশকে নষ্ট করার ফল হিসাবে বহু প্রজাতিকে বিলুপ্ত হয়ে যেতে দেখছি, অরণ্য ধ্বংস হয়ে চলেছে, মাটি, বাতাস, জল এখন প্রায় দূষিত। কিন্তু বেদের মধ্যে প্রকৃতিকে শ্রদ্ধা ও সংরক্ষণের ভাবনা বহু পূর্বেই নিহিত ছিল। কিন্তু স্বার্থপর মানুষের মাত্রাহীন লোভ এবং প্রকৃতির উপরে যথেচ্ছাচার বৈদিক শিক্ষাকে বাস্তবায়িত করতে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করেনি।

বাস্তুতন্ত্রে সামঞ্জস্যবিধান

অথর্ববেদের পৃথিবীসুক্তে বৈদিক ঋষিগণ পৃথিবী মাতার প্রতি মানবজাতির স্থায়ী আনুগত্যের কথা বলেন। পৃথিবীকে মা এবং মানুষকে তাঁর পুত্র হিসাবে দেখার প্রাচীন

[7] Sharma. N. (2015). Environmental awareness at the time of Vedas. *Ved-Vidya*, Vol-26. NO-4, Pg-221-224

দৃষ্টিভঙ্গি বেদে দেখতে পাওয়া যায়। এইভাবে বেদে প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানকে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ করে বাস্তুতন্ত্রের মধ্য সামঞ্জস্যবোধের চেষ্টা বৈদিকযুগে দেখা গিয়েছিল। আজ থেকে প্রায় পাঁচ বছর পূর্বে বৈদিক মানুষজন প্রকৃতিকে ক্ষতি না করা, জল ও ফুলের ক্ষতি না করা, জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে, বায়ুতে, ফসলে, ফুলে-ফলে তথা সমস্ত প্রাণে শান্তিরক্ষার বাণী প্রচার করেছেন। এর মধ্যে দিয়ে প্রকৃতির সকল উপাদানের সামঞ্জস্যবিধানের কথাই উল্লেখ করার চেষ্টা করা হয়েছে।[৪]

পরিবেশ তথা প্রাণীকে সংরক্ষণের জন্য এসব দৃষ্টিভঙ্গি বেদে গ্রহণ করা হলেও বৈদিক চিন্তার মধ্যেও অসঙ্গতি দেখতে পাওয়া যায়। বৈদিক দেবতাদের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য মন্ত্র ছাড়াও পশুবলির নিয়ম রয়েছে। যেমন- ছাগল, বৃষ, গাভী, মেষ, অশ্ব প্রভৃতি গৃহপালিত পশুদের বলির বিধান রয়েছে।

প্রাকৃতিক জিজ্ঞাসার প্রত্যক্ষ নিদর্শন দেখা যায় ঋগ্বেদের সৃষ্টিমন্ত্রে। নৈতিকতার বিষয়টি পরিলক্ষিত হয় যাজ্ঞবল্ক্যের নিজের স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে সকলের প্রতি ভালোবাসার উপদেশ দানের কাহিনীর মধ্য দিয়ে। এই মনোভঙ্গি গৃহপালিত প্রাণীদের প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিগত পরিবর্তনের সূচক। অথর্ববেদে গো হত্যা নিন্দনীয় হয়েছে, শতপথ ব্রাহ্মণের বিভিন্ন পঙক্তিতে গোরু ও ষাঁড়কে পৃথিবীর ধারণকারী হিসাবে বর্ণনা করে তাদের হত্যা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যদিও যাজ্ঞবল্ক্য তা ভক্ষণের পরামর্শ দিয়েছেন 'যদি তা নরম হয়'- এই শর্ত আরোপ করে।[৯]

---

[৪]গোস্বামী, পলাশ. (২০২৩, ফেব্রুয়ারী ২২). বেদে মেলে প্রকৃতিরক্ষার বার্তা. *আনন্দবাজার পত্রিকা, অনলাইন.* https://www.anandabazar.com/editorial/the-four-vedas-give-the-message-to-conserve-nature-and-environment-1.1094466

[৯] মুখার্জ্জী, জিনিয়া (অনু.). (২০১৫). *মানুষ ও পরিবেশ.* কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স. পৃঃ ৭৪-৭৬.

বাস্তবে ষাঁড় বলি সুপ্রচলিত ছিলো, উত্তরপ্রদেশের অত্রঞ্জিখেরায় প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের ভিত্তিতে বিশেষজ্ঞদের অভিমত খ্রিষ্টীয় ৫০০ অব্দের পূর্বে খাদ্যের প্রধান অংশ ছিলো গোমাংস। বুদ্ধ অনেক আগে এর বিরোধিতা করেন, অশোকের অনুশাসনে প্রকাশ্য প্রাণীহত্যা ও প্রাণীহত্যার অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ করা হয়। তখনও যে পশুবলি ছিলো সুপ্রচলিত, এটি তাই প্রমাণ করে।[10]

বৈদিক যজ্ঞে পশুহত্যার বিধি

বেদে পশুযাগের প্রথা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। দৈক্ষ ও প্রাজাপত্যপশু হল পশুযাগের প্রকৃতিদ্বয়। এটিকে 'নিরূঢ় পশুবন্ধ' নামেও অভিহিত করা হয়। পশুযাগে পশুই আহুতির বস্তু। পশুযাগের দেবতা হলেন ইন্দ্র, অগ্নি ও সূর্য। এই যাগে পশুর সমস্ত অঙ্গ আহুতিযোগ্য নয়, হৃদযন্ত্র বা মেদ হলো আহুতিযোগ্য অঙ্গ। পলাশ, খাদির, বিলম্ব, রোহিতক এই চারপ্রকার বৃক্ষের কাষ্ঠ দিয়ে নির্মিত যূপকাষ্ঠ বা হাড়িকাঠে বলিপ্রদানের বিধি। এই কাষ্ঠভেদে ঐহিক ও পারত্রিক ফললাভের বিভিন্নতা আছে। যজ্ঞবেদীর পূর্বপ্রান্তে যূপকাষ্ঠ স্থাপন করা হয়। একটি শারীরিক ভাবে নিখুঁত পুরুষ প্রাণীই বলির জন্য উপযুক্ত। বলির পশুটিকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়,একে 'সংজ্ঞপন' বলা হয়। যজ্ঞস্থলের উত্তর পূর্বে 'শামিত্র' নামক স্থানে পশুদেহের ব্যবচ্ছেদ করা হয় এবং সেই কৃতকর্মে নিযুক্ত পুরোহিত 'শমিতা' নামে অভিহিত। অধ্বর্যু নামক পুরোহিত বলিপ্রদত্ত পশুকে অগ্নিতে আহুতি দেন।

[10] তদেব. পৃঃ ৭৪-৭৬.

পশুযাগে পশুর সংজ্ঞপন বা শ্বাসরোধজনিত হত্যাকে বধ বলে মনে করা হয় না। বৈদিক মতে এটি পাপ নয়। বলিপ্রদত্ত পশুর আত্মা দেবতার সঙ্গে সম্মিলিত হয়- এই ধারণা আছে।

"ন বা উ এতন্ ম্রিয়সে ন রিষ্যসি দেবা-

ইদেসি পথিভিঃ সুগেভিঃ।"[11]

-হে পশু, তুমি মৃত্যুবরণ করছো না, দেবতার সান্নিধ্যে যাচ্ছ।

মনুও বলেছেন 'যজ্ঞে বধোহবধঃ', অর্থাৎ যজ্ঞে উৎসর্গীকৃত পশু বধ অবধের তুল্য।

পশুহত্যা বিষয়ে মূল বৈদিক ভাবধারার সঙ্গে অসংগতি

উপরের আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট যে বেদে পশুবলির বিধান ছিল। যদিও বেদের আলোচনায় আমরা দেখেছি সেখানে পরিবেশ রক্ষা বা পশুদের রক্ষার বিষয়ে বৈদিক ঋষিগণ খুবই যত্নশীল। কিন্তু তথাপি পশুহত্যাকে খুবই পবিত্র কাজ বলে গণ্য করা হতো, এমনকি যজ্ঞের জন্য পশুহত্যার হিংসা থেকে মুক্ত হিসাবে দেখানোর চেষ্টা করা হতো। কিন্তু বর্তমানে যেকোনো শুভবুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষিত মানুষ একথা অনুধাবন করতে পারে যে, যেকোন যুক্তিতেই পশুহত্যা অন্যায়। তাই বৈদিক পশুযাগের যে রীতি প্রচলিত ছিল। এখনও সেই রীতিকে অনুসরণ করে বহু ধর্মস্থানে পশুহত্যার প্রথা প্রচলিত আছে, তাই বেদে অহিংস চিন্তাধারার সঙ্গে এই যজ্ঞের প্রয়োজনে বা দেবতার উদ্দেশ্যে যে পশুহত্যাকে যথার্থ বলা হয়েছে - তাকে বর্তমানে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ কখনও মেনে নিতে পারবে বলে মনে হয় না। অর্থাৎ পশুবধ বিষয়ে বৈদিক যজ্ঞে

[11] বসু, যোগীরাজ. ২০১৫. বেদের পরিচয়. কলকাতা: ফার্মা-কে.এল.এম প্রাইভেট লিমিটেড. পৃঃ- ১২৬-১২৮.

উল্লিখিত বক্তব্য ও বৈদিক শিক্ষায় পশুদের প্রতি অহিংস হবার বাণী যথেষ্ট সংগতিপূর্ণ নয়।

আধুনিক শিক্ষিত মানব সম্প্রদায় ঐশ্বরিক ভীতি বা প্রাকৃতিক অলৌকিকতার উর্দ্ধে ভাবতে অভ্যস্ত

বর্তমানে একবিংশ শতাব্দীতে উপনীত হয়ে এমন আশা করা খুবই ভুল, পূর্বের মতো মানুষ প্রকৃতিক ঘটনাকে ঈশ্বরের শক্তি বলে ভয় পাবে। স্বাভাবিক বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনার বৈজ্ঞানিক কারণ আজ শিক্ষিত মানুষ জানে। এমনকি বর্তমানে বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে মানুষ অনেক প্রাকৃতিক বিপর্যয় পূর্ব থেকে জানতেও পারে। যদিও প্রকৃতির ভয়াবহতার সামনে মানুষ আজও অসহায়। কিন্তু ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে বা ঈশ্বরের সঙ্গে প্রকৃতিকে একাত্ম করে পূর্বে যেভাবে বৈদিক ঋষিরা প্রকৃতিকে রক্ষা করার চেষ্টা করতেন, সেভাবে বর্তমানে করা সম্ভব বলে মনে হয় না। তাই আজ প্রকৃতিকে রক্ষা করতে গেলে একটা বিশেষ দার্শনিক চিন্তাধারা প্রয়োজন। যার ওপর ভিত্তি করে মানুষ ধর্মের উর্দ্ধে উঠে প্রকৃতির জন্য প্রকৃতির রক্ষার বিষয় ব্রতী হতে পারবে।

যদিও ছান্দোগ্য উপনিষদে ধার্মিকদের জীবের প্রতি আঘাত থেকে বিরত থাকার কথা রয়েছে, তৎসত্ত্বেও বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মেই অহিংসাকে সমধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু পরিবেশ সংরক্ষণের এই ধারণা বহু যুগ পূর্বে বৌদ্ধ ধর্মে আমরা দেখতে পাই। যা নিয়ে ইতিমধ্যে চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। কিন্তু একটু খেয়াল করে দেখলে দেখা যাবে, মানুষের উন্নয়ন ও পরিবেশ সংরক্ষণের মধ্যে একটি সামঞ্জস্যের বিধান (যা

আমার অভিসন্দর্ভের মূল উদ্দেশ্য) বৌদ্ধ দর্শনের আলোচনায় রয়েছে। আমার মনে হয়, বর্তমানে মানুষের এমনই একটি দার্শনিক চিন্তাধারার প্রয়োজন, যার উপর ভিত্তি করে মানুষ পরিবেশের ধ্বংস রোধ করতে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করবে। এই বিষয়ে বৌদ্ধ দর্শন আমাদের প্রকৃত দিশা দেখাতে পারে।

বৌদ্ধ দর্শনের প্রেক্ষিতে পরিবেশ রক্ষার বিষয়ে মূল্যায়ন

তথাকথিত উন্নয়নের জোয়ারে মানব সমাজ আজ বিভোর হয়ে পড়েছে। তারা এই সত্য দেখতে অসমর্থ্য যে, উন্নয়ন অর্জনের পাশাপাশি মানব সভ্যতা এবং পৃথিবীর অস্তিত্ব ধ্বংসের দোরগোড়ায় উপনীত হয়েছে। এর অন্যতম কারণ পরিবেশের ক্ষতি। তাই এই পরিবেশগত সংকট দূর করতে পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্র তথা মানব সমাজ স্থিতিশীল উন্নয়নকে একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেছে। পরিবেশের অবনতি রোধ করতে স্থিতিশীল উন্নয়নের চিন্তাধারা মানুষ আজ থেকে গ্রহণ করেনি, বরং মানুষের প্রাচীন চিন্তাধারাকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় পূর্ব থেকেই এই ভাবনার অস্তিত্ব ছিল। এমনকি প্রাচীন বহু ধর্মীয় শিক্ষায় স্থিতিশীল উন্নয়নের মাধ্যমে সভ্যতার অগ্রগতি এবং পরিবেশের অবক্ষয় রোধের অদ্ভুত সামঞ্জস্য দেখা যায়। হয়তো তখনো স্থিতিশীল উন্নয়ন নামে বিষয়টি প্রকাশ পায়নি, কিন্তু চিন্তাধারার যে প্রকাশ তা অনেকাংশে বর্তমানে স্থিতিশীল উন্নয়নের ভাবধারার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এর মধ্যে অন্যতম হলো, বৌদ্ধ ধর্মের চিন্তা ও ভাবধারা, যা আমাদের বহু যুগ পূর্ব থেকেই পরিবেশের সুরক্ষা ও স্থিতিশীল উন্নয়নের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রদান করছে। বৌদ্ধ দর্শনের এই চিন্তা শুধুমাত্র শিক্ষার পর্যায়ে সীমাবদ্ধ ছিলনা, এই চিন্তার প্রতিফলন তাদের প্রাত্যহিক বিভিন্ন ধর্মীয় পদ্ধতি ও আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যেও দেখতে পাওয়া

যায়। বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে পরিবেশ রক্ষা এবং স্থিতিশীল উন্নয়ন বিষয়ক দার্শনিক চিন্তার প্রতিফলন কেবল তাত্ত্বিক পর্যায়ে নয়, প্রয়োগের ক্ষেত্রেও তা দেখতে পাওয়া যায়। যেমন বৌদ্ধ দার্শনিকরা শীলকে বৌদ্ধ ভিক্ষু তথা সাধারণ গৃহী সকলের জন্য পালনীয় বলেন।

পরিবেশ বলতে কি বোঝায় বা পরিবেশগত সংকট কিভাবে মানুষের লোভের জন্য দেখা দিচ্ছে- সেই বিষয়ে পূর্ববর্তী বহু অধ্যায়ে বিশদে আলোচনা করা হয়েছে। তাই সেই বিষয়ে আমার আলোচনা দীর্ঘায়িত করার প্রয়োজন নেই। শুধু বলবো, আধুনিক তথাকথিত উন্নয়নের জোয়ারে মানুষ ভাসলেও প্রকৃতি ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশের উপর মানুষ তথা অন্যান্য জীবকুলের জীবন অনেকাংশেই নির্ভরশীল। তাই পরিবেশের অবক্ষয় একদিকে যেমন বাস্তুতন্ত্রকে ধ্বংস করে বিভিন্ন প্রজাতির বিলোপ সাধন করে, তেমনি মানুষের সুস্থভাবে বেঁচে থাকাও প্রতিনিয়ত এই পরিবেশ সংকটের মধ্যে অসম্ভব হয়ে পড়ছে। পরিবেশের অবক্ষয় বিষয়ে জাতিসংঘ থেকেও মানুষকে সচেতন করা হয়েছে। এখন যা পরিস্থিতি তাতে এই পরিবেশের অবক্ষয় আমাদের বহু রাষ্ট্রের ওপর ভয়াবহ প্রভাব ফেলছে। এর ফলশ্রুতি তুরস্কে সাম্প্রতিক ভূমিকম্প বা জোশীমঠের ব্যাপক ভূমিধ্বস থেকে স্পষ্ট। বৌদ্ধ দর্শনের তথা ধর্মে যে উপদেশ বা দার্শনিক চিন্তাধারা গ্রহণ করা হয়েছে সেখানে মানুষ এবং প্রকৃতির মধ্যে সম্পর্কের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বৌদ্ধ দর্শনে প্রকৃতির সঙ্গে স্বাভাবিক বন্ধুত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। বৌদ্ধদের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণ করে দেখানো যেতে পারে যে তা পরিবেশগত সংকট দূর করতে কতটা কার্যকরী।

বৌদ্ধ প্রতীত্যসম্যুৎপাদ তত্ত্ব পরিবেশ সংরক্ষণে কার্যকরী

'প্রতীত্যসম্যুৎপাদ' শব্দের অর্থ কিছু থেকে উৎপত্তি। এই জগতে অকারণে বা বিনা কারণে কোন কিছু ঘটে না। এই জগতের প্রত্যেকটি ঘটনা বা বস্তু একটি অন্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এই বিশ্বের সব কিছুই একটি বৈচিত্র্যময় ও প্রাণবন্ত উপায় বিদ্যমান। প্রতীত্যসম্যুৎপাদ বা কার্যকারণ তত্ত্বের ধারণা অনুসারে এই মহাবিশ্ব একটি সমগ্র, যার অভ্যন্তরে সবকিছু পারস্পরিক নির্ভরশীলতার সম্বন্ধে আবদ্ধ। তাই এই মহাবিশ্বে কোন কিছুর ক্ষতি হলে অন্য সবকিছুর ওপর তার প্রভাব পড়ে। তাই মানুষ ও প্রকৃতির পারস্পরিক সম্পর্কটিও এর ব্যতিক্রম নয়। প্রকৃতির ব্যাপক ক্ষতি মানব তথা সমগ্র পৃথিবীর অস্তিত্বের জন্য সংকটের কারণ স্বরূপ। মানুষও প্রকৃতির সম্পর্ক বেঁচে থাকা (Survival) ও অগ্রগতির (Development) সঙ্গে যুক্ত। এর মধ্যে একটি ক্ষতিগ্রস্ত হলে অন্য উপাদানের ওপর ব্যাপকভাবে প্রভাব পড়ে। এর কারণ বৌদ্ধ প্রতীত্যসম্যুৎপাদ তত্ত্বের মধ্যে রয়েছে, তা হল সবকিছু কার্যকারণ সম্বন্ধে আবদ্ধ। এই তত্ত্ব বারোটি কার্যকারণ শৃঙ্খলের উল্লেখ করেছে। তথ্য অনুসারে জগতের সব কিছুই কোন না কোন কারণ থেকে এসেছে।[12] তাই প্রকৃতির কোন উপাদানের ক্ষতি সাধন আমাদের করা উচিত নয়। মানুষ কেবল নিজের জীবনধারণের জন্য প্রকৃতি থেকে যতটা নেওয়া প্রয়োজন কেবল ততটাই নেবে। উন্নয়নকে কার্যকরী করতে যদি মানুষ তার অতিরিক্ত গ্রহণে আগ্রহী হয় তবে সমগ্র সৃষ্টি ধ্বংসের সম্মুখীন হবে। বুদ্ধদেব

---

[12] চৌধুরী, সুকোমল. (সম্পা.). (১৯৯৭). *গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন.* কলকাতা: পরিবেশক প্রেস. পৃঃ ৯৫-১০০.

পারস্পরিক নির্ভরশীলতার তত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারলে প্রকৃতির ওপর মানুষের অধিকার বোধের পরিবর্তে শ্রদ্ধা, প্রেম, মৈত্রী, করুণা জাগ্রত হবে। এমন হলে তবেই বৌদ্ধ শিক্ষার অন্যতম পঞ্চশীলকে আশ্রয় করে এবং প্রতীত্যসম্যুৎপাদকে পাথেয় করে পরিবেশের অবক্ষয় রোধ করা যাবে।

বৌদ্ধধর্ম তিন ধরনের সম্পর্কের ওপর জোর দেয়- মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে সম্পর্ক, মানুষের সঙ্গে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক, এবং নিজের সঙ্গে নিজের সম্পর্ক। বৌদ্ধধর্ম মানব ও পরিবেশকে গভীরতম স্তরে আন্তঃসংযুক্ত, অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত এবং পরস্পর নির্ভরশীল বলে মনে করে। সমস্ত জীবনের এই আন্তঃসংযোগ জলবায়ু পরিবর্তন এবং বন ধ্বংসের মতো বৈশ্বিক সমস্যাগুলিতে স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান। বৌদ্ধ দর্শন, সমস্ত জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা ও পরিবেশের সকল উপাদানের স্বতঃমূল্যের উপর ভিত্তি করে স্থিতিশীল উন্নয়ন ও গভীর বাস্তুতন্ত্রের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। যার অর্থ সামাজিক সম্প্রীতি ও সমতা সৃষ্টি করা, পরিবেশ রক্ষা করা এবং উন্নয়নকে নিশ্চিত করা। বৌদ্ধধর্ম মূলত জীবনের এই সমস্ত প্রাকৃতিক উপাদানগুলিকে ভারসাম্যের মধ্যে আনার বিষয়ে, তা ব্যক্তিগত স্তরে, সম্প্রদায়ের বা বৈশ্বিক স্তরে অত্যন্ত যত্নশীল। এর অর্থ হল মৌলিকভাবে আমরা প্রাকৃতিক পরিবেশ সহ অন্যান্য জীবনের ধ্বংস বা অবহেলার উপর আমাদের সুখ বা সমৃদ্ধি এবং উন্নয়নকে গড়ে তুলতে পারি না, শেষ পর্যন্ত আমরা এর পরিণতি ভোগ করব।

এটি অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে বৌদ্ধ দর্শনের উদ্ভব হয়েছিল আজ থেকে প্রায় 2,500 বছর আগে, 'যান্ত্রিকীকরণ'-এর প্রথম পদক্ষেপ শিল্প বিপ্লবের অনেক আগে। শিল্প বিপ্লবের পর মানুষ এবং মেশিনগুলি পশু শ্রমের প্রতিস্থাপন করেছিল।

তখন থেকে, আমাদের কাছে বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং বিতরণ, তারবিহীন এবং তারযুক্ত যোগাযোগ এবং ব্যাপক উৎপাদন কৌশলগুলির অগ্রগতির কারণে তথাকথিত উন্নয়ন আবশ্যিক হয়ে পড়ে। আমরা জানি তথাকথিত উন্নয়ন চালানোর জন্য পরিবেশর ক্ষতি ঘটাতেই হয় এবং এর ফলস্বরূপ সরাসরি জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশর অবক্ষয় প্রভৃতি চিহ্নিত করা যেতে পারে। বৌদ্ধ দর্শনের পারস্পরিক নির্ভরশীলতার তত্ত্ব মেনে চললে পৃথিবী আজ এমন সংকটে পড়ত না। বৌদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গিতে মানুষ এবং পরিবেশ গভীরতম স্তরে আন্তঃসংযুক্ত, অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত এবং পরস্পর নির্ভরশীল। তাই পরিবেশের অবক্ষয় পক্ষান্তরে মানব সমাজকেই ধ্বংসের সম্মুখীন করে- এই শিক্ষায় বৌদ্ধদর্শনই পারে মানুষের মধ্যে চেতনার উন্মেষ ঘটাতে। এর পাশাপাশি উন্নয়ন ও পরিবেশ রক্ষার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের দার্শনিক পটভূমি বৌদ্ধ দর্শন আমাদের যথার্থভাবে প্রস্তুত করে দিতে পারে বলে আমার মনে হয়।

গ্রন্থপঞ্জী

- অনির্বাণ. (১৯৬১). *বেদমীমাংসা* (১ম খন্ড). কলকাতা: সংস্কৃত কলেজ.
- অনির্বাণ. (১৯৬৫). *বেদমীমাংসা* (২য় খন্ড). কলকাতা: সংস্কৃত কলেজ.
- অনির্বাণ. (১৯৭০). *বেদমীমাংসা* (৩য় খন্ড). কলকাতা: সংস্কৃত কলেজ.
- আজীজ, আব্দুল (সম্পা.). (১৯৭৫). *যজুর্বেদ সংহিতা.* কলকাতা: হরফ প্রকাশনী.
- ইমাম, মুহাম্মদ হাসান. (২০১৮). *উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন প্রসঙ্গ.* ঢাকা: অবসর.
- সেন, কুমার. রাজ (সম্পা.). (১৪০৬ বং). *অমর্ত্য ভাবনা ২.* কলকাতা: রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়.
- খান, সাদাত উল্লাহ (অনু). (২০০৫). *উন্নয়নের সমাজতত্ত্ব.* ঢাকা: অবসর.
- খানম, রাশিদা আখতার. (২০১৩). *পরিবেশ নীতিবিদ্যা.* ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ.
- খানম, রাশিদা. আকতর. (২০১৬). *পরিবেশ নীতিবিদ্যা.* ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ.
- গম্ভীরানন্দ. (সম্পা.). (১৩৪৮ বং). *উপনিষদ-গ্রন্থাবলী* (১ম খন্ড). কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়.

- গম্ভীরানন্দ. (সম্পা.). (১৩৪৮ বং). *উপনিষদ-গ্রন্থাবলী* (২য় খন্ড). কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়.
- গম্ভীরানন্দ. (সম্পা.). (১৩৫৬ বং). *উপনিষদ-গ্রন্থাবলী* (৩য় খন্ড). কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়.
- গুপ্ত, শুভেন্দু. (২০১২). *প্রাচীন ভারতে পরিবেশ চিন্তা.* কলকাতা: সাহিত্য সংসদ প্রা. লি.
- গোস্বামী, পলাশ (২০২৩, ২২ফেব্রুয়ারী.). *বেদে মেলে প্রকৃতিরক্ষার বার্তাঃ* আনন্দবাজার পত্রিকা, অনলাইন.
- গোস্বামী, বিজনবিহারী (সম্পা.). (১৯৭৮). *অথর্ববেদ সংহিতা.* কলকাতা: হরফ প্রকাশনী.
- গোস্বামী, বিজনবিহারী. (অনু. ও সম্পা.). (২০০০). *শুক্ল ও কৃষ্ণ যজুর্বেদ সংহিতা.* কলকাতা: হরফ প্রকাশনী.
- ঘোড়ই, সন্তোষকুমার ও বণিক, মোহনলাল. (২০১১). *পরিবেশবিদ্যা.* কলকাতা: পারুল প্রকাশনী.
- ঘোষ, ঈশানচন্দ্র. (১৯৩৪). *জাতক মঞ্জরী.* কলকাতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়.

- ঘোষ, জগদীশ. চন্দ্র. (১৯৫৪). *ভারত আত্মার বাণী.* কলকাতা: প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী.
- ঘোষ, বিদ্যুৎ. বরণ. (২০১১). *সংস্কৃত-রচনায় প্রতিফলিত পরিবেশ সচেতনতা.* কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার.
- চক্রবর্তী, নির্মাল্য নারায়ণ. (২০১৯). *পরিবেশ ও নীতিবিদ্যা.* কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ.
- চক্রবর্তী, নির্মাল্য নারায়ণ. (২০০২). *পরিবেশ ও নৈতিকতা.* কলকাতা: প্রগ্রেসিভ বুক ফোরাম.
- চক্রবর্তী, সত্যনারায়ণ. (২০০১). *ধর্মশাস্ত্রে আত্মহত্যা.* "কালিদাস এবং সংস্কৃত সাহিত্য ও শিক্ষা বিষয়ক অন্যান্য প্রবন্ধ". কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার.
- চক্রবর্তী, সোমদত্তা. (২০০০). *বৈদিক সাহিত্য প্রসঙ্গ.* কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো.
- চক্রবর্তী, সোমদত্তা. (২০১৫). *বৈদিক বাঙ্ময়ে পরিবেশ ও রবীন্দ্র মানসে তার উত্তরাধিকার.* কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো.
- চট্টোপাধ্যায়, ধূর্জটিপ্রসাদ. (২০১৪). *রামায়ণ- প্রকৃতি, পর্যাবরণ ও সমাজ.* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স.

- চৌধুম, সুকোমল. (সম্পা.). (১৯৯৭). *গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন.* কলকাতা: পরিবেশক প্রেস.
- চৌধুরী, মনোজিৎ আচার্য ও দাশ, অরবিন্দ কুমার ও চক্রবর্তী, পিনাকী (সম্পা.). (২০১২). *পরিবেশবিদ্যা.* বর্ধমান: আধিকারিক বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়.
- চৌধুরী, সুকোমল (অনু.). (২০১৪). *সংযুক্ত নিকায়* (তৃতীয় খণ্ড). কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সি.
- চৌধুরী, হাসানুজ্জামান (অনু.). (২০১৩). *পরিবেশ ও পুঁজিবাদ.* ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ.
- ঠাকুর, পরিতোষ (সম্পা.). (১৯৭৫). *সামবেদ সংহিতা.* কলকাতা: হরফ প্রকাশনী.
- ঠাকুর, পরিতোষ. (অনু. ও সম্পা.). (১৩৮৫ বং). *সামবেদ সংহিতা.* কলকাতা: হরফ প্রকাশনী.
- দত্ত, রমেশচন্দ্র ও বন্দ্যোপাধ্যায়, হিরন্ময়. (১৩৮৫ বং). *ঋগ্বেদ সংহিতা* (দ্বিতীয় খন্ড). কলকাতা: হরফ প্রকাশনী.
- দত্ত, রমেশচন্দ্র (অনু.). (১৯৭৮). *ঋগ্বেদ সংহিতা* (দ্বিতীয় খণ্ড). কলকাতা: হরফ প্রকাশনী.

- দাস, কালী প্রসন্ন. (২০০৯). *মানুষ ও প্রকৃতি: একটি দার্শনিক সমীক্ষা,* (গবেষণা পত্র). কলকাতাঃ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়.
- দাস, প্রদীপ কুমার. (২০১৫). *বিপন্ন পরিবেশ বিপন্ন পৃথিবী.* কলকাতা: প্রগতিশীল প্রকাশক.
- ধর, ব্রজেন্দ্রনাথ. (২০০৬). *মানুষ, সমাজ ও পরিবেশ: একটি দার্শনিক বিচার* (গবেষণা পত্র). কলকাতাঃ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়.
- ধর্মাধার মহাস্থবির (বঙ্গানুবাদ). (২০১৩). *মিলিন্দ প্রশ্ন.* কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সি.
- নন্দী, নবকুমার ও বল, মাণিক. (২০১৩). *ব্যবহারিক নীতিবিজ্ঞান.* কলকাতা: শ্রীভূমি পাবলিশিং হাউস.
- পাল, আশিষকুমার ও মুখার্জী, চন্দ্রনাথ. (২০০৮). *প্রকৃতি ও পরিবেশ.* কলকাতা: ডাভ পাবলিশিং হাউস এবং সৌগতসিংহ.
- পাল, সন্তোষকুমার. (২০০৮). *সমকালীন পরিবেশ নীতিশাস্ত্রের রূপরেখা.* কলকাতা: লেভান্ত বুকস্.
- বন্দ্যোপাধ্যায়, উদয়চন্দ্র. (২০০১). *বেদ সংকলন.* কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো.

- বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দু. (সম্পা. ও অনু.). (১৪১০ বং). *মনুসংহিতা* (মূল, ব্যাখ্যাশ্রয়ী বঙ্গানুবাদ, কুল্লূক ভট্ট কৃতা টীকা ও বিস্তৃত-ভূমিকা-সমন্বিতা). কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার.
- বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দু. (সম্পা. ও অনু.). (২০০২). *কৌটিলীয়ম্ অর্থশাস্ত্রম্* (প্রথম খন্ড). কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার.
- বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দু. (সম্পা. ও অনু.). (২০১১). *কৌটিলীয়ম্ অর্থশাস্ত্রম্* (দ্বিতীয় খন্ড). কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার.
- বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তি. (১৩৯৫ বং). *বৈদিক যুগের যাগযজ্ঞ.* কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার.
- বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তি. (সম্পা. ও অনু.). (১৪১৫ বং). *বৈদিক পাঠ সংকলন.* কলকাতা: সন্দেশ.
- বন্দ্যোপাধ্যায়, সোমনাথ (সম্পা.) ও বন্দ্যোপাধ্যায়, রামানন্দ (চিত্রিত). (২০০৫). *কাশীদাস মহাভারত* (উত্তর কাশী খন্ড). কলকাতা: সাহিত্য সংসদ.
- বসাক, রাধাগোবিন্দ. (২০১৪). *কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র* (অখন্ড সংস্করণ). ঢাকা: সংঘ প্রকাশন.
- বসু, চারুচন্দ্র. (২০২০). *ধম্মপদ.* কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সি.

- বসু, চারুচন্দ্র. (সম্পা.). (১৯৯৯). *ধম্মপদ.* কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সী.
- বসু, যোগীরাজ. (১৯৭০). *বেদের পরিচয়.* কলকাতা: ফার্মা কে এম এল প্রা লি.
- বসু, যোগীরাজ. (২০১৫). *বেদের পরিচয়.* কলকাতা: ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড.
- বসু, যোগীরাজ. (সারানুবাদ). (১৩৫৪). *কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস কৃত মহাভারত.* কলকাতা: এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড.
- বসু, যোগীরাজ. (সারানুবাদ). (১৩৫৪). *কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস কৃত মহাভারত.* কলকাতা: এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড.
- বসু, রথীন্দ্রনারায়ণ (সম্পা.). (২০০১). *পরিবেশ.* কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়.
- বসু, রাজশেখর. (সারানুবাদ). (১৩৯০ বং). *বাল্মীকি রামায়ণ.* কলকাতা: এম সি সরকার এন্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড.
- বিদ্যারণ্য. (২০১৯). *বৌদ্ধ দর্শন ও ধর্ম.* কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ.
- বিশ্বাস, দিধিতি. (২০১৩). *বৈদিক পাঠ সঞ্চয়ন.* কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ.

- ভট্টাচার্য, অমিত. (২০১১). *সায়ণ মাধবীয় সর্বদর্শন সংগ্রহ* (তৃতীয় খন্ড). কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার.
- ভট্টাচার্য, নরেন্দ্রনাথ. (১৩৮৪ বং). *ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস.* কলকাতা: জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড.
- ভট্টাচার্য, ভবানীপ্রসাদ ও অধিকারী, তারকনাথ. (২০০৪). *বৈদিকসংকলন* (১ম খন্ড). কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো.
- ভট্টাচার্য, রবীন্দ্রনাথ. (২০১৫). *পরিবেশ ভাবনায় সংস্কৃত সাহিত্য.* কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার.
- ভট্টাচার্য্য, রবীন্দ্রনাথ (সম্পা.). (২০১৫). *পরিবেশ ভাবনায় সংস্কৃত সাহিত্য.* কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার.
- মুখার্জ্জী, জিনিয়া (অনু.). (২০১৫). *মানুষ ও পরিবেশ.* কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স.
- মুখোপাধ্যায়, আনন্দদেব ও চন্দ, বিনয় (সম্পা.). (২০১১). *পরিবেশ প্রসঙ্গ* (দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম ভাগ), মেদেনীপুর: অভীক পাবলিকেশন্.
- মুখোপাধ্যায়, আনন্দদেব ও চন্দ, বিনয় (সম্পা.). (২০১২). *পরিবেশ প্রসঙ্গ* (প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় ভাগ). মেদেনীপুর: অভীক পাবলিকেশন্.

- মুখোপাধ্যায়, এ. ও আগরওয়াল, এস. পি. (২০০০). *আধুনিক পরিবেশবিদ্যা.* কলকাতা: ভট্টাচার্য ব্রাদার্স.
- মুখোপাধ্যায়, তুলসিদাস. (২০০১). *ঋগ্বেদের গৌণদেবতা.* কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো.
- মুৎসুদ্দি, বীরেন্দ্রলাল. (অনু. ও সম্পা.). (২০১৪). *অভিধর্ম্মার্থ-সংগ্রহ* বা *সংক্ষিপ্তসার অভিধর্ম্ম.* কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সি.
- শীল, অজিত. (২০১৩). *পরিবেশ.* কলকাতা: দ্য হিমালয়ান বুকস্.
- শীলভদ্র. (অনু.). (২০১১). *দীর্ঘ নিকায়* (অখন্ড). কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সি.
- সরকার, প্রহ্লাদ. কমার. (সম্পা.). (১৯৯৭). *কান্টের দর্শন.* কলকাতা: পরিবেশক প্রেস.
- সিংহ, কালীপ্রসন্ন. (অনু.). (১৪১৭ বং). *মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত মহাভারত* (২য় খন্ড). কলকাতা: বেণীমাধব শীলস্ লাইব্রেরী.
- সেন, অমর্ত্য. (১৪২৪ বং). *অর্থনীতি গ্রন্থমালা ৭.* "জীবনযাত্রা ও অর্থনীতি". কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স.
- সেন, অমর্ত্য. (২০১১). *উন্নয়ন ও স্বাক্ষরতা.*কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স.

- সেন, গিরীশচন্দ্র. (অনু.). (২০১২). *কোরান শরীফ.* ঢাকা: দিব্য প্রকাশ.
- সেন, রাজ কুমার. চক্রবর্তী, কল্যাণ. চৌধুরী, অসীম. ভৌমিক, অলক কান্তি. ঘোষ, স্বাতী. (সম্পা.). (১৪০৬). *অমর্ত্য ভাবনা.* কলকাতা: রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়.
- সেন, রাজকুমার (সম্পা.)(১৯৯৯)। অমর্ত্য ভাবনা ২. কলকাতাঃ রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়.

- Ahlawat, Ajay. (2019). *Sustainable Development Goals*. Chennai: Notion Press.
- Arumugam, E. (2008). *Principles of Environmental Ethics*. New Delhi: Sarup Book.
- Attfield, Robin. (1983). Methods of Ecological Ethics. *Metaphilosophy.* Vol-14. No-3/4. July/October. Page- 195-208.
- Bachelor, Martine and Brown, Kerry (Ed.). (1994). *Buddhism and Ecology.* Delhi: Motilal Banarsidass Publishers.
- Barbour, Ian G. (1973). *WESTERN MAN AND ENVIRONMENTAL ETHICS.* London: Addison Wesley.
- Berke, Philip & Manta, Maria. (1999). Planning for Sustainable Development.
- Bloom, Alfred. (1972). Buddhism, Nature and the Environment. *The Eastern Buddhist.* Vol-5. No-1. May. Page- 115-129.

- Chakraborty, Nirmalya Narayan. (2004). *In Defence of Intrinsic Value of Nature*. Kolkata: New age Publishers.
- Chapple, Christopher Key. (2006). *Jainism and Ecology*. Delhi: Motilal Banarsidass.
- Chatterji, Kshitish Chandra (Eds.). (1944). *VEDIC SELECTIONS* (Part-1). Kolkata: Calcutta University.
- Chisholm, Roderick M. & Sosa, Ernest. (1966). On the Logic of "Intrinsically Better". *American Philosophical Quarterly*. Vol- 3. No- 3. July. Page- 244-249..
- Cooper, D. E. & Palmer, J. A. (Eds.). (1992). *THE ENVIRONMENT IN QUESTIONS: ETHICS AND GLOBAL ISSUES*. London: Routledge.
- Cooper, David E. and James, Simon P.(2005). *Buddhism: Virtue and Environment*. Burlington: Ashgate publishing.

- Deichmann, Uwe & Gill, Indermit. Etal. (2010). "World Development Report 2009": A Practical Economic Geography. *Economic Geography.* Vol-86. No-4. October. Page- 371-380.
- Descartes, Rene. (1903). *Discourse.* Veitch, John (Trans.). Chicago: The Open Court Publishing Company.
- Descartes, Rene. (2006). *A Discourse on the Method.* Maclean, Ian (trans.). New York: Oxford University Press.
- Dutt, M. N. (Trans.). (2011). *YAJNAVALKYA SMRITH* (Text with Commentary Mitaksara of Vijnanesvara and English Trans. With notes). Panda, R. K. (Ed.). Delhi: Bharatiya Kala Prakasan.
- Ernst Haeckel, *History of Ecological Science*, part 47: Ernst Haeckel's Ecology, Bulletin of the Ecological Society of America, July, 2013
- Goodman, Matthew P. (2017). Parallel Perspectives on the Global Economic Order.

- Guha, Rammohan. Radical American Environmentalism and Wliderness Preservation: A Third World Critique.
- Haeckel, Ernst. (2013). History of Ecological Science (Part 47). Ernst Haeckel's Ecology. *Bulletin of the Ecological Society of America*. July. Page- 222-224.
- Hugh, Tredennick (ed.). (2004). Aristotle: The Nicomachean Ethics. U.S.: Penguin pub.group.
- Hume, David. (2007). *An Enquiry Concerning Human Understanding*. Millican, Peter (Ed.). New York: Oxford University Press.
- Huong, Gioi. (2012). *Buddhist Ecology*. Delhi: Eastern Book Linkers.
- Khera, Aman. (2019). Sustainable Development and Environment Protection in India: A Critique. *International*

Journal of Applied Business and Economic Research. Vol-17. No-3. Page- 17-20.

- Langhelle, Oluf. (1999). Sustainable Development: Exploring the Ethics of "Our Common Future". *International Political Science Review / Revue internationale de science politique*. Vol-20. No-2. April. Page- 129-149.
- Leopold, Aldo. (1949). The Land Ethics. *A Sand County Almanac*. Page- 201-222.
- Locke, John. (1963). *Two Treatise of Government. Laslett*. Peter (ed.). New York: New American Library.
- Malakar, Bharat (Ed.). (2013). *Sustainable Development: Ethics and Economics*. Purba Medinipur: Readers service in association with Dept of Philosophy, Mahishadal Girls College.

- Malakar, Bharat (Ed.). (2013). *Sustainable Development: Ethics and Economics*. Purba Medinipur: Readers service in association with Dept of Philosophy, Mahishadal Girls College.
- Mukherjee, Anindita. (2019). A Role of Buddhism for the Solution of Today's Environmental Crisis. *International Journal of Applied Social Science*. Vol-6(1). January. Page- 192-197.
- Naess, Arne. (1973). The Shallow and Deep, Long-Range Ecology Movement. A Summary. *Inquiry*. Vol-16. Page- 95-100.
- Najinyanupi. (1983-1984). The World Development Report. *Economic and Political Weekly*. Vol-19. No-9. March. Page- 376-379.
- Navarro, Vicente. (2000). Development and Quality of Life a Critique of Amartya Sen's "Development as Freedom. *International Journal of Health Services*. Vol-30. No-4. Page-661-674.

- Nhat, Pham Cong. The Role of Buddhism in Environmental Protection and Sustainable Development in Vietnam Today. *International Journal of Humanities Social Sciences and Education*. Vol-6. Issue-5. May. Page- 74-82.
- O'Neill, John. (1992). The Varieties of Intrinsic Value. *The Monist*. Vol- 75. No-2. April. Page- 119-137.
- Owen, D. F. (1974). *What is Ecology?* New York: Oxford University Press.
- Page, Tony. (1999). *Buddhism and Animals*. London: Ukavis Publication.
- Sabina, George H. (1951). *A History of Political Theory*. New York: Henry Holt And Company.
- Sai, Ch Venkata Siva. (2016). Buddhist Solution for Environmental Issues. *International Journal of Science Technology and Management*. Vol-5. No-12. December.

- Samanta, Ratan Kumar and Das, Chandan Surabhi. (Ed.). (2017). *Environmental Degradation Prevention: Conservation and Management in India.* Kolkata: Progressive Publishers.
- Selwyn, Ben. (2020). Liberty Limited? A Sympathetic Re-Engagement with Amartya Sen's "Development as Freedom". *Economic and Political Weekly*. Vol-46. No-37. September. Page- 10-16.
- Sen, Amartya. (1983). Development: Which Way Now?. *The Economic Journal*. Vol-93. Issue-372. December. Page- 745-762.
- Sen, Amartya. (2001). *Development as freedom*. Oxford: OUP Oxford.
- Sharma, Nimisha. *Environmental awareness at the time of Vedas*, ved-vidya, vol-26, july- December, page-221-224.
- Sharma, Nimisha. (2015). Environmental Awareness at the Time of Vedas. *Ved-vidya*. Vol-26. July- December. Page- 221-224.

- Sharma. N. (2015). *Environmental awareness at the time of Vedas*. *Ved-Vidya*, 26(4), 221-224.
- Silm, Hugo. (1995). What is Development?. *Development*. Taylor & Francis Ltd. 5. 143-148.
- Simkins, Ronald A. (2014). The Bible and Anthropocentrism: Putting Humans in Their Place. *Dialectical Anthropology*. Vol-38. No-4. December. Page- 397-413.
- Smith, Fraser (Ed.). (1997). *Environmental sustainability* (Practical Global Implications). Florida: St Lucie press.
- Smith, Fraser (Ed.). (1997). *Environmental sustainability* (Practical Global Implications). Florida: St Lucie press.
- Sricot, Phramaha Sangvech. & Bulasthanporn, Apaporn. Etal. (2017). Buddhist Ethics with Solving the Environmental Problems. *Cultural and Religious Studies*. Vol-5. No-1. January. Page- 54-60.

- Srivastava, D.C. (Ed.). (2005). *Readings in Environmental Ethics*. Jaipur: Rawat publications.

- Srivastava, D.C. (Ed.). (2005). *Readings in Environmental Ethics*. Jaipur: Rawat publications.

- Terjesen, siri. (2004). Amartya Sen's Development as Freedom. *Graduate Journal of Social Science*. Vol-1. Issue-2. Page- 344.
- Traina, Cristina L. H. (1997). Baird Callicott's Ethical Vision: Response to Baird Callicott. *American Journal of Theology & Philosophy*. Vol- 18. No-1. January. Page- 81-87.
- V, Gopalakrishna B. & Leelavathi, D. S. (2012). Amartya Sen's Contribution to Human Development. August.
- Walsh, Vivian. (2007). Amartya Sen on Rationality and Freedom. *Science & Society*. Vol-71. No-1. January. Page- 59-83.
- Zimmerman, Michael E. (Ed.). (1993). *Environmental Philosophy*. New Jersey: Prentise Hall.

- Zimmerman, Michael E. (Ed.). (1993). *Environmental Philosophy*. New Jersey: Prentise Hall.

- Zondervan (Ed.). (2013). *Holy Bible*. United States: Zondervan.